শিপ্রানদীপারে

দীপ্তি ত্রিপাঠী

আনন্দধারা প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ
চৈত্র, ১৩৫২

প্রকাশক
মনোরঞ্জন মজুমদার
আনন্দধারা প্রকাশন
৮ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
খালেদ চৌধুরী

দাম : ৬·০০

রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্যকে

শ্রদ্ধার সহিত

শিপ্রানদীপারে

এক

শরৎকাল।

আকাশে নির্মল মেঘ।

ভৃগুকচ্ছের উপকূল।

পশ্চিম সমুদ্রের চারিদিক থেকে পোতশ্রেণী আসছে।

কত রঙের পাল, যেন শরতের ফুলের কেয়ারি; কোথাও সাদা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে সাদা; কোথাও রাঙ্গা, ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে রাঙ্গা; কোথাও পীত, কোথাও কুঙ্কুম। নীল সবুজ জলের ওপর যেন রঙের দাঙ্গা বেঁধে গেছে।

পৌণ্ড্রবর্ধনের শ্রেষ্ঠী হেমধরের সিঁদূরে পালের নৌকাগুলির মত কিন্তু একটিও তরণীশ্রেণী নেই। এ দেশের নৌকার মত তাঁর নৌকাগুলি বড় বা ভারী নয়। কিন্তু গতি ক্ষিপ্র। এরা হেসে বলে নৌকা নয়, ডিঙ্গা। হেমধরও হেসে বলেন—'আমার মৎস্যকন্যা ডিঙ্গা'। সিংহল, যবদ্বীপ, সুবর্ণভূমি প্রভৃতির সঙ্গে বহির্বাণিজ্যে তাঁর মত দক্ষ শ্রেষ্ঠী খুব কমই আছে। নৌকাও তাঁর একটি দুটি নয়। এক এক শ্রেণী বা সাঙ্ঘায় (সঙ্ঘে) সাতটি করে পোত—এমন সপ্ত সঙ্ঘ অর্ণবপোত। তার খোলে কত না পণ্য,—বারাণসীর শাড়ী, পৌণ্ড্রবর্ধনের নীলাম্বরী, চীনদেশের চীনাংশুক, সাকেতের রাঙ্কব (মৃগরোমজ বস্ত্র), যবদ্বীপের গুড়ত্বক (দারুচিনি), সিংহলের সিন্ধু মৌক্তিক, সুবর্ণভূমির শোণরত্ন (চুনি), শিলাজতু, সমুদ্র ফেণা, চন্দন, পাট, তসর, রেশম, ওষধী। পারস্যের ঘোড়া ও কলিঙ্গের হাতী নিয়ে যেতেও দ্বিধা করতেন না তিনি।

এ ভিন্ন আর এক রকমের পণ্যের সরবরাহ করতেন শ্রেষ্ঠী। কিন্তু সে কথা অতি গোপনে, অতি নিভৃতে বলা চলে। সিন্ধু, ওড্র, কল্যাণ, কাবেরীপত্তন, তাম্রলিপ্ত, সিংহল, পারস্য, চীন কত দেশের কত না

সুন্দরীকে তিনি কত না বন্দরে নিয়ে এসেছেন। পেঁছে দিয়েছেন অমাত্যের প্রমোদ-কক্ষে, কখনো বা রাজার বিলাস-বাসরে। কিন্তু এবার তাঁর উপর কন্যাসংগ্রহের যে আদেশ ছিল তা বিচিত্র। প্রথম যখন সে কথা তিনি শুনেছিলেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তাঁর মন। এখনো কানে গম্ গম্ করে বাজছে আচার্য ঈশানেশ্বরের উক্তি,—"শ্রেষ্ঠী হেমধর, আমাকে বঙ্গদেশীয় সপ্তমবর্ষীয়া একটি গৃহস্থবালিকা এনে দিতে পারবে?"

বঙ্গ-দেশ? সপ্তম বর্ষীয়া? গৃহস্থবালিকা?

"কেন আচার্য্য?" হেমধর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন। মনে মনে এই চিন্তাই করেছিলেন, শৈব আচার্য কি তন্ত্রের চর্চাও শুরু করেছেন নাকি? বঙ্গের মহিলাদের তো সুন্দরী খ্যাতি নেই। কাশ্মীর বা পারসিক, মগধ কিম্বা অপরান্ত দেশেই সুন্দরী মেলে। কিন্তু দূরান্তের দিকে তাকিয়ে আচার্য যা বলেছিলেন তা আরো বিস্ময়কর,—

"অনেক দিন তো হোল। বহু নর্তক নর্তকী তৈরী করেছি। সাকেত, উজ্জয়িনী, সিংহল, দাক্ষিণাত্য কত দেশের কত মেয়েকেই তো দেবনর্তকী করলাম। কিন্তু আশা মিটল না। এরা দেবতাকে চায় না, মানুষকে চায়। কেন বলতে পার?" আচার্য ঈশানেশ্বর কঠিন ধাতুর মানুষ বলেই বিখ্যাত। তাঁর গলা যেন বীণার তারের মত কাঁপতে লাগল।

হেমধর নত মস্তকে কণ্ঠের প্রলম্বিত মোতির মালা নিয়ে ক্রীড়া করতে লাগলেন।

আচার্য গলা পরিষ্কার করে বললেন,—

"তাই স্থির করেছি একবার শেষ চেষ্টা করব। শুনেছি বঙ্গের মেয়েরা ললিতকোমলা—হৃদয়ে তাদের করুণার মধু। শুনেছি তারা পতিপরায়ণা—ছায়েবানুগতা। আর বারযোষা নয়—আর নটি কন্যা নয়—আর ছলপ্রণয় নয়। মহাকালকে আমি আমার জীবনের

শেষ নৈবেদ্যটি শুভ্র পুষ্পেই দেব। তাতে যেন মলিন দাগ না থাকে। তারপর……”

“তারপর কি আচার্য?”

“বারাণসী যাত্রা করব।”

“কিন্তু……” হেমধর ইতস্তত করলেন।

“কিন্তু কেন হেমধর? আমি তো অসম্ভব বস্তু চাই নি। যত মূল্য লাগে আমি দেব।”

“অসম্ভব নয় আচার্য, অপ্রাপনীয়। বহুমূল্য নয়, অমূল্য।”

“কেন?”

“আপনি চেয়েছেন সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা”…

“হ্যাঁ। ভারতের নাট্যসূত্র অনুসারে ঠিক মত শরীরবিন্যাস করতে গেলে কোমল অঙ্গই প্রশস্ত। সপ্তম, অষ্টম, বড জোর নবমবর্ষীয়া পর্যন্ত চলতে পারে। কিন্তু তারপরে আর নয়।”

“বুঝলাম। কিন্তু গৃহস্থ কন্যা চাইছেন কেন?”

“কারণ আমি চাই অমলিন কন্যা। যে মহাকালকেই পতি মনে করে নিজেকে উৎসর্গ করে দেবে। অমাত্য বর্গের ভোজে নিজেকে বিচ্ছুরিত করে দেবে না। গ্রহণলাগা চাঁদ নয়, শুক্লপক্ষের চাঁদ দিয়ে আমি দেবতাকে ভূষিত করতে চাই, শ্রেষ্ঠী।”

হেমধর ভ্রূকুঞ্চিত করে চিন্তামগ্ন রইলেন অনেকক্ষণ। আচার্য ঈশানেশ্বর সান্ধ্যবন্দনার সময় উপস্থিত দেখে উঠলেন। তখন হেমধর বললেন,—“গুরুদেব, চেষ্টার ত্রুটি হবে না। এখন সিন্ধু-গঙ্গা-লৌহিত্য নদ পরিক্রমা করে একবার পৌণ্ড্রবর্ধন যাব। তারপর তাম্রলিপ্ত হয়ে সিংহল। পূর্বসাগর হয়তো খুব উত্তাল থাকবে। কিন্তু মহোদধি চিরশান্ত। ফিরে আসতে আসতে শরৎকাল। যদি মনোমত কন্যা পাই আপনার কাছে উজ্জয়িনীতে নিয়ে আসব।”

“উজ্জয়িনী? না, আমি শরৎকালে ভৃগুকচ্ছে এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। এটি আমার জীবনের শেষ কাজ। তাই এর সঙ্কল্প

বড় কঠিন। কিন্তু বৎস, মায়ের কোলের কন্যা আনবে না। যে মায়ের প্রথম সন্তান জীবিত আছে, যার পুত্র আছে এবং যে বন্ধুরগাত্রী এমন মায়ের কন্যা আনবে।"

"এত বিচার? গুরুদেব কি মহাকালের বধূ নির্বাচন করছেন?" হেমধর পরিহাস করলেন।

"হ্যাঁ, আমার মহাকাল-বধূ।" গুরুদেবও প্রসন্ন পরিহাসে উত্তর দিলেন। তারপর অভয়-মুদ্রায় হাতটি তুলে ধরে বলেছিলেন,—

"শ্রেষ্ঠী, সর্বকাজে মহাকাল তোমার সহায় হোন।"

* * *

উজ্জয়িনী থেকে পাটলীপুত্র হয়ে হেমধর যে দিন পৌণ্ড্রবর্ধনে পৌঁছলেন সেদিনই যোগাযোগ ঘটল। নারায়ণ ভট্টের মৃত্যু ঘটেছে পূর্বরাত্রে—নারায়ণ ভট্টের স্ত্রী সীতাদেবী সহমরণে যাবেন। তাই প্রচণ্ড গোল চলেছে। সীতা দেবীর পুত্রটিকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভবদেব ভট্ট গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দুটি কন্যার দায় কে নেবে? সীতা দেবীর প্রতিবেশিনী কমলা ব্রাহ্মণী একটি কন্যার ভার নিতে পারেন। কিন্তু আর একটি কন্যা?

এমন সময়ে হেমধর শ্রেষ্ঠী সেখানে উপস্থিত হলেন। কমলা ব্রাহ্মণীর পাটক্ষেত আছে। বছরে তাই একবার এসে হেমধর তার হাতে তৈরী পাটের রজ্জু কিনে নিয়ে যান। কমলার হাতে গুড়ের জ্বাল বেশ হয়। আদ্রকের রস দিয়ে তিনি এমন এক রকম গুড় প্রস্তুত করেন যে তার চাহিদা দূর বিদেশেও আছে। কেতকীপত্র দিয়ে সুগন্ধী খদিরও তিনি তৈরী করেন। কুন্তল, পাণ্ড্য, উজ্জয়িনীর সামন্ত কন্যাদের কাছে তার বড় আদর।

বৃত্তান্ত শুনে হেমধর বললেন "আমি একটি কন্যার ভার নিতে প্রস্তুত আছি।" তাঁর মুখে সব কথা শুনে সীতা দেবী বললেন—"মহাকালের বধূ হবে আমার কন্যা? এ তো তার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। বাছা, আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধবীকে তুমি নাও। মালতীকে কমলা নেবে।"

সপ্তমবর্ষীয়া মাধবীকে নিয়ে সেদিন ভরা বর্ষার পাটক্ষেতের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে হেমধরের মনে হয়েছিল মহাকালের কি এই ইঙ্গিত ছিল ? তিনি নিজে চক্রস্বামীর সেবক। কিন্তু ঘটনার গতিতে তিনি রোমাঞ্চ বোধ করছিলেন।

বাণিজ্যে এবার দ্বিগুণ লাভ হোল হেমধরের। নারকেলের বদলে শঙ্খ, এলাচের বদলে মোতি, পাটের বদলে সোনা। তাম্রপর্ণী বন্দরে এসে হেমধর মাধবীকে পরিয়ে দিলেন চাঁপা রংয়ের রেশমী বস্ত্র। গলায় ঝুলিয়ে দিলেন সিংহলী মুক্তোর মালা। মাধবী খুব খুশী। এ কয়মাস তার থেকে থেকে মনে পড়েছে নারকেল পাতা ঘেরা কুটিরটির কথা—উঠোনের কচি কলাবন—পদ্মে ভরা পুষ্করিণী—পিতার মৃত্যু, মায়ের মুখ। কিন্তু যেন পূর্বজন্মের স্মৃতির মত ফিকে হয়ে আসছে। মাধবীর ভাগ্যবিধাতা বড দ্রুত তার মনের পটে রঙের আঁচড় ফেলছেন। মুহূর্তে মলিন হয়ে যাচ্ছে পুরোণ রেখা, ফুটে উঠছে নতুন ছবি। এই ভীষণ তরঙ্গশ্রেণী—ইন্দ্রনীলমণির পাতে ঘেরা সমুদ্র—তার অপর পারে কত না আশ্চর্য দেশ। কোথাও চন্দনবনের সুগন্ধ—কোথাও গন্ধকুটির সুবাস। মাঝি-মাল্লা—নাবিক-তরণিক। সুমাত্রা···যবদ্বীপ···তাম্রপর্ণী ···কল্যাণ···। কি সুন্দর পোতাশ্রয়গুলি। জীবনের বলয় কি বিস্তৃত, কি বিচিত্র। নিত্যই নতুন উত্তেজনা। নতুন মানুষ। নতুন দিশা।

শ্রেষ্ঠী তাকে ডাকে—'পার্বতী জননী।'

শ্রেষ্ঠীর প্রধান পোতবহ নকুল তাকে ডাকে—'লক্ষ্মী মাগো।'

কত দেশের কত বণিক আসে সওদা করতে। তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। প্রশ্ন করে,—"শ্রেষ্ঠীর মেয়ে নাকি ?"

"আজ্ঞে না। ঈশান ঠাকুরের বরাত।"

"তা ঈশান ঠাকুরের বরাত দেখি খুব ভাল। দিয়ে যাও একে, হাজার সুবর্ণ মুদ্রা পাবে।"

হাজার না হয়, লাখ ; লাখ না হয় তো কোটি।

বলিদ্বীপের শ্রেষ্ঠী গোনর্দ তা দিতেও রাজি।

কিন্তু হেমধর হাসে।

"না ভাই তা হয় না। এ বারযোষার কন্যা নয়।"

"তবে?"

"ঐ যে বললুম ঈশান ঠাকুরের বরাত। দেবতার নৈবেদ্য।"

বণিকেরা হাসে। ভাবে আর কোথাও অর্থের জোর আছে। আর একদিন এসে দরদাম করতে হবে; ঝপ্ করে ফেলে দিতে হবে হাজার হীরের একটা ঝাঁপি।

কিন্তু তার আগেই নোঙর খুলে দিয়েছে হেমধর। জানে দরদামে না পোষালে লুট হয়ে যাবে এই মেয়ে। গায়ের রংটি ঘিয়ের মত মসৃণ। বড় বড় চোখ দুটিতে কত কালের বিস্ময় কাজল হয়ে আছে। বাঁশীর মত নাক। পাঁপড়ির মত ঠোঁট। দ্রাক্ষাগুচ্ছের মত থোকা থোকা চুল। গড়নটি সুন্দর। একটি নিটোল ফল যেন। আহা, যখন রসে ভরভর হয়ে উঠবে!

হেমধর ঘুমন্ত মাধবীর দিকে নির্নিমেষে চায়। তাম্রপর্ণী থেকে ভৃগুকচ্ছ মাত্র সাত দিনের পথ। দক্ষিণ-জলনিধি ছাড়িয়ে পশ্চিম-পয়োধি পার হতে আর কত দিনই বা লাগবে? এ তো পূর্ব-সাগরের মত উত্তরোল নয়। আর ঘণ্টা দুই। বাধহয় তাও নয়।

আচ্ছা, তাই যেন হয়।

পঞ্চমীতে অভিলষিত সিদ্ধি।

হেমধর মনে মনে বলে।

তার প্রধান নাবিক নকুল অনেক দিনের লোক। লোকে বলে, ও নাকি জলের সঙ্গে কথা কয়। ও নাকি জলসিদ্ধ পুরুষ। ওপরের হাল থেকে সে চেঁচিয়ে উঠলো,—'বরুণ, বরুণ।' একটা মস্ত ঢেউ পশ্চিম-পয়োধির উপর খেলে গেল। হেমধর ছিটকে পড়লেন রত্ন-বেদী থেকে। ঘুম ভেঙ্গে মাধবী চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলো।

"আরে চুপ চুপ। ওমা, কি হোল তোর? ললাট যে রক্তে ভেসে গেল। সর্বনাশ হোল বুঝি।"

মাধবীর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন হেমধর।

ভ্রূযুটির মধ্যে বিদ্ধ হয়ে গেছে একটি অমসৃণ বৈদূর্যখণ্ড। বাইরে তখন দড়াদড়ি, হাল-পাল নিয়ে চলেছে হৈ চৈ। অনেক পোতশ্রেণীর মধ্যে ভিড়োতে হবে তাদের নৌবহর। থৈ থৈ করছে চারদিক।

শরতের গোড়া বলে ভৃগুকচ্ছে বাণিজ্যও জমজমাট। কোন তরিশ্রেণী চলেছে সিংহলের দিকে; কেউ আবার আসছে সিংহল থেকেই। যবদ্বীপগামী পোতগুলি যাত্রা করবে কাল। বলিদ্বীপের নৌকো যাবে পরশু। বঙ্গদেশের নৌকাগুলি এসেই ছেড়ে যাবে এক বেলার মধ্যে। কৃষ্ণপক্ষের আগে পৌছান চাই যে। সেখানে নাকি মহাকালীর পূজা হয় ভারি সমারোহ করে।

"মহাকালের পূজো?"

"না হে, মহাকালী।"

"সে আবার কি?"

"আর বল কেন? বঙ্গালদের কর্মই পৃথক। ওরা মহাকালের পূজো করে না। করে মহাকাল-বধূ মহাকালীর।"

"হাঃ হাঃ হাঃ।"

"হোঃ হোঃ হোঃ।"

"হেসো না হে। ওনেই নাকি ওদের শক্তি।"

"কি রকম?".

"গ্রামের বাইরে—শ্মশানের মধ্যে—রক্তবস্ত্র পরিধান করে নাকি পূজো হয়।"

"সে কি রকম? মহাযান বৌদ্ধ নাকি?"

"না, না, বৌদ্ধ নয় ওরা। বৌদ্ধদের মত মুণ্ডিত মস্তকও নয়। জটাজূটধারী। তবে উপাচারে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন, মুদ্রা চলে।"

"বাঃ এটা তো বেশ।"

"এটা বেশ হোল? ছ্যা ছ্যা ছ্যা। এই জন্যই তো ওখানে গেলে ব্রাত্য হয় লোকে।"

"ঐ দেখ, ওদের প্রধান সাংযাত্রিক হেমধর শ্রেষ্ঠীর পোতবর্গ এসেছে। চল, চল দেখি নতুন কি আনল।"

"কেন? ব্রাত্যের নৌকো দেখতে যাচ্ছ কেন?"

"উন্মাদ হলে নাকি? বাণিজ্যে আবার ব্রাত্য কি?"

"তাহলে বলি রাম-দত্ত, নৌবাণিজ্য তো ঐ বঙ্গালেরা ভিন্ন কেউ করে না। আমরা তো শুধু স্থলবণিক সার্থবাহ রয়ে গেলাম।"

"কিন্তু আমরাই তো আপণ-মার্গে ও সব দ্রব্যাদি নিয়ে যাই। পৌঁছে দিই বিপণিতে। সে সব কি আর ওরা পারত হে, চন্দনদাস?"

"তা না পারার কি আছে? ওরা যদি নক্র, মকর, গ্রহ, কুম্ভীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে—ঝড়, মেঘ, লুক্কায়িত জল-পর্বত অতিক্রম করে,—দস্যুখলদের তুচ্ছ করে নৌবাণিজ্য বিস্তার করতে পারে তবে"···

"থাম, থাম। আর আমাদের বুঝি বন্যজন্তু শ্বাপদ-সর্প স্থল-দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রখর রৌদ্রে, তীব্র শিশিরে দুর্বল বা বন্য বলদ চালিয়ে যেতে হয় না?"

রামদত্ত ততক্ষণে হেমধরের নৌকার দিকে এগিয়ে আসে।

"জয় হোক, সাংযাত্রিক।"

"জয় হোক, সার্থবাহ।"

"খবর কি?"

"অনেক নতুন পণ্য আছে।"

"বরুণ, বরুণ"—চেঁচিয়ে উঠলো নকুল। নোঙর ফেলা হচ্ছে। রামদত্ত ততক্ষণে তাঁর ছোট নৌকাটি লাগিয়ে দিয়েছেন হেমধরের পোতের গায়ে। তারপর লঘু পদক্ষেপে উঠে এসেছেন তরণীর গাত্রে সংলগ্ন সোপান বেয়ে। পেছন পেছন চন্দনদাস।

হেমধর এবার উত্তম বাণিজ্য করা সত্ত্বেও সমব্যবসায়ীকে মনের কথা বলেন নি। শেষ মুহূর্তের দুর্ঘটনায় তাঁর মন এখনো বিকল।

"উপবেশন করুন, সৌম্য" হেমধর এগিয়ে দিলেন দুটি গজদন্তখচিত বেদী।

"আপনাকে এত বিশুষ্ক দেখাচ্ছে কেন শ্রেষ্ঠী ?" রামদত্তের তীক্ষ্ণ চক্ষু হেমধরের আপাত-প্রসন্নতাকে ভেদ করে যেন দেখতে পেল।

"সত্য। কিছু চঞ্চল আছি। আমার একটি কন্যা কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"বাণিজ্যে এসেছে শ্রেষ্ঠীকন্যা ?" রামদত্তের চোখ কপালে উঠে গেল।

হেমধর একটু ইতস্তত করলেন ; তারপর বললেন,—

"না, ঠিক আমার কন্যা নয়।"

"তবে পালিতা কন্যা বুঝি ?"

"তা বলতে পারেন।"

"তাও নয় ? তবে কারুর বরাত বুঝি ? একবার দেখতে পাই না ?" রামদত্ত শেষ কথাটি বললেন হেমধরের প্রায় কানে কানে।

হেমধর হেসে মাথা নাড়লেন—

"না, না, ওসব নয়। বারযোষার ব্যবসা অনেককাল ছেড়ে দিয়েছি।"

রামদত্ত বুঝলেন গূঢ় ব্যাপার। আর কথা বাড়ান যাবে না। মুখে বললেন, "বড়ই অনুতাপের বিষয়। তবে আপনি যদি একবার রাজবৈদ্য শনিগুপ্তকে দেখান"...

"শনিগুপ্ত ?"

"আজ্ঞে ঐ হোল। আসল নাম মণিগুপ্ত। কিন্তু আমরা বলি শনিগুপ্ত। বাব্বাঃ আসল স্বর্ণলুব্ধ বটে। কথায় বলে, শ্রেষ্ঠীর মত ঠগী নেই, অমাত্যের মত লোভী নেই, কিন্তু বৈদ্যরা সবই।"

"হাঃ হাঃ হাঃ", হেসে উঠলেন হেমধর। তারপর বললেন,— "অর্থের জন্য ভাবনা করি না।"

"তবে আর কি ? আপনার একটি লোক দিন, আমি বৈদ্যের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। তিনি এখন ভৃগুকচ্ছেই আছেন। মানে, এসেছেন জলবণিকদের কাছে স্বর্ণ, মুক্তা কিঞ্চিৎ কম মূল্যে কেনবার জন্য।

স্থলবণিকেরা তো আবার স্থলে নিয়ে আসবার জন্য কিছু অধিক মূল্য চেয়ে ফেলে।"

হেমধর এবার আর হাসলেন না। রামদত্তের ব্যথা কোথায় তা বুঝলেন। তিনি হাঁক দিয়ে ডাকলেন,—

"নকুল, নকুল।"

নকুল এসে দাঁড়াল।

"এঁর সঙ্গে গিয়ে বৈদ্যরাজকে নিয়ে এস।"

রামদত্ত যেতে যেতে ফিরে এলেন,—

"একটি কথা, বৈদ্য এলে বলবেন তাঁর শিষ্য ধন্বন্তরিকে যেন একবার নিয়ে আসেন।"

"তিনি কে সৌম্য ?"

"একজন তরুণ বৈদ্য। কিন্তু অদ্ভুত তাঁর আয়ুর্বেদ-জ্ঞান। সে যেন কোন জন্মান্তরের সিদ্ধ সাধনার ফল। মনে হয় স্বয়ং অশ্বিনীকুমার বুঝি নেমে এসেছেন। কালে দেখবেন এই তরুণই রাজবৈদ্য হবে।"

"বেশ। তবে তাঁকে সঙ্গে নিয়েই যেন রাজবৈদ্য আসেন।" অসহিষ্ণু হয়ে ওঠেন হেমধর।

"ধীরে, বন্ধু ধীরে। রাজার বৈদ্য বড় যে সে লোক নয়। নামটি আমি আপনাকে আগেই বলেছি শনিগুপ্ত। শনিগ্রহকে প্রথম সন্তুষ্ট করতে হয়। সন্তুষ্ট রাখলেও সে নেবে। অসন্তুষ্ট হলে তো আর কথাই নেই। অগ্রে তিনি দেখুন। যখন ঔষধের তালিকা দেবেন তখন বলবেন যে এগুলি প্রস্তুতের জন্য একজন নিপুণ তরুণ বৈদ্য চাই।"

"বেশ। নকুল তুমি যাও। শীঘ্র বৈদ্যকে নিয়ে এস।"

"চল হে চন্দনদাস। আমরা আবার সন্ধ্যাবেলা আসব। তখন বাণিজ্যের কথা হবে। অনেক নতুন সামগ্রী আমরাও এনেছি হে শ্রেষ্ঠী। মধুচ্ছিষ্ট, লাক্ষা, কস্তুরী। চামরী গাইয়ের লেজের চামর এনেছি হিমবন্ত প্রদেশ থেকে ; প্রাগজ্যোতিষপুর থেকে এনেছি কালো

মেঘের মত হাতী। তাম্র ও অভ্রক এনেছি মগধ থেকে। আছে যক্ষধূপ, সরল দ্রব, কক্কোল ফল; আছে ছেলেদের খেলার কন্দুক, বিলাসিনীদের কূর্পাসক চোলি।"

"সাধু, সাধু। হস্তীর বিশেষ প্রয়োজন আছে। সিংহল-রাজ অশ্ব ও হস্তীর জন্য ভাল দাম দেন। কস্তূরীও কিছু দরকার। অন্য দ্রব্যাদি ও কিছু নেব।"

"আমাদের ও নেবার আছে। মরীচ, জীরক, উপকুঞ্চিকা, আর্দ্রক, সিন্ধুজ লবণ। তুরস্কের সিংহল গন্ধবাস এনেছ নাকি? জবনিকার ও কিছু প্রয়োজন।"

"সন্ধ্যেবেলায় তবে আসুন।"

প্রায় অচেতন মাধবীর ললাটে শীতল জলপটি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ধাত্রী কপিলা বীজন করছিল। হেমধর ধীরে ধীরে এসে প্রশ্ন করলেন —"এখন কেমন?"

"একটু ভাল। রক্ত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠী, কপাল যে ভাঙল। অঙ্গনষ্ট মেয়ে কি ঈশান ঠাকুর নেবেন?"

"চুপ কর। বৈদ্য আসবেন এখনি। হয় তো ভাল হয়ে যাবে। সবই মহাকালের ইচ্ছা।"

ঘণ্টা খানেক পরে বাইরে সোর উঠল—"বৈদ্য আসছেন, বৈদ্য আসছেন।" হেমধর উঠে দাঁড়ালেন। কপিলা অবগুণ্ঠন টেনে দিল। দ্রুতগতিতে প্রবেশ করলেন রাজবৈদ্য মণিগুপ্ত। কৃষ্ণকান্তি, কিঞ্চিৎ স্থূল বপু। পশ্চাতে পশ্চাতে নকুল নিয়ে এল তাঁর পেটিকা। তার পেছনে একজন তরুণ। উজ্জ্বল তাঁর চোখের দৃষ্টি। তার পেছনে রামদত্ত। চোখে উদগ্র কৌতূহল। কটাক্ষে বোঝালেন ভাগ্য প্রসন্ন —ইনিই তরুণ বৈদ্য ধন্বন্তরি। বৈদ্য-প্রধান প্রথমেই দেখলেন নাড়ী। মাথা নেড়ে বললেন,—"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী—সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

হেমধরের গলা চিরে আর্তনাদ বেরিয়ে এল,—"বাঁচবে না ?"

"আহা, স্থিরোভব। ধৈর্য ধরুন। দেখ তো, ধ্বন্বন্তরি, নাড়ী কি ভাবে যাচ্ছে, চটক পক্ষীর মত না শশকের মত ? সিংহগতি না গজগামী ? ভ্রূমধ্যে ওটি কি ? শোণিত বিন্দু"......

হেমধর বলে উঠলেন,—"না। নৌকা বন্দরে প্রবেশ করবার মুখে হঠাৎ এমন তরঙ্গ উঠলো যে আমি রত্নবেদী থেকে ছিটকে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটিকা খুলে ঐ বৈদুর্য্যখণ্ড কন্যার ভ্রূমধ্যে বিদ্ধ হোল।"

"নাড়ী কি বলে ধ্বন্বন্তরি ? অগুরু, চন্দন আর কর্পূর মিশিয়ে ক্ষতস্থানে দেবে না কি ? কেমন ধাতু দেখছ, পিত্ত-প্রধানা না বায়ু-প্রবলা ?"

"নাড়ী ভালই আছে। এখন আগে মণিখণ্ডটি বার করতে হবে।" ধন্বন্তরি বললেন প্রশান্ত কণ্ঠে।

"বল কি ? রক্ত ধারায় সবই যে প্লাবিত হয়ে যাবে। আগে বরং স্বাস্থ্যের উন্নতি করে"......

"আজ্ঞে না, গুরুদেব। স্বর্ণভস্মের যে প্রলেপটি আজ আপনি তৈরী করেছেন সেটিই এতে কার্য্যকরী হবে।"

বলা বাহুল্য প্রলেপটি ধ্বন্বন্তরিই তৈরী করেছেন। কিন্তু গুরুদেব চোখ মুদে বললেন—"হুঁ।" মনে মনে প্রসন্ন হলেও ত্রুটি একটি বার করতেই হবে। তাই বললেন,—

"আর তার জন্য যে জ্বালা হবে তা প্রশমনের উপায় ?"

"তার উপায় চরক বলেছেন গুরুদেব—হৈয়ঙ্গবীনের প্রলেপ ! আর"......

"আর ?" . ...

"জটামাংসীর সিদ্ধজল খাওয়ালে সুনিদ্রা হবে। এতে স্নায়ুও স্নিগ্ধ থাকবে।"

"বেশ, বেশ। আর প্রিয়ঙ্গু, দারুহরিদ্রা, গুগগুল, বংশলোচন,

তালিকা পত্র, তিল ও লাজ জলে মিশিয়ে স্নান করিয়ে দেবে।" মণিগুপ্ত বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন এতগুলো কথা বলে।

"অধিকন্তু ন দোষায়।" বলে ধ্বন্বন্তরি মৃদু হাসলেন।

ততক্ষণে হেমধরের নির্দেশে একটি থালিকায় শত স্বর্ণমুদ্রা এনে ধরেছে নকুল। মণিগুপ্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। মুখে বললেন,—"ধ্বন্বন্তরি, তুমি থেকে যাও। ক্ষতটি লক্ষ্য কর। কিছু ভয় নেই। ভীত হবার কারণ হলেই আমাকে খবর দেবে।"

হেমধর সসঙ্কোচে বললেন,—"ভদ্র, আপনার কাছে একটু নিবেদন আছে।"

"সঙ্কোচের কারণ নেই।" অভয় মুদ্রায় হাত তুলে ধরলেন মণিগুপ্ত।

"কন্যাটি মহাকাল মন্দিরের জন্য উৎসর্গিত। অঙ্গদোষ যেন না থাকে"......

অভয় মুদ্রা অব্যাহত রেখেই বললেন রাজবৈদ্য,—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এতটুকু চিহ্ন কোথাও থাকবে না।"

ধ্বন্বন্তরি মৃদু আপত্তি করলেন,—"একেবারে গেঁথে গেছে। একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন থেকে যাবে মনে হয়।"

মণিগুপ্ত ভুঁরু কোঁচকালেন,—"না, না, আমার অগুরু চূর্ণে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

রামদত্তের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আবার। মনে মনে বললেন, "তাই এত গোপনীয়? ঈশান আচার্যের বরাত?"

সব ঠিক হোল। তরুণ বৈদ্য শলাকা দিয়ে বৈদূর্য্য খণ্ডটি তুলে দিলেন। ক্ষতমুখে দিলেন প্রলেপ, চূর্ণ, নানা ঔষধির রস। তাঁর একান্ত শুশ্রূষায় ধীরে ধীরে ক্ষত নিরাময় হোল। কিন্তু ললাটে থেকে গেল একটি ছোট চিহ্ন। ধ্বন্বন্তরির বাক্যই ফলে গেল।

আচার্য্য ঈশানেশ্বর সব শুনেও দেখতে এলেন। দেখলেন আয়ুত

নয়ন, কুঞ্চিত কেশ, বর্তুল হস্ত, অশ্বত্থ পাতার মত ত্রিকোণ মুখ। আরো দেখলেন—

পা দুখানি যেন অস্থি পেশী শিরায় তৈরী সুগোল যন্ত্র। প্রশস্ত চতুষ্কোণ চরণ।

এই তো শাস্ত্রলক্ষণসম্মত কন্যা।

বিস্তৃত উরু, বর্তুল স্তন, চঞ্চল কটাক্ষ, এ তো পরে আসবেই। মহাপ্রকৃতির মায়াজাল ছেদ করবে কে? আর তার সাহায্যে এই নবনীতের মত দেহকে ধাতুর মত রূপ যদি দিতে না পারেন তবে তিনি নাট্যাচার্য কিসের?

চতুষ্কোণ চরণ নর্তকীর লক্ষণ।

এতো গৃহস্থ বধূ নয় যে ক্ষুদ্র চরণ সুলক্ষণ হবে।

মনে পড়লো তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যা বর্তমান নটিমুখ্যা কামাক্ষীর কথা। তার চরণের সঙ্গে এ কন্যাটির চরণের আশ্চর্য মিল। কিন্তু আরো যেন কমনীয়।

"হেমধর, এ কন্যাটিকে আমি নেব।" তাঁর কণ্ঠস্বর মন্দ্রিত হোল।

"আচার্যদেব, আমি লজ্জিত। অমলিন পুষ্প আপনি চেয়েছিলেন।"

"এ তো অমলিনাই। ওরে, ফুলের পাঁপড়ি তো ঈষৎ বাঁকাচোরা থাকেই, তাতে কি দোষ থাকে রে?" আচার্য সস্নেহে মাধবীর কচি অশ্বত্থপাতার মত মুখখানি তুলে ধরলেন। ধনুকের মত টানা কাল রেশমের দুটি ভুরুর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে আচার্যের মুখ উজ্জল হয়ে উঠলো।

"ওরে হেমধর, তোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন। দ্যাখ, দ্যাখ মহাকাল একে স্বয়ং চিহ্নিত করে দিয়েছেন।"

হেমধর ঝুঁকে পড়ে দেখলো সেই চিহ্নটি কবে একটি ছোট্ট ত্রিশূলের চিহ্ন হয়ে গেছে। হাল্কা একটি লাল জড়ুলের মধ্যে মনে হচ্ছে যেন

তৃতীয় নয়ন। ঈশানেশ্বর প্রসন্ন হাসি হাসলেন—"ত্রিনয়নের আবার ত্রিনয়ণী পছন্দ হোল বোধহয়।"

গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে মাধবীর তৃষ্ণার্ত মনও ভরে উঠেছিল। এ যেন তার হারানো পিতা। ছোট্ট মাধবী প্রণাম করবার জন্য নত হোল। আচার্য ঈশানেশ্বর প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করলেন,—

"স্বস্তি, স্বস্তি—মহাকাল তোমার সহায় হোন বৎসে।"

তারপর হেমধরের দিকে তাকিয়ে বললেন—"কল্য প্রভাতে আমরা উজ্জয়িনী যাত্রা করব। সার্থবাহ রামদত্তের গজশ্রেণী এবং উষ্ট্রশ্রেণী সেই সঙ্গে যাত্রা করবে। আজ থেকে একাদশ বৎসর পরে অষ্টাদশী মাধবীকে আমি মহাকাল মন্দিরে নৃত্যদ্বন্দ্বে উপস্থাপিত করব। সে দ্বন্দ্বে পরীক্ষা শুধু মাধবীরই হবে না, আমারও পরীক্ষা হবে। চব্বিশ বৎসর বয়সে আমি আমার গুরু আচার্য হরদত্তকে পরাজিত করে আমার শিষ্যা চারুদেষ্ণাকে নটিমুখ্যা করেছিলাম। তাকে বৈশালীতে পাঠিয়েছিলেন কুমারদেবী। তারপর শিখরিণী, যাকে পাণ্ড্যদেশে কূটনৈতিক কারণে উপহার দেওয়া হয়। তারপর নটিমুখ্যা হয় জয়সেনা; তারপর কামাক্ষী। এরা সবাই আমার শিষ্যা। চারবার আমি জয়লাভ করেছি। কিন্তু পঞ্চবক্ত্রের শেষ মুখটি আমি প্রসন্ন করে যাব এই আমার কত দিনের অভিলাষ। বার বার পাঁচ বার কোন গুরু জয়লাভ করেন নি। আচার্য শিবস্বামী তিনবার জয়লাভ করেছিলেন। তাঁর শিষ্য এবং আমার গুরু আচার্য হরদত্ত চারবার জয়লাভ করেছিলেন। এবার আমার পালা।" "আচার্যদেব, শুনেছি আপনার শিষ্য আচার্য কামরাজ এবার দ্বন্দ্বে যোগ দেবেন?" "শুধু যোগ দেবেন না। তিনি প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব করবেন। তাঁর শিষ্যা বসন্তমঞ্জরী নটিমুখ্যা কামাক্ষীর কন্যা। পূর্ব সংস্কার তার আছে। কিন্তু বৎস, দেবকৃপা, গুরুকৃপা ও পিতৃকৃপায় আমার এমন কিছু সঞ্চয় আজো আছে কামরাজ তার নাগাল পায় নি।" শাণিত তরোয়ালের মত আচার্য খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন একবার। বুক ভরে সমুদ্রের

হাওয়া নিলেন। আঃ! তারপর হেমধরের কাঁধে এক হাত রেখে অপর হাত মাধবীর মাথায় দিয়ে বললেন,—

"মনে রেখো বৎস, আজ থেকে একাদশ বর্ষ পরে বসন্ত ঋতুতে চন্দ্র যেদিন উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে প্রবেশ করবেন সেদিন মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সম্মুখে এই পরীক্ষা হবে।"

দুই

নৃত্যদ্বন্দ্ব, নৃত্যদ্বন্দ্ব, নৃত্যদ্বন্দ্ব।

দীর্ঘ একাদশ বৎসর ধরে মাধবী শুনে আসছে এই কথাটি। দিনের কর্মে, নিশীথের অবসরে জপমালার মত স্মরণ করছে এই শব্দটি। আজ সেই ব্রতের উদ্‌যাপন। এই একাদশ বর্ষ ধরে সে একই দিনলিপি অনুসরণ করেছে। ব্রাহ্ম মুহূর্তে শিপ্রা নদীতে স্নান—তারপর আচার্যের সঙ্গে মহাকালের ভস্মারতি দর্শন। প্রতিদিন আচার্য তাঁর ললাটে এঁকে দিয়েছেন ভস্মতিলক। প্রতিদিন আচার্য বলেছেন,—"কন্যা, দেখ, এই দেবতা তোমার স্বামী, প্রভু, দয়িত।"

তারপর গৃহে ফিরেছেন দুজনে। উজ্জয়িনী তখনো ঘুমে অচেতন। রাত্রির চেলাঞ্চল তখনো জড়ানো তার মুখে। আচার্য প্রাতঃবন্দনা করতে বসতেন। ধীরে ধীরে ভোর হয়ে আসতো। সদ্যস্নাত অমল উত্তরীয় পরিহিত মৃদঙ্গী দেবরাত এসে বসত তার স্থানে। মাধবী হাতে তুলে নিত মন্দিরা। মিলিত কণ্ঠে শুরু হোত গুরুবন্দনা। আচার্য্যের পদধ্বনি শোনা যেত।

সুরু হোত শিক্ষা।

ভঙ্গী, বৃত্তি, মুদ্রা, রেচক।

মধ্যাহ্নে আরতির ঘণ্টা বাজত মহাকাল মন্দিরে। আচার্য থেমে যেতেন। একটি দীর্ঘ প্রণামে আলম্বিত হোত তাঁর দীর্ঘ তনুযষ্টি।

দেবরাতের ইঙ্গিতে মাধবীও প্রণাম করত। প্রণাম সেরে উঠে দেখত আচার্যের প্রণাম তখনো শেষ হয় নি। প্রতিদিনই লজ্জা পেত সে। প্রতিদিনই ভাবত আরো নিষ্ঠা, আরো ভক্তি দিয়ে পরের প্রণামটি করবে। আচার্য উঠে বসতেন পদ্মাসনে। দেবরাত ও মাধবী উভয়ে প্রণাম করত আচার্যকে। দুজনের মাথায় হাত রেখে জপ করতেন আচার্য কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বিরাম।

এ অনুষ্ঠান রোজই হোত।

দেবরাত প্রথম দিনেই বলে দিয়েছিল মাধবীকে—"আচার্যকে প্রণাম না করে কোনদিন কাজ সুরু বা শেষ করবে না। আচার্য যদি ক্রুদ্ধ হন, তিরস্কার করেন, তবু প্রণাম করবে।" কথাগুলো প্রাণের মধ্যে গেঁথে নিয়েছিল মাধবী।

কাজের শেষে ফিরে আসত আপন কক্ষে। ধাত্রী কপিলা বসে আছে। দুপুরের এই কয়েক প্রহর তার নিজস্ব। চন্দনতেল দিয়ে সর্বাঙ্গ মর্দিত করে দিত কপিলা। কখনো বা হৈয়ঙ্গবীন আর কর্পূর দিয়ে। ঈষদুষ্ণ জলে স্নান হোত আর একবার।

দিবসের চতুর্থ যামে আসতেন পণ্ডিত ভীমরাজ শাস্ত্রী। তাকে পড়াতেন সংস্কৃত কাব্য, রামায়ণ, পুরাণ। ইদানীং এক নতুন কবির কাব্য ঋতুসংহার পড়াচ্ছিলেন। কবির নাম নাকি কালিদাস। গদ গদ কণ্ঠে ভীমরাজ বলেছিলেন—"বৎসরের আরম্ভে বসন্ত ঋতু। কিন্তু দেখ এই কবি গ্রীষ্ম বর্ণনা দিয়ে বৎসর সুরু করেছেন। বুঝেছ মাধবী, আগামী কালে গ্রীষ্ম দিয়েই বর্ষ শুরু হবে। পঞ্জিকাকেই কবির কথা শুনে চলতে হবে।"

মাধবী প্রতিবাদ করত। ছদ্ম কলহ সৃষ্টি করে বলত,—

"যাই বলুন, আচার্যদেব, বাল্মীকির মত কবি কেউ নয়। তাঁর বর্ণনা আর কালিদাসের বর্ণনা!"

"উদাহরণ?" ভীমরাজ শাস্ত্রী নিমীলিত নয়নে প্রশ্ন করতেন

তালবৃন্ত বীজন করতে করতে। মাধবী কেড়ে নিত তালবৃন্ত। তারপর নিজেই বীজন করতে করতে বলত,—

"ধরা যাক শরৎ ঋতু। এর বর্ণনায় বাল্মীকি বেদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

স চক্রবাকানি স শৈবলানি
কাশৈর্দুকূলৈরিব সংবৃতানি।
সপত্ররেখানি সরোচনানি
বধূমুখানীব নদীমুখানি।

আর আপনার ঐ কালিদাস, তিনি কি লিখেছেন?"

নিমীলিত নয়নেই ভীমরাজ আবৃত্তি করে উঠতেন,—

"কাশাংশুকা বিকচ-পদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা।
সোন্মাদ-হংসরব নূপুরনাদরম্যা।
অপক্ক-শালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপরম্যা॥"

মাধবী মুগ্ধ হয়। যদিও মুখে মানতে চায় না। মুখে বলে, "আহা, সবই তো মহাকবির অনুকরণ।"

"অনুকরণ নয় মাধবী,—স্বীকরণ।"

মাধবী হাসে।

কালিদাসের প্রতি ভীমরাজের প্রগাঢ় অনুরক্তি।

অপরাহ্নে কপিলার কাছে শিখতে হোত কবরীসজ্জা—মাল্যরচনা—গন্ধানুলেপন। কাজল, চন্দন, লাক্ষা দিয়ে সাজিয়ে তুলতে হোত তনুদেহ। আচার্য ঈশানেশ্বর চলে যেতেন মহাকাল মন্দিরে সন্ধ্যা-আরত্রিকে। সন্ধ্যায় মাধবীর যাওয়া নিষেধ। এখন শুধু দেবদাসীদের পালা। তারা মহাকাল-প্রিয়া। সে ভাবী বধূ।

সন্ধায় আসত মৃদঙ্গী দেবরাত।

প্রভাতের শিক্ষারই অনুশীলন চলত।

দেবরাত ছিল শান্ত রসের মানুষ।

ঈশানেশ্বরের কাছে ভঙ্গীর দ্বিতীয় আবৃত্তি কখনো কখনো ভৎর্সনায় ভুল হয়ে যেত দেবরাত তা শুধরিয়ে দিত এই অবসরে। প্রথম প্রথম দেবরাত না বুঝিয়ে দিলে মাধবী কি কিছুই শিখে উঠতে পারত?

না, কিছুতেই নয়।

আরম্ভ, শব্দ, বর্ণ, জ্যোতিঃশরণ, শতপাদা, সহস্রপাদা—একটি একটি করে মুদ্রা—অঙ্গহার—করণ সবই তাকে যত্নে শীলন করিয়েছে দেবরাত। দেবরাত বসন্তমঞ্জরীরও সহবাদক। তার মত মর্দলী যে উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় নেই। কঠিন শপথ করিয়ে নিয়েছেন কামাক্ষী এখানের বোল তাল যেন মাধবীকে কখনো শেখান না হয়। শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন আচার্য ঈশানেশ্বরও। মাধবীর পদবন্ধের তিলমাত্রও যেন বসন্তমঞ্জরী না জানে। দেবরাত শান্তকণ্ঠে বলেছিল,—

'তাই হবে নটিমুখ্যা।'

'তাই হবে গুরুদেব।'

এক মুষ্টি কর্পূর দীপে তুলে দিয়ে শপথ করেছিল সে। মহাকালের প্রদীপ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল ক্ষণকালের জন্য। মাধবীর কালো ভীরু চোখের দিকে তাকিয়ে সে কি ভুলে গিয়েছিল তার প্রতিজ্ঞা?

না, তা তো নয়।

আসল কথা দেবরাতও ছিল নৃত্যশিল্পী। তার মাথায় আসত নতুন নতুন ছন্দ। সে কথা জানতেন না আচার্য ঈশানেশ্বর—জানতেন না নটিমুখ্যা কামাক্ষী। নটী জয়সেনার গূঢ়পুত্র দেবরাত দৈব বিড়ম্বনায় নাচ ছেড়ে মর্দলী হয়েছিল। চারু শিল্প ছেড়ে হয়েছিল কারুশিল্পী। মাধবীও অবাক মেনেছিল এই ছান্দসিকের নাচেব অধিকার দেখে। সেই ঘটনাই বলি। মল্লঘটি নৃত্য শিখতে শিখতে ভৎর্সিত হোল মাধবী। ক্রুদ্ধ আচার্য নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন গৃহ থেকে আর ত্রয়োদশী মাধবী কান্নায় ভেঙে পড়ল।

আচার্য ভাবছিলেন সব ছাই, সব ভস্ম। মহাকাল, দেবতা—

তোমাকে অমলিন পুষ্প দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দিতে হবে ভস্ম। শিপ্রা নদীতে স্নান সেরে ফিরে আসতে আসতে কিন্তু আচার্যের ক্রোধ শীতল হয়ে গিয়েছিল। মনে হোল তিনি অন্যায় ক্রোধ করেছেন। রুদ্রকোশী এই তাল একি আয়ত্ত করা সহজ? স্বয়ং শম্ভু যার স্রষ্টা। এ তাল আয়ত্ত করতে কামাক্ষীর লেগেছিল একমাস। চারুদেষ্ণার আরো বেশী। সেখানে মাধবী মাত্র একদিনে সমগ্র তালে নৈপুণ্য কেমন করে দেখাবে? ঈশানেশ্বর বুঝলেন তাঁর অস্থিরতা। বার্ধক্য ঘনিয়ে আসছে। সম্মুখে মৃত্যু। বারাণসী যাত্রার জন্য মনটা উতলা হয়ে আছে। অথচ রিপু এখনো শাসিত হোল না? স্থির করলেন সমগ্র দিন মহাকালের জপ করে কাটাবেন। সন্ধ্যায় গৃহে ফিরে দেখলেন কন্যা তখনো দেবরাতের সঙ্গে নৃত্য অভ্যাস করছে।

সাধু, সাধু।

উত্তম, উত্তম।

এক দিনের মধ্যেই সে সেই কঠিন পদকাকু আয়ত্তে এনেছে।

'বৎসে।' দুবাহু প্রসারিত করে দিয়েছিলেন তিনি।

'পিতা।' বিস্তৃত বক্ষের মধ্যে মুখ লুকিয়েছিল মাধবী।

যোগীর মত সুন্দর দেহ ছিল ঈশানেশ্বরের। বিস্তৃত বক্ষ—সিংহ জিনি কটি—মেদহীন দীর্ঘ দেহ। মাধবীর মাথায় কনক ধুতুরার ফুল দিয়ে তিনি আশীর্বাদ করেছিলেন তার নিরলস সাধনাকে। সেদিন থেকে অনুমতি দিয়েছিলেন দেবরাতকে,—

"তুমি প্রতি সন্ধ্যায় এসে মাধবীকে চর্চা করাবে।"

"সন্ধ্যারত্রিকে যাব না গুরুদেব?"

"না। দেবদাসীদের সঙ্গে না হয় শার্দুল বাজাবে।"

একটি নতুন অধ্যায় খুলে গেল মাধবীর সামনে। আশ্চর্য ধৈর্যে ও পরম প্রেমে দেবরাত নিবেদন করে দিল তার সন্ধ্যাগুলি মহাকালকে নয়,—মহাকাল-বধূকে। মাধবী কি বুঝতে পেরেছিল দেবরাতের মনকে? কে জানে! কিন্তু উভয়ের মধ্যে শিল্পনিষ্ঠার যবনিকা

কোনদিন উঠে যায় নি। দেবরাতের প্রেম দেবরাতকে আরো মহৎ শিল্পী করে তুলেছিল। কত নতুন বৃত্তি—কত নতুন ছন্দ—কত নতুন গতিই না সে মাধবীকে শিখিয়েছিল এই নিভৃত অবসরে। ত্রিপদা, চতুষ্পদা, ভ্রামরী চক্র, সর্পকুণ্ডলী, হংসগতি।

ভ্রামরী চক্র শিখিয়ে বলেছিল দেবরাত—"এ নাচ কখনো নেচো না।"

"কেন?"

"যদি প্রেমে কোনদিন দুঃখ পাও—যদি তোমার জীবনের মূলবৃন্তে কোনদিন নাড়া লাগে তবেই এ নাচ নাচবে। নয় তো নয়।"

মাধবী শুনে হেসে উঠেছিল তরল কণ্ঠে। তারপর কি একটা কৌতুক করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেবরাতের চোখে জল। সেই একটি দিন।

দীর্ঘ একাদশ বছরের মধ্যে আর মনে পড়ে না।

পরদিন থেকে দেবরাত আবার শান্ত।

রাত্রিতে আবার কর্পূর চন্দন সুবাসিত জলে স্নাত হয়ে শুক্লবস্ত্র পরিহিতা মাধবী শয়ন করতে যেত ধাত্রেয়ীর কাছে। এই কর্মসূচী সে পালন করে এসেছে দিনের পর দিন। কোনো ছেদ নেই। আজকের চৈত্র সন্ধ্যায় উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে তার ব্রতের উদ্‌যাপন।

মাধবী আজ শিপ্রা নদীতে গেল না। সন্ধ্যার শুভলগ্নে বরকে দেখবে বধূ। তার পূর্বে নয়। ঘরে রাখা সপ্ততীর্থের নীরে স্নান সেরে নিল। আজ তার হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত। না জানি কি হবে? গুরুদেব উত্তরাস্য হয়ে ধ্যান করছেন। মাধবী প্রণাম করল। চিরদিনের মত মাধবীর মাথায় হাত রাখলেন আচার্য। চিরদিনের মত আজও বললেন "মহাকাল তোমার সহায় হোন।" চিরদিনের মত দেবরাত শুক্ল উত্তরীয়ে অঙ্গ ঢেকে মর্দল নিয়ে বসল।

আচার্য বললেন—"আজ আর দেহকে ক্লান্ত কোর না মাধবী।"

"আজ কিছু শিখব না গুরুদেব?"

"বৎসে, প্রফুল্ল চূতাঙ্কুরের মত তীক্ষ্ণ হোক তোমার পদকারু, সপুষ্পক্রমের মত হোক তোমার অঙ্গহার, সপদ্মসলিলের মত হোক তোমার মুদ্রাকীর্ণ গতি। তুমি মহাকালের প্রিয়তমা বধূ হও। তোমাকে দেবার আর কিছু নেই।"

মহাকাল মন্দিরের শুভ্র পতাকা নীল আকাশে উড়ছিল যেন কোন মানসসরোবরকামী মরাল। পতাকার নীচে শিখর। শিখরে ত্রিশূল। পাথরের বিশাল মন্দির। তার গায়ে কত না কারুকার্য। দেব, বিদ্যাধর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, সিদ্ধ, ভূত। লতা, পাতা, ফুল, ফল, অশ্ব, হস্তী, তরণী। বিশ্বনিখিল সেখানে সমাগত। গর্ভগৃহে অনাদি লিঙ্গ। নিরাভরণ। শুধু তার উপরে একটি শ্বেত-ধুতুরার ফুল। কোণে একটি বৃহৎ ঘিয়ের প্রদীপ। দেবাদিদেবের বাইরে অনেক আয়োজন।

ভেতরে কিছুই নেই।

শুধু এক নিরাভরণ মহাসত্য ত্রিকালের দিকে নির্ণিমেষে তাকিয়ে দেখছেন জগতের রঙ্গ,—মানুষের পাপ পুণ্য, সত্য মিথ্যা, সুখ দুঃখ। নির্বেদ, নির্বিকার।

তবু সেই উদাসীন যোগীশ্বরের পায়েই দুর্বল মানুষ মাথা কোটে। তাঁকে ঘিরে উৎসবের আয়োজন সাজায়। যদিও প্রভাতের ভস্মারতির মধ্যে ফুল থাকে না, নৈবেদ্য থাকে না। শুধু থাকে ছাই। সেই অঙ্গার-অর্পণ হয়তো ইঙ্গিত করে,—কিছুই কিছু নয়। নাকি সবই সত্য!

নাটমণ্ডপের চারদিকে উজ্জয়িনীর নাগরিকবৃন্দ উদ্বেলিত সমুদ্রের মত ফুলে ফেঁপে উঠছিল। বার বার ভেঙ্গে ভাসিয়ে দিতে চাইছিল চৌরদ্ধরণিক রবিগুপ্তের দণ্ডপাশিক শ্রেণীকে। একদিকে মহামণ্ডলেশ্বর-দের বেদী—মধ্যভাগে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আসন। তাঁর দক্ষিণ পাশে বসবেন মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত। বামপাশে মহাপ্রতীহার ভানুগুপ্ত।

জীবগুপ্তের পাশে বসবেন মহাধর্মাধ্যক্ষ বুধগুপ্ত। তাঁর পাশে মহাসান্ধি-বিগ্রহিক নৃসিংহগুপ্ত। তারপর মহাবলাধিকৃত হলায়ুধ বর্মা। তারপর যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর সহাধ্যায়ী বন্ধুবর্গ—কালিদাস, অমরসিংহ, ধন্বন্তরি, ঘটকর্পর, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট, বররুচি ও বরাহমিহির। এঁদের মধ্যে অনেকেই এসে গেছেন পূর্বাহ্নে। পাটলীপুত্র থেকে এসেছেন সোমদত্তের পুত্র বররুচি। চঞ্চুবৎ নাসা নিয়ে ক্ষপণক ইতস্তত ঘুরছিলেন বিরসমুখে। তিনি বৌদ্ধ। নৃত্যগীতে তাঁর রুচি নেই। কিন্তু মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত আসছেন। তদুপরি যুবরাজ তাঁর সহাধ্যায়ী। তদুপরি······এই তদুপরি কথাটা ভেবেই তাঁর বিরক্তি লাগছিল। সব নষ্টের গোড়া ঐ অমরসিংহ। কি এক অভিধান লিখছে। তার জন্যে বৃত্তি চাই। বৃত্তি চাই তো সোজা পাটলীপুত্রে চলে যাও। তা না পৃষ্ঠপোষক করা হয়েছে কালিদাসকে। বিপদ এই যে অমরসিংহও বৌদ্ধ। এখন সে যদি এই নৃত্যগীতে যোগ দেয়, ক্ষপণক না এলে ভাল দেখায় না। সৌজন্যও তো আছে। আসলে ঠিক তাও নয়। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তকে ক্ষপণক মনে মনে ভয় করে চলেন। বড় খর দৃষ্টি তাঁর। মর্মভেদী দৃষ্টি।

নাবধ্যক্ষ ইন্দ্রগুপ্ত এবং চৌরদ্ধরণিক রবিগুপ্ত ইতস্তত পর্যবেক্ষণ করে দেখছিলেন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি আছে কি না। ও দিকে শ্রাবণ দামিনীর মত তিরস্করিণীর অন্তরালে ঝলকিত হচ্ছে নূপুর-লাস্য। এমন সময় ধন্বন্তরি প্রবেশ করলেন ব্যস্তসমস্ত ভাবে। রবিগুপ্ত ছুটে এলেন —"মহারাজ এখনো যাত্রা করেন নি?"

"এই এলেন বলে।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি শোনা গেল। দণ্ডপাশিক হরগুপ্ত শ্রেণীবদ্ধ করে দিয়েছে জনতাকে। দূরে দেখা গেল মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের শ্বেতছত্র। জনতা ধ্বনি দিয়ে উঠল,—"পরম মহেশ্বর পরম ভট্টারক পবম ভাগবত মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের জয়।"

মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত আসন গ্রহণ করলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল।

ধ্বনিত হয়ে উঠলো হরিষেণের প্রশস্তি,—সংকাব্য শ্রীবিরোধ···প্রশস্তি পাঠ শেষ হোল। নিস্তব্ধ পৌরসঙ্ঘ আবার জলোচ্ছ্বাসের মত তরঙ্গিত হোল জয়ধ্বনিতে। জনপ্রিয় রাজা সমুদ্রগুপ্ত। দুটি দীর্ঘবাহু তুলে অভয় মুদ্রায় সমবেত সুধীবৃন্দকে জানালেন অভিবাদন। স্বস্তি, স্বস্তি। রাজা আসন গ্রহণ করলেন। এমন সময় শালপ্রাংশু মহারাজের পেছনে নবশালতরুর মত সুঠাম কুমার চন্দ্রগুপ্ত লাজুক চরণে এসে আসন গ্রহণ করলেন। তাঁকে চেনা মাত্রই আর একবার উদ্বেলিত হয়ে উঠলো জনসমুদ্র। উজ্জয়িনীর প্রিয় রাজকুমার দাঁড়িয়ে উঠে প্রত্যভিবাদন জানালেন।

চৌরদ্ধরণিক রবিগুপ্তকে রীতিমত বেগ পেতে হোল জনতাকে সামলাতে। হরদত্তের দণ্ডপাশিক শ্রেণীর শৃঙ্খল বারংবার ছিঁড়ে যেতে লাগল। মহাপ্রতীহার ভানুগুপ্ত পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ঠিক আয়ত্তাধীন আছে কিনা সে সম্বন্ধে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের ক্রূর জিজ্ঞাসু দৃষ্টি কিছুক্ষণ তাঁকে সহ্য করতেই হয়েছিল। নৃসিংহগুপ্তকে একটু ভয়ই পেতেন ভানুগুপ্ত। লোকটি যেন কঠিন লোহায় তৈরী। কিই বা এমন বয়স। যুবরাজের চেয়ে অল্পই বড়। কিন্তু রাজনীতিতে তাঁর দক্ষতা স্বয়ং সমুদ্রগুপ্তের কাছেও শ্লাঘ্য। অত্যন্ত বলবান—অমিতভোগী—কঠিন পরিশ্রমী এই মানুষটি গুপ্ত-সাম্রাজ্যের যশোবৃদ্ধির জন্য না পারে এমন কাজ নেই। এমনি বেশ আছে হাসছে—মৃগয়ায় যাচ্ছে—শৌণ্ডিকবীথিতে গিয়ে গৌড়ী কিনছে। হঠাৎ যেন কেমন কঠিন হয়ে উঠতে পারে—চলে যেতে পারে সুদূরে। সহসা শাস্তি দান করতে পারে অন্তরঙ্গ সুহৃদকেও যদি তার মনে হয় সে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ করছে। তাঁকে একটু ভয় হয় বৈকি। রাজার বড় বেশী প্রিয়পাত্র যে!

ডিণ্ডিম, ডিণ্ডিম, ডিণ্ডিম।

সহসা বেজে উঠলো যশোঃপটহ।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল বীণার ক্বণিন, বংশীর শুষির, মৃদঙ্গের ধ্বনি,

ঘন করতালের আতোন্ত। মহাকালের বন্দনা গানের সঙ্গে তিরস্করিণীর জাল উঠে যেতে লাগল। মণ্ডপের একপাশে আচার্য ঈশানেশ্বর, মৃদঙ্গী দেবরাত, অন্যদিকে গুরু কামরাজ, মর্দলী শার্দুল।

কে সুরু করবেন ?

এই প্রশ্ন উচ্চকিত হোল চারিদিকে।

জনতা ঠেলে এই সময় আবির্ভূত হলেন কালিদাস। চম্পকবর্ণ পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয় পরে। কপালে চন্দনতিলক। নবোদ্ভিন্ন কাকপক্ষ। স্বপ্নময় চোখ। কুমার চন্দ্রগুপ্ত উঠে দাঁড়িয়েছেন।

"এসো, এসো কালিদাস। এত বিলম্ব কেন ?"

কালিদাস ? কালিদাস ! ইনিই সেই কালিদাস ! এরই লেখা ঋতুসংহার ? পড়েছি বৈকি। বড় মধুর। সুশ্রুত। গুঞ্জন শোনা গেল একটা। তাকালেন নৃসিংহগুপ্ত ; ঝুঁকে পড়লেন ধর্মাধ্যক্ষ। মহামন্ত্রী আড় চোখে দেখে নিলেন।

"পিতা, এই আমার বন্ধু কবি কালিদাস—ঋতুসংহারের রচয়িতা।" চন্দ্রগুপ্ত কালিদাসকে সম্রাটের সম্মুখে উপস্থিত করলেন এক নিমেষেই। সম্রাট উঠে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন কবিকে। তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ মন্দ্রিত হয়ে উঠলো—"সাধু, সাধু। এত তরুণ বয়সে এই আশ্চর্য উদ্যম। কবি তোমার ঋতুসংহার পড়ে এবার যুদ্ধের সময়েও বড় আনন্দ পেয়েছি। মনে হোল শিপ্রাতীরে গ্রীষ্মসন্ধ্যার কবিস্বপ্নই ঋতুসংহার।"

কালিদাস বিনীত নমস্কার জানিয়ে দণ্ডায়মান রইলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁকে ধরে নিয়ে বসালেন নিজের আসনের একাংশে। পেছন থেকে ঘটকর্পর চেঁচিয়ে উঠলেন,—"কুমার, মনে রাখবেন ওঁর কাব্যে যমক নেই। আমার কাব্যে আছে।"

অমরসিংহ হাসলেন—"ওহে ঘটকর্পর, তোমার যমকই আছে। কাব্য কোথায় ?"

"হবে হবে। কাব্যও হবে। আর সে কাব্যে কালিদাসকেও ছাড়িয়ে যাব।" ঘটকর্পরের ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনা গেল।

"আগে হোক, তারপর বোল।" ধন্বন্তরি উত্তর দেন।

"কিন্তু পুরস্কার যে ভাই আগেভাগেই শেষ হয়ে গেল।" ঘটকর্পরের ছলকারুণ্যে সবাই হেসে উঠলেন। এমন কি নৃসিংহগুপ্তও।

রঙ্গমঞ্চে সবাই অপেক্ষা করে আছেন দেখে মহাধর্মাধ্যক্ষ বুধগুপ্ত বললেন—"আমি বলি কি নটিমুখ্যা কামাক্ষীর কন্যাই সুরু করুন।"

"তুমি কি বল কবি?" সমুদ্রগুপ্ত সস্নেহ দৃষ্টিপাত করলেন কালিদাসের দিকে। কালিদাস সলজ্জ বিনয়ে উত্তর দিলেন "আচার্য-দ্বয়ের মধ্যে যিনি প্রবীণতর তাঁর কাজই প্রথম হওয়া সঙ্গত।"

সমুদ্রগুপ্ত সোল্লাসে বললেন—"সাধু, সাধু। আচার্য ঈশানেশ্বর আপনি আপনার শিষ্যাকে শুভারম্ভ করতে আদেশ দিন।"

আচার্য ঈশানেশ্বর বললেন,—"তাই হোক মহারাজ।"

সূক্ষ্ম রক্তাংশুকে আবৃতা মাধবী এসে মঞ্চে প্রবেশ করল। যেন তরুণী উষা। আরম্ভ, শব্দ, বর্ণ শেষ হোল। আহা, সে এক রূপরসভরা স্বপ্নজগৎ। তারপর এলেন বসন্তমঞ্জরী। যেন দিগঙ্গনার লীলাসঙ্গিনী। অপরূপ সুরে তালে দেখালেন শব্দ, বর্ণ। তুল্যমূল্য। কোথাও কম নেই, বেশী নেই। জনতা রুদ্ধশ্বাস হোল। তবে কি এবার দুজন নটিমুখ্যা হবে? মহাকাল কি একত্রে গ্রহণ করবেন দুটি বধূকে? কিন্তু তাতো হয় না।

সমুদ্রগুপ্ত বললেন—"এবার তবে মহাজ্যোতিশরণম্ হোক।"

আচার্য ঈশানেশ্বর হাসলেন—"তাই হোক।"

গুরু কামরাজও মাথা নাড়লেন—"হোক।"

হোল।

মাধবী নাচল। সে নাচ ভক্তির আকুলতায় শোণিম। আর বসন্ত-মঞ্জরী যে নাচ নাচলেন আসবের মত তা মদির। পুরুষের রক্তধারায় আগুন ছুঁইয়ে গেল যেন নারীসত্তার আর্তি।

জনমত দ্বিধা হয়ে গেল। দ্বিধান্বিত হলেন মণ্ডলেশ্বরগণ। ঈশানেশ্বরের ললাটে ভ্রূকুটি। কামরাজের মুখে স্পষ্ট জয়োল্লাস।

সমুদ্রগুপ্ত বিড়ম্বিত মুখে তাকালেন কালিদাসের দিকে। শুধালেন,—"তুমি কি বিচার কর কবি?"

"বিচারক আপনি মহারাজ। আমি সংশ্লেষণ করি—বিশ্লেষণ আমার কাজ নয়। তবে আমার মনে হোল একটি নাচ ফুল্লারবিন্দের স্বপ্ন—অপরটি জ্বলন্ত নক্ষত্রের তৃষ্ণা।" কালিদাস উত্তর দিলেন।

"দুটিই সুন্দর। নয় কি?"

"দুজনকেই পুরস্কৃত করুন।"

"নিশ্চয়।"

কিন্তু নটিমুখ্যা কে হবে?

কে হবে মহাকালবধূ?

"তাহলে পদম্ নাচতে বলুন মহারাজ। দেখুন ভক্তিমতী কে?"

পদম্ নাচের সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল মাধবীর নৃত্যদীক্ষা বসন্তমঞ্জরীর চেয়েও কত গভীর। একটি নাচে ভক্ত সাধিকার আত্মনিবেদন। অন্যটি কেলিকপটিনী লীলাময়ীর। কিন্তু মহাকাল কি চান? আসক্তি না ভক্তি? আচার্য ঈশানেশ্বরের মুখ হাস্য-জ্যোতিতে বিমল-প্রভ। গুরু কামরাজের মুখ রুদ্ধক্ষোভে ঈষৎ তাম্রাভ। হার হয়ে গেছে। তবু হার মানবার মেয়ে নন নটিমুখ্যা কামাক্ষী। মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তাঁকে বিশেষ স্নেহ করেন। জনতার ভিড়ের মধ্যে তার সাজানো লোকও আছে। তাদেরি একজন উঠে দাঁড়ালো,—

"আমরা নটিদ্বয়ের ত্রিপাদা, চতুষ্পাদা দেখেছি। আর তাঁরা কি দেখাতে পারেন?"

গুরু কামরাজ ইঙ্গিত বুঝলেন। তিনি বলে উঠলেন,—"আমার শিষ্যা দেখাবে ষটপাদা, শতপাদা, সহস্রপাদা।" গুরু ঈশানেশ্বর শুনেই বুঝলেন—এ রাজনীতি। একবার ভাবলেন এ চাতুরীর প্রতিবাদ করবেন। পদম্ নাচের পরেও আবার প্রতিযোগিতা

কিসের? তা ভিন্ন এতো নৃত্য নয়—এযে ব্যায়ামপ্রদর্শনী। কিন্তু দেবরাত তাঁকে নিষেধ করল।

"কি বলছ দেবরাত? এতো চাতুর্য।" ক্ষুব্ধ ঈশানেশ্বর গুমরে উঠলেন। "মাধবী পারবে।" দেবরাতের কণ্ঠে দৃঢ়তা।

ঈশানেশ্বর কিছুতেই স্মরণ করতে পারলেন না এসব পাদভেদ তিনি শিখিয়েছেন কি না। এ তো শিল্পের মায়া নয়, যাদুর মায়া। নটির কলা এতে ফোটে না—ফোটে মৃদঙ্গীর কৃতিত্ব। আর ফোটে নটির ব্যাকরণ জ্ঞান। কিন্তু ব্যাকরণ কি কাব্য?

সহস্রপাদা নৃত্যান্তে স্বেদাঙ্কুরব্যথিত কপোল কিন্তু জয়ধ্বনিতে হাস্যমুখরা বসন্তমঞ্জরী নেপথ্যে প্রস্থান করল। মাধবী এসে দাঁড়ালো তার স্থানে। একটি উতরোল তরঙ্গের পাশে এসে দাঁড়ালো একটি পুষ্পের আত্মা। সুরু হোল নাচ।

সহস্রপাদায় শেষ করেছিল বসন্তমঞ্জরী।

সহস্রপাদা থেকেই সুরু করল মাধবী।

এক সহস্র, দুই সহস্র, ত্রিসহস্র, চতুর্সহস্র।

জনসঙ্ঘের মনে হোল সারা দ্যুলোক ভূলোক দুলছে—স্বর্গ মর্ত অন্তরীক্ষকে পরিক্রমা করছে এক নূপুরধ্বনি। যে ধ্বনি মন্ত্রের মত বলছে—ওম্, ওম্, ওম্।

নাচ সমাপ্ত হবার পরেও কয়েক মুহূর্ত লোকে বুঝল না নটী প্রস্থান করেছে। কানে তখনো বাজছে রেশ—রিমঝিম রিমঝিম—রিম ঝিম। চোখে তখনো ঘুরছে ঘোর—এক আলোকিত চক্রবৃত্তি।

তারপর?

একি সম্ভব?

একি ইন্দ্রজাল?

জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ল জনসঙ্ঘ।

ক্ষিপ্তা কামাক্ষী একবার বলতে চাইল—"মূর্খ—নির্বোধ, তোরা যাদুতে ভুললি?—ভুললি মায়াচাতুর্যে?"

কামরাজ নিরস্ত করলেন।

চাতুর্য তো তাঁরাই দেখাতে চেয়েছেন।

রাজা ডেকে পাঠালেন তুই নটিকেই। কম্পিততনু মাধবীর কানে বাজছে আচার্যের কণ্ঠস্বর,—"পুষ্পমালিকা যদি পাও তবে ইহকাল পরকাল তোমার মুক্ত হয়ে গেল. বৎসে। রত্ন-মালিকা যদি পাও তবে ইহকালে কোন দুঃখই পাবে না। কিন্তু পরকালে? জানি না। প্রার্থনা করি সে সম্মান যেন তোমার না জোটে।"

নবরত্নের মালা পরিয়ে দিলেন সমুদ্রগুপ্ত মাধবীর কণ্ঠে আর বসন্ত-মঞ্জরীর কণ্ঠে সিংহলীমুক্তার মালা। কিন্তু পুষ্পমাল্য? এক-মুহূর্তে নিখিল জগৎ আচ্ছন্ন হয়ে এল মাধবীর সামনে। দূরাগত ধ্বনির মত সহসা ধ্বনিত হোল গুরুদেবের অভয়বাণী,—"মহাকাল, তোমার সহায় হোন বৎসে।"

সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র যূথীর মালা কণ্ঠে এসে পড়ল।

শুচিসুন্দর।

দেহমন যেন স্নিগ্ধ হয়ে গেল তার স্পর্শে।

মাধবীর দ্বন্দ্ব কি লক্ষ্য করতে চেয়েছিলেন সমুদ্রগুপ্ত? তিনিও তো শিল্পী। প্রসিদ্ধ বীণাবাদক।

মধুর হেসে বললেন মাধবীকে,—"উজ্জয়িনীর ভূষণস্বরূপা হও।" আচার্য বললেন—"মহাকালের প্রিয়কামিনী হও।"

মাধবী অভিবাদন করল সম্রাটকে; নত হয়ে পদধূলি নিল আচার্যের। বিহ্বলা মাধবীর মনে হচ্ছিল সবই স্বপ্ন। শিপ্রানদীর তীরে ছোট কুটিরের অন্তরালে যে মেয়েটি দিন কাটিয়েছে ভুবনবিজয়ী সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাকে কি বললেন? উজ্জয়িনীর ভূষণ স্বরূপা হও?

এ কি আশীর্বাদ?

না, এ আদেশ।

মাধবীর মনে হোল সারা জীবন দিয়ে তাকে পালন করতে হবে। উজ্জয়িনীর আলো তাকে জ্বালিয়ে রাখতে হবে চিরকাল। মাধবীর

কল্পনায় রসতরঙ্গ তুলল সমুদ্রগুপ্তের স্বর। সম্রাটের বিশ্বাসের যোগ্যা হও, নিজেকে মনে মনে বলল সে। আচার্য ঈশানেশ্বর বললেন—"মহারাজ, পঞ্চবক্ত্রের শেষ মুখটি প্রসন্ন করে যাব এই ছিল আমার সঙ্কল্প। তিনি আমার সে প্রার্থনা পূরণ করেছেন।"

কামাক্ষী উঠে দাঁড়ালেন বিবর্ণ মুখে—"মহারাজ, এবার আমাদের বিদায় দিন।" মহারাজ বললেন—"এত শীঘ্র? আচ্ছা, এস।" কামরাজের সঙ্গে কামাক্ষী ও বসন্তমঞ্জরী অভিবাদন সেরে বিদায় নিল। নৃসিংহগুপ্তও সহসা পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেলেন। ঈশানেশ্বরের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এল। ঝড়ের সূচনা যেন। কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত বড় প্রসন্ন ছিলেন আজ। তাঁর শিল্পী মন শিল্পাস্বাদে বড় তৃপ্তি পেয়েছে। তাই সেদিকে লক্ষ্য না করেই বললেন,—

"আসন গ্রহণ করুন, আচার্য। বোস মাধবী। কুমার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেই। আর ইনি—ইনি কবি কালিদাস—সম্প্রতি ঋতুসংহার নামে একটি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেছেন। ওঁর পাশে যিনি বসে আছেন বয়সে তরুণ হলেও তিনি সুবিজ্ঞ চিকিৎসক। ধন্বন্তরি। কালে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও ছাড়িয়ে যাবেন। এঁরা সকলেই আমার পুত্রের বান্ধব। কিন্তু মাধবী, আমার পুত্রের বান্ধবী কেউ নেই। তুমি হোতে পারবে?" সমুদ্রগুপ্তের পরিহাসে সবাই হেসে উঠলেন। কিন্তু আচার্যের ভ্রূকুঞ্চিত হোল আবার। মাধবী তার বিশাল দুটি নয়নের অপাঙ্গে দেখল মূর্তিমান দেবসেনাপতির মত সুন্দর তরুণ কুমার চন্দ্রগুপ্ত। সে মুহূর্তে তার হৃদয়ে ঘনিয়ে এল এক পরম আবেগ—এই কি ভালবাসা? মাধবী দেখল না ঠিক সেই ক্ষণে স্বপ্নমেদুর চোখে এক কিশোর তার দিকে তাকিয়েছিল। কবি কালিদাস।

আকাশে চন্দ্র তখন পূর্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের মধ্যবর্তী। শুভলগ্নে শুভদৃষ্টি হয়ে গেল মাধবীর সেই মুহূর্তে।

আচার্য ভুল করেছিলেন।

সে শুভদৃষ্টি মহাকালের সঙ্গে নয়।

তিন

এক নতুন আলোয় যেন দুজনে দেখল দুজনকে।

এক নতুন সুখের তরঙ্গে যেন দুজনে ভেসে গেল অকূলে।

আজো মনে পড়ে নৃত্যদ্বন্দ্বের পর সন্ধ্যায় মহাকাল মন্দিরে যাবার পথে মাধবী শিবিকার আবরণীর অন্তরাল থেকে দেখেছিল কেমন উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কুমার। অপ্রত্যাশিত এই দর্শনে গুরুগুরু করে কেঁপে উঠেছিল মাধবীর বক্ষ। সেদিন "উদভ্রান্তক" নাচে উদ্‌ভ্রান্তের মতই পা পড়েছিল নটির। চিরশান্ত দেবরাত পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল তার উপরে। পদক্ষেপ আর তাল যেন দুটি কলহপরায়ণা সখীর মত চলেছে ভিন্ন দিকে। কিন্তু মাধবী নিরুপায়। মনে মনে বলল—"বেশ তো ছিলাম। কেন দেখা হোল তোমার সঙ্গে ?"

এমন দেখা প্রায়ই ঘটতো। আর সেই একটু দেখা, একটু হাসি নিয়েই রঙেরসে জাল বোনা চলত তার মনে মনে। সখী ময়ূরিকা পরিহাস করে। এমন সময় এক বিপদ ঘটল। যাদুকর যোগসিদ্ধির যাদুখেলা দেখতে গিয়েছিল সেদিন সকলে। সহসা একটি কৃষ্ণকপোতী গিয়ে ঠোকর দিল কুমারের চোখের কোণে। বেতালভট্ট সেঁদিন পাশে না থাকলে কুমারের পদ্মপলাশ নয়নটি রক্ষা পেত না। তিনি দ্রুত কৌশলে পারাবতটি ধরে ফেলেছিলেন। ধন্য তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতি। কিন্তু কি উদ্বেগেই না কাটল মাধবীর একটি দীর্ঘমাস। খবর পেল ধ্বন্বন্তরির নির্দেশে রাণী দত্তদেবী নিজে হাতে শুশ্রূষা করছেন কুমারের। তবু মন মানে না। যখন শুনল কুমার একটু সুস্থ হয়েছেন কি আনন্দই না হোল। মন্দির বেদীতে নাচতে নাচতেই মাধবী লক্ষ্য করল কুমারের কৃশ তনু। তবু তার উচ্ছ্বসিত আনন্দ। সখী ময়ূরিকা এসে শুধাল—"ওগো রঙ্গিনী, এত রঙ্গ কেন ?"

মাধবী হাসল মুগ্ধার মত। দেহের আকুল রবকে থামিয়ে রাখবে,

সে শক্তি তার কোথায়? ময়ূরিকার মুখেই শুনল সম্রাট ও কুমার ভট্টারক ফিরে যাচ্ছেন পাটলীপুত্রে। কথাটা শোনা মাত্র মাধবী বকুল বীথিকার লোহিত বেদীতে বসে পড়লো।

"ওমা, তুমি বসে পড়লে যে? তবে বুঝি কুমার ভট্টারকের প্রণয়ে পড়েছ?" ময়ূরিকা গালে হাত দিল।

চোখের জলে মনের সব কথা প্রকাশ হয়ে গেল। আড়াল—আবরণ কিছু রইল না।

"তবে তো মরেছ!" ময়ূরিকা বলল।

"মোরিকা, তুই কি একটা উপায় করবি না?"

"এত কি সহজ?"

"স্বীকার করলুম সহজ নয়।"

পরদিন মাধবী সুন্দর করে সাজল। বাতায়নের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখল ওঁরা চলেছেন। 'মেঘবতী' হস্তিনীর পৃষ্ঠে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, তাঁর পেছনে 'পুষ্পদন্ত' নর-হস্তির উপর মহাবলাধিকৃত হলায়ুধ বর্মা, আর এক পাশে একদন্তী 'উদয়কালের' উপর মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত ও মহাধর্মাধ্যক্ষ বুধগুপ্ত। তার পেছনে 'সুপ্রতীক', তার পেছনে 'বামন'। একের পর এক হাতীর পিঠে অমাত্যবর্গ। যেন মেঘের পর মেঘের বুকে সূর্যরশ্মির ছটা।

তারপর এল অশ্বারোহীর দল। সবার সমুখে সোনার সাজ পরা শ্বেতবর্ণ অশ্বিনীর পৃষ্ঠে দেবপুত্র কুমার ভট্টারক। তাঁর পশ্চাতে দুটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে মহাসন্ধিবিগ্রহিক নৃসিংহগুপ্ত ও নাবধ্যক্ষ ইন্দ্রগুপ্ত।

ময়ূরিকা ফিসফিসিয়ে বলল, "কুমারের গায়ে ছুঁড়ে দাও গলার মরকত কণ্ঠী।"

কিন্তু লজ্জা এসে বাধা দিল।

মাধবীর মনে হোল, 'ছিঃ উপযাচিকা হব?'

জলহংসীর মত তীব্র শিৎকার করে ময়ূরিকা ততক্ষণে ছুঁড়ে দিয়েছে তার গলার ইন্দ্রমণি। রাজকুমারের ভল্লমুখে সে হার ঠাঁই পায় নি।

প্রখর অশ্বক্ষুরে তা গুড়ো হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নৃসিংহগুপ্তের দৃষ্টি এড়ায় নি। অনেককাল পরে তিনি দেখিয়েছিলেন মাধবীকে সেই গুঁড়োন মণির রেণু রাঙাধূলোয় মিশে কেমন ময়ূরকণ্ঠী রঙ ধরেছিল।

কিন্তু সে সময় শুধু মাধবী অঝোরে কেঁদেছে। রাতের পর রাত বীণায় বাজিয়েছে মেঘ—পূরবী—মল্লার। সংবাদ আসত কুমার গেছেন তাম্রলিপ্তে—সমতটে—কামরূপে। মাধবী স্বপ্ন দেখত। দিবাস্বপ্নও। আগে গুরুদেবের শত অনুরোধে চিত্রকলায় অনুরাগ হোত না। এখন সে তাতেই পারঙ্গমা হয়ে উঠলো। আঁকলো কুমারের কত না প্রতিকৃতি। ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসর গৃহে আপন মনেই করত প্রণয় সম্ভাষণ।

দেবরাতকে মাধবী একদিন বলল—"এবাব মাগধী শৈলী শেখাও।" মাগবী শৈলীতে কিছুই নৃত্য নেই, শুধুই পদকারু। মাধবী বলল "ওমা, আমার মুদ্রা যে নষ্ট হোল, ভ্রষ্ট হোল যে ভঙ্গী।" দেবরাত তিরস্কাব কবল—"ধৈর্য ভিন্ন কিছু হয় না। এত অধীরা কেন?"

এমন সময় সংবাদ এল যেতে হবে পাটলীপুত্রে।

সেখানে নটিমুখ্যা মাধবসেনা।

ভয়ে দুরু দুরু বক্ষে পাটলীপুত্রে গেল মাধবী।

পাটলীপুত্র পৌরসঙ্ঘ কিন্তু তৃপ্ত হোল তার নৃত্যকলায়। মাধবসেনা হাতের অঙ্গুরী বিনিময় করে বলল—"তুমি মাধবী, আমি মাধবসেনা। একই যখন নাম, দুজনে আমবা সখী হলাম। কেমন?" বড় মধুব মাধবসেনার কণ্ঠ। বড় সুখে কাটল মাধবীর কটা দিন।

দেখতে পেল কুমারকে।

তারপর একদিন ফিরে এল।

আবার নিদ্রাহীন প্রহর।

এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় কুমার এলেন। দাসী এসে জানাল উত্তরভুক্তির কুমারমাত্য এসেছেন। মাধবী সমুদ্রগৃহে এসে দেখে স্বয়ং কুমার। নিজের দৃষ্টিকে যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

একি আনন্দ! একি সৌভাগ্য! মাধবীর অন্তরের মণিকোঠায় সে বিস্ময়ের আনন্দ আজো পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। এবার লজ্জাই হোল বিঘ্ন। হায়, হায়, ময়ূরিকা অনাচারিনীও যদি থাকত। সে আবার গেছে এক পীঠমর্দের গৃহউৎসবে। তবু এতদিনে মাধবী যা চেয়েছিল তাই পেল। কুমার এসেছেন তার গৃহে। কথা বললেন সবিনয়ে। দিয়ে গেলেন রাজ্ঞী দত্তা দেবীর উপহার জাতিফুলের গন্ধমাখা উত্তরীয়। সঙ্কোচের তিরস্করিণী রয়েই গেল। তবু মনে হোল কুমারও তাকে ভালবাসেন। নইলে উজ্জয়িনীর কুমারামাত্য হলেন কেন? পাটলী-পুত্রেই থাকতেন নাকি?

এর পর থেকে প্রতি দিন শিপ্রা নদীর তীর হয়ে উঠলো কুমারের ভ্রমণ পথ। শ্বেত অশ্বে কুমার—কৃষ্ণ অশ্বে কালিদাস। রোজই ময়ূরিকা মাধবীকে দিয়ে অন্তরাল থেকে ছুঁড়ে দিত যূথী বা বকুলের মালা। কুমারের কণ্ঠে সে মালা দুললে মাধবীর মনে হোত জীবন সার্থক। কখনো কখনো লক্ষ্যচ্যুত মালা কালিদাসের কণ্ঠেও স্থান পেত। সেদিন ময়ূরিকার তরলিত হাস্যরবের সঙ্গে মুখরিত হোত কবিকণ্ঠের জয়ধ্বনি, "নটিমুখ্যার জয় হোক।"

মাধবী তার আগেই লজ্জা পেয়ে প্রস্থান করত।

একদিন এল সৈরিন্ধ্রী। পায়ে লাক্ষা দিয়ে আলতা পরাতে পরাতে বলে গেল কুমারের অনুরাগের কথা। মাধবী বিস্মিত—"ওমা, কি সৌভাগ্য, তিনিও আমাকে ভালবাসেন? আমার কথা ভেবে নিদ্রাহীন প্রহর কাটান? কি আশ্চর্য্য!" সৈরিন্ধ্রী অল্প একটু হেসে বলল—"সুন্দরী, পৃথিবীতে কত আশ্চর্যই না ঘটে। বনের মেয়ে শকুন্তলাও তো রাজরানী হয়েছিলেন। সেও কি আশ্চর্য্য নয়?"

সে চলে গেল তার ঝাঁপি নিয়ে। মাধবীর মনে উঠলো এক অধীর তরঙ্গ। অসহ্য উদ্বেগ নিয়ে সে বলল—'হে অতনু, একবার কি দেখা হয় না আমার প্রিয়ের সঙ্গে? নাকি আমি স্মরহরবধূ বলে তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছ?'

এমন সময় পরিব্রাজিকা জিনরক্ষিতা নিয়ে এল সঙ্কেত। রক্তচন্দনের পাতের উপর তেরটি শ্বেতচন্দনের বিন্দু। অর্থাৎ ত্রয়োদশীর রাতে সাক্ষাৎ হবে, বলল ময়ূরিকা। মুগ্ধা মাধবী সঙ্কেতের অর্থও বোঝে না। জিনরক্ষিতা দুগ্ধ তণ্ডুল নিয়ে বিদায় হোল। এল সেই রাত্রি। ভীত কম্পিত পদে ত্রস্ত নেত্রে ময়ূরিকার হাত ধরে মাধবী এসে দাঁড়ালো উদ্যানভবনে। ময়ূরিকা দু'চার কথার পর বিদায় নিল। মাধবী ওর হাত ছাড়তে চায় না। তবু ছলনাময়ী "চন্দনপাখা আনি গে" এই ছলে বিদায় নিল। মাধবীও সঙ্গে সঙ্গে উঠল—ময়ূরিকার পিছনে পিছনে চলতে লাগল কিন্তু সুখে থরথর কম্পিত তনু নিয়ে সে দ্রুত চলতে পারল না। দ্বারের কাছে পৌঁছবার পূর্বেই কুমার ভট্টারক দু হাত প্রসারিত করে বাধা দিলেন। মাধবীর চম্পাকোরকের মত আঙ্গুলে পরিয়ে দিলেন হীরকাঙ্গুরী।

তারপর ?

তারপর দিনরাত্রি, কাল-কালেশ্বর, ভালমন্দ, পাপপুণ্য সব একাকার হয়ে গেল। শুধু বুকের মধ্যে দুলতে লাগল হীরকদ্যুতির মত এক সুখের অনুভব।

মৃণালচয়ন উৎসবে ও কদম্ব উৎসবে কুমার সর্বদা পাঠিয়ে দিতেন দুটি সুন্দর কুসুমস্তবক। ᐧার দুটি প্রিয় আয়ুক্তক বল্লভ ও ক্ষেমেশ্বর নিয়ে আসতো এই উপহার। তারা মাধবীকে ছদ্ম নামে ডাকত 'কিন্নরী'। মাধবী তাদের ছদ্ম নামে পরিহাস করত 'হা হা', 'হূ হূ'। মনোরথদ্বিতীয়ার দিনে রথ প্রতিযোগিতায় এরা দুজন ছিল প্রচণ্ড প্রতিযোগী। সেদিন নরপতিপথের বিভিন্ন অলিন্দগুলি পূর্ণ হয়ে যেত মানুষের মাথায়। রথ প্রতিযোগিতায় নৃসিংহগুপ্তও দেখাতেন বিচিত্র ক্রীড়া। কতরকম রথই না তিনি চালাতেন। স্যন্দন, পুষ্পরথ, কর্ণীরথ, বৈয়াঘ্র। দুরন্ত অশ্বারোহী বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। আস্কন্দ, বোচিত, চক্রাবৃত্ত কত রকম গতিই না তিনি দেখাতেন। কিন্তু এবার কুমার ভট্টারক নৃসিংহগুপ্তকেও পরাজিত.

করে জয় করে নিলেন মাল্য। সুখে পূর্ণ হয়ে গেল মাধবীর চিত্ত।

আর একবার মহাপ্রতীহারের আমন্ত্রণে কুমার বলেছিলেন "আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।" কথা ছিল মাধবী কুসুমাকর উদ্যানে অপেক্ষা করবে। কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত। চারিদিকে অন্ধকার। কুমারের অপেক্ষায় একা থাকতে মাধবী ভীতা বোধ করছিল। মন্দিরের দ্বারপালকে বলল 'তুমি সঙ্গে থাক'। সহসা শোনা গেল রথধ্বনি। অতিদ্রুত ধাবিত হয়ে আসছে। পাশের দুটি দীপবৃক্ষ থেকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

কুমার এলেন।

অমনি ভয় কোথায় গেল?

কুমার ও মাধবী নিক্ষিপ্ত শরের মত তীব্র গতিতে বীথিকায় রথ-ভ্রমণ করতে করতে চললেন। উপরে তারাভরা আকাশ। নীচে জনহীন পথ। সেই শূন্যপথে চ্যুত উল্কার মত উদ্দাম গতিতে চলেছেন কুমার। মাধবীর কানে বাজছে অশ্বখুরধ্বনি। রক্তে উচ্ছলিত হচ্ছে শিপ্রা নদীর উতরোল বাতাস। সে দিন চূতমুকুল উৎসব রাত্রির শেষ প্রহর পর্যন্ত চলেছিল।

কুমার ও মাধবী ক্রমেই একান্ত নিবিড় প্রেমে মগ্ন হয়ে গেল। তাঁদের মন, বাক্য, চিন্তা সব এক হয়ে গেল। মাধবীর মনে হোল "কুমার তো আমার। তাঁর উপর আমারি অধিকার।" এমন সময় দেবরাত ফিরে এল বারাণসী তীর্থ পরিক্রমা করে। আচার্য্য ঈশানেশ্বর তারি হাতে একটি পত্র দিয়েছেন,—

"বৎসে,

শেষ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে তুমি মহাকালকে প্রত্যক্ষ করলে। কিন্তু মনে রেখ এ সুখ ক্ষণকালের। আর সুখান্তেই আসবে দুঃখ। এ চক্রের নিবৃত্তি নেই। আমার বাণপ্রস্থ শেষ হোল। এবার সন্ন্যাস। হিমালয়ের পথে চলেছি। তোমাদের কাছে—এ জীবনের কাছে

আমার মৃত্যু হোল। তবু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বলে যাই ভুলো না তুমি মহাকালবধূ। সেই তোমার অচ্যুতস্থান।"

মাধবী নয়ন তুলে তাকাল শিপ্রার দিকে। অন্ধকারেও নদী তরঙ্গ তুলে চলেছে সাগরাভিমুখে। অভিসারিণী। ময়ূরিকা বলল, "বার্দ্ধক্যে এ কথা বলা সহজ। কিন্তু ইন্দ্রিয়গম্য এই রূপ-জগতের কি মূল্য নেই? তবে কেন ফুল দেখতে ভালবাসি? কেন পাখীর গান শুনি? কেন মধু, মদিরা পান করি? কেন চন্দন কর্পূর পুষ্পসারে নিজেকে সাজাই? রূপরসগন্ধের যদি মূল্য থাকে—স্পর্শের কেন থাকবে না?"

সমুদ্রগামী শিপ্রা নদীর দিকে তাকিয়ে থেকেই মাধবী উত্তর দিল, "না, মোরিকা, তা নয়। আচার্য্য আমাকে দুঃখ দিতে চান না বলেই সুখের সন্ধানে যেতে নিরস্ত করেছেন। কিন্তু সখী, আমার যে এতেই আনন্দ। যত অস্থায়ী—যত অলীকই হোক না কেন এতেই যে আমি পূর্ণতর হয়ে উঠছি। প্রেমের অনুভূতি আশ্চর্য্য। এ যে বন্যার মত দুকূল ছাপানো—একে রোধ করি এমন শক্তি যে আমার নেই।" মাধবী তার ঢেউ খেলানো আঙ্গুল ক'টি দিয়ে মুখ ঢাকলো।

সেই সন্ধ্যাতেই সিন্দুর বিন্দুতে সূর্য্য আব চন্দনে চাঁদ এঁকে তিথির কথা ললাটে আঁকল মাধবী। অর্থাৎ সূর্য্য চন্দ্র থাকবে না। চৌদ্দটি তিলক এঁকে বোঝাল কৃষ্ণা চতুর্দশী। কবরীতে কেতকী-চাঁপাফুল রাখল তার অর্থ কুমার যেন অন্ধকার রাতে ফুল ফোটার সময় আসেন। কুঙ্কুমের অঙ্গরাগে বোঝাল কেশরকুঞ্জ সঙ্কেত স্থান।

সিনীবালী রজনী এল।

নীলাংশুকে অঙ্গ আবৃত করে মাধবী এসে দাঁড়ালো উদ্যানভবনে যেন আকাশচ্যুতা চন্দ্রলেখা।

চার

সে দিনের পর কয়েক বছর কেটে গেছে।

গুরুদেব চলে গেছেন উত্তর-কাশীতে।

উজ্জয়িনীর প্রধান নিযুক্ত হয়েছেন রাজকুমার চন্দ্রগুপ্ত।

শিপ্রানদী তীরে নটিমুখ্যার প্রাসাদে এই কয় বছরে মাধবী অনেক দেখেছে, অনেক শিখেছে। শিখেছে সে বিভিন্ন উৎসবের ব্যবহার। উদ্যানগমন বা জলক্রীড়ায় যে ভাবে যে বেশে চলতে হবে সারস্বত-ভবনের সভায় তা চলবে না। শিমূল উৎসবে শুধু তুলো দিয়ে খেলতে হবে আর কদম্ব উৎসবে চলবে কদম গোলক নিয়ে ছদ্মযুদ্ধ। নবচূত উৎসবে সবার সঙ্গে মিলে আম কুড়তে হবে আর মদনোৎসবে হারিয়ে যেতে হবে কুসুমাকর উদ্যানে।

দর্পণে মুখ দেখতে দেখতে মাধবী স্মিত হাসছিল এই সব মনে করে। পাঞ্চালাচারনুকরণের দিনে মুখোস উৎসবে এবার তার মুখোসই শ্রেষ্ঠ হয়েছিল। সোমপাণকের সভাগুলিও তার সার্থক হয়েছে। পরিচয় হোল বিভিন্ন রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে,—মরুমাড়, প্রতিষ্ঠান, ওড্র, কৌশাম্বী, ভাকাটক, কুন্তল, পাণ্ড্য, পত্নবন্ধ্যা, লাটদেশ, সিংহল আরো কত। সে শিখেছে মিষ্টি কথা ওজন করে বলতে—সে শিখেছে কার দিকে চাইতে হবে অপাঙ্গে—কাকে বশীভূত করতে হবে মদিরায়। কিন্তু সব কঠিন কাজ—কূটকৌশল সহজ হয়ে গেছে চন্দ্রগুপ্তের প্রেমে।

আজও সকালে মাধবী দর্পণে মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে সেই কথাই ভাবছিল। তার চূর্ণ অলকগুলি নিয়ে খেলা করছিল মলয় পর্বতের চন্দনসুরভিত মহোদধির জলকণাসিঞ্চিত স্নিগ্ধ সমীর। ঈষদোদ্ধত ভুরু—অধরে যৌবনগর্বিত হাসি। মাধবী ভাবছিল আজ সন্ধ্যায় চম্পকবন উদ্যানে তার অভিসার। মনে পড়ল পাঞ্চাল-অনুকরণের দিনে উর্বশীর মুখোস পরে সে যখন প্রবেশ করেছিল কুমার

ভট্টারক কেমন রাক্ষসের মুখোস পরে তাকে হরণ করে নিয়ে এসেছিলেন এই উদ্যানে। মাধবী আপন মনেই হেসে উঠল। সেই সঙ্গে মনে পড়ল আর একটি তরুণ কিশোরের কথা। কবি কালিদাসের প্রীতি। হ্যাঁ, তাও তাকে শক্তি দিয়েছে বৈকি। কবি মাধবী ও কুমারের প্রেমকে অমরত্ব দিয়েছেন তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে—মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে।

ছদ্ম কোপ করে চন্দ্রগুপ্ত বলেছিলেন—"তুমি মাধবিকাকে মালবিকা করে অমর করে দিলে কবি। আর দগ্ধভাগ্য আমার—তোমার বন্ধু হয়েও স্মরণীয় হতে পারলাম না।" সলজ্জ কালিদাস বলেছিলেন—"কুমার, আমার তৃতীয় গ্রন্থ তোমার নামেই নামাঙ্কিত হবে। ঠিক করেছি এবার লিখব উর্বশী পুরুরবা নিয়ে। কিন্তু আমার পুরুরবার নাম হবে বিক্রম। তোমার বিক্রমাদিত্য নামের আদি অংশটুকু আমাকে দান করতে হবে। গ্রন্থের নাম দেব বিক্রমোর্বশী।"

চন্দ্রগুপ্ত হেসে উঠেছিলেন—"সাধু, সাধু।"

মাধবী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—"এত দ্রুত কি করে লেখ কবি? এত কল্পনাই বা তোমার আসে কোথা থেকে?"

কালিদাস হেসে বলেছিলেন—"সখী, তোমাদের স্পর্শে যদি প্রিয়ঙ্গু বিকশিত হয়, মুখমদে বকুল ফোটে, পদাঘাতে অশোকের সাধ হয়, দৃষ্টিতে মঞ্জরিত হয় তিল, আলিঙ্গনে কুরুবক, মন্দার যদি ফোটে তোমাদের নর্মবাক্যে, পটুহাস্যে চাঁপা, মুখনিঃশ্বাসে আমের মুকুল—গানে নমেরু আর সামনে নাচলে কর্ণিকা—তবে সেই ছড়ানো ফুলগুলি দিয়ে মালা রচনা কি এতই কঠিন?"

তিনজনের মিলিত হাস্যে কুসুমাকর উদ্যান সেদিন গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছিল। সে কথা স্মরণ করে মাধবী আজো খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

ময়ুরিকা কিছু চারাগাছ নিয়ে আসছিল। "অত হাসি কিসের সখী? ওমা, দর্পণে নিজ মুখ দেখেই এত আনন্দ?"

"না, না, মোরিকা, আমি অন্য কথা ভেবে হাসছিলাম।"

"আচ্ছা, জানি গো জানি, এখন দেখ উদ্যানের পাশে এই পূগ-মালির চারাগুলি বসাব কি না?"

"বসাও। আর দেখ পুন্নাগ তরুর আলবালে কিছু জলসিঞ্চন করা প্রয়োজন। আমি চাই নক্তমাল কোবিদারের পাশেই একটি শিবক্রম বিল্ব বসাতে। পারবে?"

"পারবো না কেন?"

"দেবরাত এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

মুহূর্তে মাধবী যেন ফিরে এল আপন গহনলোকে। নৃত্যচর্চার মধ্যে সে যেন সত্যি নিজেকে খুঁজে পায়। না কি প্রেমের মধ্যে? সেও এক সঞ্চারিণী অনুভূতি। মাধবীকে ভেঙে চুরে এক নতুন ব্যক্তিত্ব দিচ্ছে। কিন্তু সে ভাঙা চোরায় কোন ব্যথা নেই। আছে এক পরম আহ্লাদ। হ্লাদিনী প্রেম। মাধবী একবার গোপনে তার স্তনবৃন্তে প্রবালমণি চিহ্নগুলি দেখলে। মুখের ও বুকের ময়ূরপদিকা চিহ্নগুলির উপর গাঢ় চন্দনের প্রলেপ দিল। তারপর আত্মসম্বরণ করে সে এসে উপস্থিত হোল মণিকুট্টিমে। সেখানে দেবরাত তখন মৃদঙ্গগুলির সুর পরীক্ষা করছে। মাধবী প্রবেশ করেই বলল,—

"আজ মল্লঘটি নৃত্যটি অভ্যাস করব।"

দেবরাত স্মিত হেসে মৃদঙ্গ তুলে নিল।

প্রায় দ্বিপ্রহর পর্যন্ত মাধবী নাচল। বড় ভাল লাগছিল তার আজ নাচতে। যদিও সে রোজই নাচে। তবে অতক্ষণ নয়। যদিও তার দিনলিপি একই। উষামুহূর্তে স্নান—প্রভাতে শিল্পচর্চা। তারপর নৃত্য অভ্যাস। তারপর ধারাগৃহে চন্দনকর্পূরবাসিত জলে স্নান। অতঃপর মহানস থেকে আসবে তার দ্বিপ্রহরের আহার্য। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কোনদিন প্রবাত-শয়নে স্বল্পনিদ্রা—কোনদিন বা সমুদ্রগৃহে চিত্রাঙ্কণ। তারপর? তারপর রবির রশ্মি যখন

কোমল হয়ে আসবে—অগুরু ধূপে শুকিয়ে নেবে কুন্তলভার, অঞ্জন আঁকবে নয়নে—কপালে আঁকবে পত্রলেখা, কুঙ্কুমে টিপ, লাক্ষায় রাঙাবে অধর—মৃগমদে আবৃত করবে বক্ষ, নাভি, জঘন। কেতকী রেণু ছড়িয়ে দেবে সারা অঙ্গে—লোধ্ররেণু আননে। মহাকালের বেদীতলে সন্ধ্যাআরত্রিক নৃত্য। কিন্তু আজ? আজ তা নয়। আজ লঘু স্বচ্ছ পূর্ণিমার আকাশের মত শুক্লাম্বরে জড়িয়ে নেবে তনুদেহ—বেণীতে জড়িয়ে নেবে শ্বেতকরবীর মালা। অষ্টমীর চাঁদের মত ললাটে দুলিয়ে দেবে বিধুমণি।

আজ যে জ্যোৎস্নাভিসার।

মদনত্রয়োদশী।

নবযৌবনের প্রবলদশা।

এদিকে চৈত্রমাসের রাত্রি যে ছোট।

চাঁপাফুলের গন্ধে মন্থর বাতাস—জ্যোৎস্না ও পাতায় জাল বুনে রেখেছে। মাধবী ও ময়ূরিকা নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো কুমারের উদ্যান ভবনে। বীণাবাদনরত কুমার মুগ্ধ চোখে তাকালো প্রেয়সীর দিকে। মধুর আবেশে মাধবীর অবগুণ্ঠন খুলে তুলে ধরলেন অশ্বত্থ পাতার মত মুখখানি। আকণ্ঠ ডুব দিলেন তার ফেনিলোচ্ছল যৌবন-সরোবরে। মনে মনে পুলকিত হয়েও প্রিয়তমের আলিঙ্গনে শিথিল-অংশুকা কুঙ্কুমচূর্ণ ছুঁড়ে দিল রত্ন প্রদীপে।

রাত্রির তৃতীয় যাম। ময়ূরিকা এসে হাততালি দিয়ে সঙ্কেত জানাল। চামেলি কুঞ্জের দিকে তাকিয়ে স্বগত বলে উঠল—

"ওগো চক্রবাকী, এবার বিদায় নেও তোমার চক্রবাকের কাছ থেকে। অন্ধকার তরল হয়ে আসবে আর দু দণ্ডের মধ্যে।" অনিচ্ছুক কুমারকে অনেক স্ফুরিত চুম্বন দিয়ে মাধবী উত্তরীয়ে ঢেকে নিল নিজেকে। কুমার তবু ছাড়তে চান না প্রিয়তমাকে।

"মাধবী, মাধবিকা, প্রিয়তমা, আমি, পিতাকে লিখেছি তুমিই হবে আমার মহিষী। এজন্য পিতা যদি সিংহাসন

আমাকে না দিয়ে রামগুপ্তকে দেন আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।"

মাধবী শিউরে উঠল—"ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন কুমার। এ কি আপনার যোগ্য কথা হোল? রামগুপ্ত কিনা সিংহাসন নেবে আপনি থাকতে? আমি কি আপনার যোগ্যা?"

"মাধবী, ও কথা বোল না। আমিই কি তোমার যোগ্য? তোমার এত গুণ। চতুষষ্টি কলা তোমার আয়ত্তে। আমার কি আছে? বরং তোমার যোগ্য গুণবান কালিদাস। মাধবী, তুমি তাকেই বরণ করলে না কেন?"

"প্রভু, আপনি কি আমাকে পরিহাস করছেন?"

মাধবীর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে চকিত হয়ে কুমার বলে উঠলেন,—

"না মাধবী, না। কালিদাস সত্যই আমার বন্ধু। তুমিও আমার প্রিয় বান্ধবী। তাছাড়া কালিদাস তোমাকেও ভালবাসেন।" চন্দ্রগুপ্ত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

নত মস্তকে পায়ের নোখ দিয়ে মেজেতে আঁচড় কাটতে কাটতে মাধবী বলল,—

"কুমার, আমার হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করে আছে সূর্য্যপ্রভ একটি চরিত্র—আর কোনো আলো সেখানে পৌছয় না।"

"প্রিয়ে, রাত্রি গত হোল। তুমি এইবার যাও। দেখো, আমার পত্রের কথা কাউকে বোল না যেন।"

মাধবীর চোখ দুটিতে হেসে উঠলো কৌতুক; মুখে বলল "কালিদাসকেও না?"

বিক্রমও হাসলেন,—"না, কালিদাসকেও না। তবে কালিদাস জানে। সে এই নিয়ে বিক্রমোর্ব্বশী লিখেছে। দেখিয়েছে এই চন্দ্রবংশেরই রাজা পুরুরবা স্বর্গনটিকে স্ত্রীর সম্মান দিয়েছিলেন। তবে কেন আমরা মিলিত হব না? কথায় বলে স্ত্রীরত্নংদুষ্কুলাদপি। আর মাধবী, তুমি তো বিপ্রকন্যা।"

এতদিনে হৃদয়ের পাত্র পূর্ণ হোল।

মাধবী গদগদ কণ্ঠে উত্তর দিল—"আমি আর কি বলব কুমার ?"

কুঞ্জের পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখল তারা অভিসারিকাদের ফুলের মালায় পথ কীর্ণ। কোন উপবন থেকে ক্ষরিত হচ্ছে মদবাক্য—"ওগো সুন্দরী, তোমার মুখের ভয়ে চাঁদ লুপ্ত, কুচের ভয়ে কমল মুদিত, ঘট যে আগুণে গেল।" কেউ বা বলছেন, "অসিত-নয়নে, তোমার নয়নের কালো জলেই আমার মন-মৃণাল ঠাঁই নিয়েছে। ওগো সুন্দরী, পঙ্কে না থাকলে সে তোমার ও মুখাম্ভোজ দেখবেই বা কি করে ?"

উত্তরীয়ের অন্তরালে মুখ ঢেকে স্মিতহাস্যে চলছিল মাধবী ও ময়ূরিকা। সহসা পথের থেকে যেন ফুঁড়ে উঠলো এক বৌদ্ধ শ্রমণ।

"কে যায় ?"

ময়ূরিকা উল্টে প্রশ্ন করল—"তুমি কে ?"

"কি এতবড় স্পর্ধা অভিসারিণী চর্ষিণীর ?" গর্জন করে উঠলো সেই শ্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে দুজন অশ্বারোহী ঘিরে দাঁড়ালো তাদের। মাধবী কম্পিত হোল। ময়ূরিকাও। রাত্রির শেষ যাম। সুষুপ্তা নগরী। এমন সময় এ কি বিপদ!

"আপনি কে ভগবন্ ; আমি ময়ূরিকা।"

"মোরিকা ? সঙ্গে ওটি কে ? নটিমুখ্যা নাকি ?"

"উপাসক ক্ষপণক ?" ময়ূরিকা চিনতে পারল।

"হ্যাঁ।" ক্ষপণক এগিয়ে এসে মাধবীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিল। তার মুখে ফুটে উঠল তির্যক হাসি।

"কোথা থেকে আসছ ?" একটি ভুরু তুলে ক্ষপণক প্রশ্ন করল। যদিও প্রশ্ন করা বৃথা। ক্ষপণক সবই বুঝেছে। ময়ূরিকাও সেটা বুঝে নিয়ে স্পষ্ট উত্তর দিল,—"আমরা চম্পকবন উদ্যান থেকে ফিরছি।"

অশ্বারোহীদ্বয় সসম্মানে পথ ছেড়ে ছিল।

পরদিন আর একটি পত্র পাটলিপুত্রে প্রেরিত হোল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের নামে।

* * * *

উষামুহূর্তে উদূখলের প্রচণ্ড ধ্বনিতে কালিদাসের নিদ্রাভঙ্গ হোল। কালম্ কালম্ মহাকালম্। এত ভোরে এই শব্দ? কোথাও কি শান্তি নেই? কালিদাস বিরক্তি বোধ করলেন। কিন্তু মুখরা ভট্টিনীকে কিছু বলে এই মনোরম প্রভাতটিকে তিক্ত করে তোলবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। শিপ্রায় স্নান শেষ করে গৃহে ফিরে তিনি তাঁর লেখনী ও পুঁথি নিয়ে বসলেন। সবে লিখেছেন ব্রতধারিণী ঔশীনরীর রূপবর্ণনা,—"সিতাংশুকা মঙ্গলমাত্রভূষণা পবিত্রদূর্বাঙ্কুরলাঞ্ছিতালকা।"

ক্রুদ্ধা ভট্টিনী যবাগূ নিয়ে প্রবেশ করলেন। কালিদাস সভয়ে তাকালেন,—"কী হয়েছে প্রিয়ে?"

"কি হয়েছে? ইক্ষুক্ষেত্রে ঠিক মত বর্ষণ হয় নি। ভাঁড়ারে আমলক, জীরক, তামল কিছুই নেই। এবছর শস্যের ভাগও চর্ষকেরা কম দিয়েছে। ধান, মুগ, যব, শ্বেত সরিষা—বলতে গেলে পঞ্চশস্যের কোনটিই ভাল হয় নি। আমাকে অগ্নি জ্বেলে দাও,—তাতে প্রবেশ করব।"

ভট্টিনীর থমথমে মুখ দেখে কালিদাস বিষয়টি লঘু করবার প্রয়াস পেলেন। হেসে বললেন,—

"কেন প্রিয়ে? আমি তো রামচন্দ্র নই, তুমিও সীতাদেবী নও।"

"আবার পরিহাস করছ?"

"ক্ষমা কর। কিন্তু এবার উত্তর-ভুক্তিতে কি কিছুই হয় নি?"

"কি করে হবে? তার অধিকাংশ খিলভূমি, বাকিটা দেবমাতৃক। এবার বর্ষণ হয় নি। ফলে এক আঢ়ক নীবারও মেলে নি। একমাত্র গন্ধাবতী নদীর তীরের ক্ষেত্রটিই কৃষিযোগ্য। কিন্তু আজ পর্যন্ত তুমি এটিকে ব্রহ্মদেয় করে নেও নি। অথচ শুনি যুবরাজ তোমার বান্ধব।

হায়, মন্দভাগিনী আমি।” কপালে করাঘাত করতে লাগলেন ভট্টিনী।

“শান্ত হও প্রিয়ে, শান্ত হও। দেখি কি করতে পারি।” কালিদাস লেখনী ও পুঁথি তুলে রেখে উত্তরীয় গায়ে প্রস্থানোদ্যত হলেন বিরস বদনে। যবাগূ যেমন তেমনি পড়ে রইল। বহির্গৃহ অভিমুখে যেতে যেতে শুনতে লাগলেন ভট্টিনীর বিলাপ ও রুষ্ট কণ্ঠের ঝঙ্কার,—“সৈন্ধব লবণ তো অন্ততঃ দরকার। কর্পূর, কক্কোল, লবঙ্গ, জাতী এ সব সুগন্ধ দ্রব্য তো বিবাহের দিনেই যা দেখেছিলাম। স্থানিককরণে একবার গিয়ে গন্ধাবতীর ভূমিপত্রটি বদলিয়ে তাম্রপট্ট করে নিও। আর দেখ, উত্তরভুক্তির জঙ্গলভূমিতে সোমলতা লাগাবার ব্যবস্থা কোর। তবু কিছু লাভজনক হবে।”

কালিদাস বহির্দ্বারে পা দিলেন। ভট্টিনী আর অগ্রসর হতে পারলেন না। তাঁর সংসারে অনেক কাজ পড়ে আছে। আসল কথা কালিদাসকে পুঁথি ও লেখনী নিয়ে বসতে দেখলেই ভট্টিনীর ক্রোধ হয়।

সোমলতা? কালিদাসের মনে পড়ল আজ সন্ধ্যায় তো মাধবিকার গৃহে সোমপানক উৎসব। মনটা তার আবার প্রসন্ন হয়ে উঠল। চারদিক গ্রীষ্মের তপ্ত-পদসঞ্চার। উষ্ণার্ত শিখী আলবালের জলের কাছে শুয়ে আছে। হংসগুলি কমলবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে। তবু কালিদাস তারি মধ্যে চললেন স্থানিক-করণের উদ্দেশ্যে। মনের মধ্যে মেঘের প্রার্থনা।

“কালিদাস, কোথায় চলেছ?”

“কে? বরাহ? একবার স্থানিক-করণে যাচ্ছি। আমার একটি ভূমিপত্রকে তাম্রপট্টে পরিবর্তন করে নেব।”

“আগে পুস্তপালকে বলেছ?”

“না, তা তো বলি নি।”

“তবে কি করে হবে? আগে অধিকরণের বিশ্বপতিকে জানাতে

হবে। তারপর পুস্তপালকে। সেখানে তোমার ক্ষেত্রটি যে গ্রামভুক্ত তার রাজকর্মচারী, ব্রাহ্মণবর্গ এবং কুটুম্বিকগণ সম্মত হবেন। তবেই না……”

কালিদাস অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলেন। জমাজমি হিসেব নিকেশ যে তিনি বোঝেন না তা নয়। তবে এই মুহূর্তে তাঁর মনের মধ্যে প্রিয়প্রসাদনব্রতা ঔশীনরীর রূপ ক্ষণে ক্ষণে ফুটে উঠছিল। এসব তাঁর ভাল লাগছিল না। আঃ প্রভাতের প্রসন্ন মুহূর্তটি নষ্ট হয়ে গেল।

বরাহের কিন্তু এসবে খুব উৎসাহ। জ্যোতিষ আর ভূমিচর্চা এই দুই হোল তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি বিব্রত কালিদাসকে সান্ত্বনা দেন—“তুমি কবি মানুষ। তোমার কি আর এসব মনে থাকে। কোথায় দেবতা গন্ধর্ব কিন্নরী অপ্সরী, না একেবারে ধর্ম, দায়, লাভ, প্রয়োগ ভাবা। ভেব না হে ভেব না। আমি যাচ্ছি। তোমার জন্য পুস্তপালকে বলে আসব। ঐ যে নাথশর্মা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার গৃহিণীর প্রিয় ভৃত্য। তিন দীনারে দেড়কুল্যবাপ ভূমি কিনেছিল। তাই নিয়ে অধিকরণে বিশ্বপতি আর পুস্তপালে কি কলহ! শেষ পর্যন্ত কিছুতেই মীমাংসা হয় না। নাথশর্মা কেঁদে এসে পড়ল আমার কাছে। পুস্তপাল শিলাদিত্য আমার খুব বন্ধু। ঐ জ্যোতিষীর জন্যে হে। তা আমি গিয়ে শেষ পর্যন্ত সব ব্যবস্থা করি।”

কালিদাস তবু বিমর্ষ হয়ে থাকলেন। বরাহ বন্ধুর পিঠে দুটি চপেটাঘাত করে বললেন—“এত ভাবলে কি চলে? বললামই তো ভাবনার কিছু নেই। আমি সব করে দেব।”

“না, ভূমির কথা ভাবছি না। এখনই ঠিক গৃহে ফিরে যাওয়া চলবে না।”

“কেন?” বরাহ ভুরু নাচিয়ে বলেন—“ভট্টিনীর সঙ্গে কলহ করেছ বুঝি?”

কালিদাস শুষ্ক হাসি হাসলেন।

"তবে আর কি করবে? শৌণ্ডিকবীথিতে ঘুরে এস।"

বরাহ হাসল।

"প্রভাতে? বাতুল নাকি?" কালিদাসও হাসলেন। তারপর বল্লেন,—"দেখি, একবার অমরসিংহের গৃহে যাই। তার অভিধানটি কদ্দূর·

"ঐ বৌদ্ধটার কাছে কেন যাও হে?" বরাহ কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হয়ে ওঠেন।

"অমরসিংহের মনটা বড় উদার, বন্ধু।" কলিদাস বলেন।

"আমার তো মনে হয় তুমিই উদার-চরিত্র।" বলেই হঠাৎ বরাহ এগিয়ে আসেন—"দেখি, দেখি, তোমার নাকের দুপাশে ও কিসের রেখা? বুঝেছি, দশমস্থ রাহু। বন্ধু, তোমাকে বিদেশ যেতে হবে রাজকার্যে। অতিশীঘ্র।"

কালিদাস হেসে উঠলেন সজোরে।

"প্রতাপশালী, শত্রুবিজয়ী, প্রবাসকর্তা দশমস্থ রাহু"—বিড়বিড় করে আবৃত্তি করলেন বরাহমিহির। তারপর বললেন—"আচ্ছা চলি, রোদের উষ্ণতা বড় বেড়েছে হে।"

কালিদাস কতকটা অন্যমনস্কভাবে গৃহে প্রত্যাবর্তনের পথ ধরলেন। শিপ্রা নদীর ধার দিয়ে চলতে চলতে কেবলি তাঁর মনের মধ্যে ভেসে উঠতে লাগল ঘন বর্ষাব চিত্ররূপ—একটি জনহীন পথে চলেছে ঘননীলবসনা সুন্দরী অভিসারিকা।

কে এই অভিসাবিণী তাঁর মগ্ন মনের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে আছে? মালবিকা? উর্বশী? মাধবিকা! হঠাৎ এই প্রখর রৌদ্রে রুদ্ধভবন পথে কালিদাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তবে কি তাকে আমিও ভালবেসেছি? আমার প্রেম! আমার দ্বন্দ্ব! আমার কবিতা! আমার নায়িকা!

* * * *

নটিমুখ্যার গৃহে সোমপানক উৎসব। ময়ূরিকার নির্দেশে দীর্ঘ

মশাল দিয়ে একটি একটি করে দীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছিল দাসী। কনক দর্পণে চোখ রেখে ময়ূরকণ্ঠী কাঁচুলিটি শেষবারের মত এঁটে নিল মাধবী। শৈবাল-শ্যামল আঁচলটি ঘুরিয়ে নিল সে বক্ষের উপর দিয়ে। যেন একটা আধফোটা জলনলিনী।

মণিগৃহে একবার পর্যবেক্ষণের জন্য গেল। গৃহের দেয়াল ঘেঁষে তিনটি পালঙ্কে চিত্রিত শয্যা। শয্যার পাশে বেদী। কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে প্রাচীরে পদ্মাকৃতি একটি ক্ষুদ্র বেদী। তার উপরে সরস্বতীর মূর্তি। অন্যদিকে বীণা, মন্দিরা, মৃদঙ্গ, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র। পাশে রাখা একটি চতুষ্কে তাম্বুল, পুষ্পমাল্য, সুরভিত ধূপ। প্রাচীরলগ্ন দীর্ঘ দুটি হস্তীদন্তে প্রলম্বিত দীর্ঘ ও বৃহৎ দুটি পুষ্পমাল্য। নটমুখ্যা কামাক্ষীর সময়ে এ দুটি নৃসিংহগুপ্ত উপহার দিয়েছিলেন এক বন্যহস্তী বধ করে। অন্য কোণে চতুরঙ্গ, অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি ক্রীড়ার সামগ্রী। কক্ষের বাইরে অলিন্দ। সেখানে সোনার পিঞ্জরে শুকসারী। মণিগৃহের তিন দিকে তামরসে পূর্ণ তড়াগ। একদিকে উদ্যান। উদ্যানের পথে যেতে তমালকুঞ্জ। তার শাখায় বদ্ধ ঝুলনা : সুন্দর চিত্রিত বস্ত্রে আবৃত। তার উপর মালতীলতার সজ্জা।

সুবর্ণ, রৌপ্য, স্ফটিক, চর্মপাত্রে সোমরস, মাধ্বী, কাদম্বী, গৌড়ী, আসব। মাধবী কোন সুরায় জল মিশিয়ে করল ঐরেয়। ইক্ষুরসের সঙ্গে মিশিয়ে প্রস্তুত করল কামোদ্দীপক মৈরেয়। যবনির্যাস কোহল আর ধান্যনির্যাস সুরা রাখলো দক্ষিণে সরিয়ে। এ দুটি তীব্র। মেয়েরা পান করেন না। পুষ্পোদ্ভব মদিরার নাম মাধ্বী—এটি ললনাদের প্রিয়। সেটিকে রাখলেন বামে। তার পাশে রাখলেন স্ফটিক পাত্রগুলি। তুলনায় এই জগলগুলি কিছু লঘু। তাছাড়া কাঁচের পাত্রের মধ্য দিয়ে রক্তবর্ণ সুরা বড় সুন্দর দেখায়। সবশেষে ময়ূরিকার সহযোগে তৈরী করলেন রতিফল মদ্য। দুধ, গুড়, ইক্ষুরস, কদলী, দ্রাক্ষারস ও পুষ্পমধু মিশিয়ে এই স্বাদু শীতল স্মরোদ্দীপক মদিরা প্রস্তুত হোল কুমার ও সম্ভ্রান্ত অতিথিদের জন্য। শুধু তাই

নয়, বিচিত্র ফলের রসও রাখল সাজিয়ে। জম্বুরস, বীজপূরের রস, নারিকেল জল।

সহসা আসক্ত ষটপদের ধ্বনির মত মানুষের গুঞ্জরণ শুনে মাধবী তার কৌতুক তরল নেত্রান্ত তুলল! আসছেন, তিনি আসছেন। হাস্য মুকুলিত মুখে কুমার প্রবেশ করলেন। মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ—গায়ে শুভ্র উত্তরীয়—পরিধানে দুগ্ধশুভ্র বস্ত্র। কণ্ঠে মুক্তার একছড়া হার। কোমরবন্ধে একটি রৌপ্যনির্মিত খোপে তীক্ষ্ণ ব্যাঘ্রনখ। তাঁর পেছনে মহাপ্রতিহার ভানুগুপ্ত, অন্যান্য রাজপুরুষ ও রাষ্ট্রদূতগণ। সবার পেছনে নববত্নের দল। মাধবী, ময়ূরিকা অন্যান্য সখীদের সঙ্গে একত্রে জানালো অভিবাদন,—

"পরম ভট্টারক, পরম বৈষ্ণব, পরম সৌগত মহারাজকুমার উজ্জয়িনীর কুমারামাত্য বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক।"

সোণার পিঞ্জরের শুক-সারিকাও প্রতিধ্বনি তুলল,—

"জয় হোক।"

সবাই হেসে উঠলেন।

বিক্রমাদিত্য আজ বড়ই চাপল্য দেখাচ্ছেন। চতুরঙ্গ খেলায় একবার পরাজিত করলেন মহাপ্রতীহার ভানুগুপ্তকে। কিছুক্ষণ বীণা বাজালেন। কিছুক্ষণ বেণু। কালিদাসকে টিপ্পনী ছুঁড়লেন,—"কই হে কালিদাস তোমার নাটক কতদূর? উর্বশীর সঙ্গে মিলন হোল রাজার? তোমরা কবিরা প্রজাপতি ব্রহ্মার মতই বড় কঠিন হৃদয় হে। কতকাল আর বিচ্ছেদ ঘটিয়ে রাখবে?"

কালিদাস সলজ্জ কণ্ঠে বললেন—"হ্যাঁ মিলন হয়েছে। এবার তৃতীয় অঙ্ক লিখতে সুরু করব।"

"হয়েছে? সাধু, সাধু। চক্রপাণী বিষ্ণুর জয় হোক, তাঁকে তিল-তুলসী দেব। জয় হোক শাক্যমুনি বুদ্ধের, তাঁকে দেব দুধ-তণ্ডুল।" বিক্রমাদিত্য ছদ্ম পরিহাসে হাত তুললেন দেবতাদের উদ্দেশ্যে।

"আর আমার মহাকাল? তিনি বুঝি বাদ রইলেন?"

স্ফুরিতাধরা মাধবী প্রশ্ন করলেন।

বিক্রম একটুও অপ্রতিভ হলেন না—"তিনি তো আশুতোষ। বিল্বপত্র ও গঙ্গাজলেই তো তিনি তুষ্ট।"

সবাই হাসলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই যে যার পছন্দমত সহচর নিয়ে ছোট ছোট গুল্মে ভাগ হয়ে গেলেন। কেউ বা বীণা বাজাতে লাগলেন—তার চার পাশে সঙ্গীতরসিকেরা ভিড় জমাল। কেউ কেউ অক্ষ খেলতে লেগে গেলেন। তাদের চারধারে দর্শক তথা মন্ত্রণাদাতারাও জমে গেল। পানীয়ক বেদীতেও কম ভিড় নেই। ময়ূরিকা, সুধাবতী প্রভৃতি সখীরা জগলের পর জগল নিয়ে ভরে দিতে লাগল পানপাত্র।

নবরত্নের দল যথারীতি একটি কোণে বসে বিতর্ক বাধিয়ে তুলল। শঙ্কু, বেতালভট্ট, ক্ষপণক একদিকে অন্যদিকে অমরসিংহ, ধন্বন্তরি, কালিদাস। ঘটকর্পর দু দিকেই টিপ্পনী কাটছেন। দরকার মত যেদিকে বেশী লোক সেদিকে ঝুঁকে যাবেন। বরাহ চুপচাপ করে গৌড়ী পান করছেন। এসব তর্কে তাঁর রুচি নেই। মাধবী এসে দাঁড়ালেন সেখানে। মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন,—

"কিসের তর্ক?"

শঙ্কু উত্তর দিলেন,—

"ভদ্রে, আমাদের বক্তব্য ধর্ম ও মোক্ষের চেয়ে কাম্য বস্তু মানব জীবনে আর কিছু হতে পারে না। অর্থও তার সেবকমাত্র। আর এই এঁদের মতে মোক্ষ কিছু নয়। অর্থ ও কাম ধরাধামে এই দুইটি বস্তুই মাত্র কাম্য।"

"সে কি কথা? আমরা ধর্মের কথাও বলেছি বৈকি।" অমরসিংহ প্রতিবাদ করে ওঠেন।

"আমার মতে কিন্তু মোক্ষই একমাত্র বস্তু।" মাধবী আচার্যের

শেখান বাক্য বলে ওঠে শেখানো সারিকার মত। কথাটায় প্রাণ নেই লক্ষ্য করে ধন্বন্তরি মৃদু হাসলেন,—

"বিদুষী আমার মতে কিন্তু কামনাই মানব জীবনকে সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করে।"

ক্ষপণক তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছেন দেখে মাধবী একটু লজ্জা বোধ করেন। মনে পড়ল অভিসার রজনীর কথা। হয়তো উপাসক তাকে মিথ্যাবাদিনী মনে করছেন। এমন সময় ময়ূরিকা উপস্থিত হোল। চতুর দৃষ্টিতে এক লহমা দেখেই সে বুঝল। তখুনি শুধাল—"আপনি কি পান করবেন উপাসক? মৈরেয় না কোহল?"

"দুগ্ধ।"

"দুগ্ধ?"

বিস্মিত হলেও ময়ূরিকা হটে যাবার মেয়ে নয়। দুগ্ধই নিয়ে এল সুবর্ণপাত্রে।

"অর্থও বড় কম নয় হে ধন্বন্তরি।" অমরসিংহ কথাগুলি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করেন। সম্প্রতি অভিধানটির জন্য তাঁর বড়ই অর্থের প্রয়োজন চলেছে।

"সাধু, সাধু, আমি ভাই তোমার দলে। ঘটকর্পর অমরসিংহের গা ঘেঁষে বসল। একটা মুখর হাসির রোল পড়ে গেল। "কবি, তোমারও কি এই মত?" মাধবী প্রশ্ন করল কালিদাসকে। কালিদাস মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। মাধবী আবার প্রশ্ন করল—"কবি, বলই না।"

"আমার মনে হয় জীবনের এক এক ক্ষেত্রে এক একটির মূল্য অপরিহার্য্য। যৌবনে কাম ও অর্থের মত বস্তু নেই। ধর্ম কিন্তু সব বয়সের।"

"মোক্ষ?"

"সেটা বোধহয় বার্দ্ধক্যে লাগতে পারে। শোভনে, আমার তো

এখনো বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়নি।" কালিদাস মৃদু হাসতেই অমরসিংহ ও ধন্বন্তরি সজোড়ে হেসে উঠলেন।

"হয়েছে বৈকি। তোমার এখন মরণদশা।" গর্জন করে উঠলেন ক্ষপণক। তারপর বিদ্রূপ করে বললেন,—"অর্থ আর কাম পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষু। জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে অধার্মিকের দল।"

কালিদাস সকৌতুক বললেন—"ধীরে, বন্ধু ধীরে। এখানে তো তোমার চতুরঙ্গ বাহিনী নেই তবে চীৎকারের প্রয়োজন কি? শোন ছাই হয়ে যাই তো যাব তবু তোমার মত ডাকিনীর সেবা না করে মোহিনীর সেবাই আমার অভিপ্রেত।"

আবার একটা হাসির সোর পরে গেল। তারি মধ্যে ক্ষিপ্ত ক্ষপণককে মুষ্টি ছুঁড়তে দেখা গেল!

এমন সময় চন্দ্রগুপ্ত এসে দাঁড়ালেন বসন্তমঞ্জরীকে নিয়ে। কামাক্ষীও এসেছেন সঙ্গে। চন্দ্রগুপ্ত ভুঁরু কোঁচকালেন,—"কি করছ তোমরা? শুধু বিতর্ক করেই কাটাবে এমন মাধবী সন্ধ্যা?"

"বিশেষতঃ মাধবী-বিতানে?" ঘটকর্পর টিপ্পনী ছাড়েন।

"শোভনে একবার ঐ দিকে চলুন, রাষ্ট্রদূতগণ আপনাদের সঙ্গে আলাপের জন্য উৎকণ্ঠ।" ভানুগুপ্ত এসে কামাক্ষীকে নিবেদন করেন। ওঁরা চলে যেতেই শঙ্কু ও ক্ষপণক উঠে দাঁড়াল।

"আমরা এবার চলি কুমার।"

"কেন হে এত শীঘ্র কেন?" বিক্রম বিস্ময় প্রকাশ করলেন!

"ওঁদের ডাকিনী-সিদ্ধির বেলা হয়ে গেছে।" অমরসিংহ বললেন। কথাটার খোঁচা ক্ষপণক বুঝলেন। ক্রুর চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মারজিৎ বুদ্ধের শিষ্য হয়ে তুমি কি করে সোম পান কর হে?"

"মারজিৎ বুদ্ধের উপাসক হয়ে তুমিই বা শঙ্কু বেতালের সঙ্গে শব-সাধনা কর কি করে? অমরসিংহের ঠোঁটে বক্র হাসি।

"ওটা মহাযানে প্রচলিত আছে।" ক্ষপণক বে ফাঁস কথা তাড়াতাড়ি চাপা দিতে চাইলেন।

"আছে নাকি? বিনয়-ত্রিপিটকে একেবারে সিদ্ধ দেখছি।" অমরসিংহের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

কূটনৈতিকদের আসরে কামাক্ষী ও বসন্তমঞ্জরীকে পরিচিত করিয়ে দিয়ে কুমার বিক্রম আবার ফিরে এলেন বন্ধুসমাজে। তাঁর সঙ্গে মন্দালিকা, সুধাবতীর দল। ততক্ষণ পরিণামচিন্তাহীন ঘটকর্পব টিপ্পনী কেটেছেন—"এমন সব মোহিনী থাকতে যোগিনীর জন্য এত ব্যাকুল কেন হে ক্ষপণক?"

ক্ষপণক তিক্ত হাসি হাসলেন,—"তোমার মত অর্থকেই জীবনের সার বলে মনে করি নি তো। ধর্মাধর্মের জ্ঞান কিছু আছে।"

চন্দ্রগুপ্ত ক্ষপণকের উগ্র ধর্মনিষ্ঠার কথা জানতেন। তিনি মধ্যপথে থামিয়ে দিলেন এই কলহ। বললেন,—"স্থিরোভব। তোমরা যাও ক্ষপণক। ধর্মের প্রয়োজন সবার উপরে। বেতাল, তুমিও যাচ্ছ নাকি?"

বেতালভট্ট এতক্ষণ একটিও কথা না বলে আপন মনে ধান্য-সুরা পান করে যাচ্ছিলেন। রক্ত নয়ন দুটি তুলে বললেন,—"অনুমতি করলে যেতে পারি।"

চন্দ্রগুপ্ত হেসে হাত তুলে ইঙ্গিতে অনুমতি দিলেন। শঙ্কু, ক্ষপণক, বেতালভট্ট তিনজনেই প্রস্থান করলেন।

অমরসিংহ উঠলেন এবার। ঘটকর্পব হাসলেন,—"তুমিও ডাকিনী সিদ্ধির জন্য চললে নাকি?"

"হ্যাঁ। তা বলতে পার। রাত্রির দ্বিতীয় যামে অভিধান-ডাকিনীর কাছে না গিয়ে পারি না। ডাকে কি না।" অমরসিংহ হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন।

বরাহমিহির এতক্ষণ ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ আগে বররুচি এসেছে পাটলীপুত্র থেকে। তার সঙ্গে জ্যোতিষ আলোচনা করছিলেন। বররুচির ইচ্ছে কালিদাসকে দিয়ে একবার তার ব্যাকরণ রচনার কথাটা চন্দ্রগুপ্তকে জানাবেন। অমরসিংহ কেমন

কালিদাসকে দিয়ে অর্থের ব্যবস্থা করে নিয়েছে। কিন্তু গতিক সুবিধের নয় বুঝে তিনি এবং বরাহ এবার কুমারের কাছে বিদায় নিলেন।

বিক্রম তাকালেন কালিদাসের দিকে,—

"কবি তুমি ?"

"আমি আছি।"

"ধন্বন্তরি ?"

"আমিও কিছুক্ষণ আছি।"

"ঘটকর্পর ?"

"আমি সর্বক্ষণই বিরাজ করব।"

"সর্বঘটে থাকা সাধু সঙ্কল্প।" কালিদাস বলতে সবাই হেসে উঠলেন। ঘটকর্পর কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় সোপানে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ শোনা গেল।

দুজন অযুক্তকের সঙ্গে প্রবেশ করলেন নৃসিংহগুপ্ত। অশ্বক্ষুরোত্থিত ধূলিরেণু পরিপ্লুত তাঁর ক্লান্ত রূপ দেখেই বোঝা যায় পাটলীপুত্র থেকে তিনি এসেছেন দ্রুতগামী অশ্বে—প্রায় কোন বিশ্রাম না করেই।

"মহাসান্ধিবিগ্রহিক !" বিক্রম বিস্মিত।

"পরমভট্টারক,"—নতজানু হয়ে অভিবাদন করে মুদ্রাঙ্কিত পত্রটি নৃসিংহগুপ্ত তুলে দিলেন বিক্রমের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে একবার চতুর দৃষ্টি সারা ঘরটিতে বুলিয়ে বুঝে নিলেন উপস্থিত কে কে আছেন। পত্র পাঠ করতে লাগলেন বিক্রম। সভায় প্রমোদ্র স্রোত প্রবাহিতই হতে লাগল। অলঙ্কারের শিঞ্জিনী—পানপাত্রের টুং টাং—পার্ষ্টির ঠকঠক ও মত্ত হুঙ্কার শোনা যেতেই লাগল। শুধু কালিদাস লক্ষ্য করছিলেন ক্ষণকালের জন্য কপালের উপর ঘনিয়ে আসা ত্রিবলী-রেখা। কিন্তু ধন্য গুপ্তবংশের শিক্ষা ও সংযম। উদগ্রীব সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে বরাভয় জানিয়ে বললেন—"ভয়ের কিছু নেই।" তারপর

নৃসিংহগুপ্তের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন,—"মহাসান্ধিবিগ্রহিক কি পান করবেন ?"

"কিছু না, কুমার। এখন একবার গৃহে যাব। স্নানাদির পূর্বে কিছু নয়।"

"না, অন্ততঃ একটু সোমরস পান করে যান।"

তাঁর ইঙ্গিতে কালিদাস গিয়ে মাধবীকে ডেকে আনল। মাধবীর রূপে আর একবার মুগ্ধ হলেন নৃসিংহগুপ্ত। কিন্তু তিনি চতুর ব্যক্তি। দেবভোগ্যা রমণীর দিকে দৃষ্টিদান বাৎস্যায়নের নিষেধ এ তাঁর বেশ মনে আছে।

মাধবী পানপাত্র তুলে দিল তার হাতে। আঙ্গুলে আঙ্গুল ঠেকল যেন বিদ্যুতের চমক। মাধবী চমকে তাকাল নৃসিংহগুপ্তের দিকে। একটা প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস নৃসিংহগুপ্তের হৃদয় থেকে উঠে গিয়ে সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ করে তুলল। আর মাধবী যেন সহসা দেখতে পেল নৃসিংহগুপ্তের সমগ্র হৃদয়তল সেই দর্পণে। দেখে সে ঈষৎ কম্পন অনুভব করল। পলকে প্রলয় ঘটল—কিন্তু কত নিঃশব্দে! চন্দ্রগুপ্ত শুধু লক্ষ্য করলেন একটা অস্বাচ্ছন্দ্য। প্রশ্ন করলেন,—

"মহাসান্ধিবিগ্রহিকের শরীর কি অসুস্থ ?"

"না কুমার, সোমরসের মাদকত্ব কিছু বেশী।"

রাত্রির তৃতীয় যামে সবাই বিদায় নিতে সুরু করলেন। কুমার কালিদাসকে বললেন—"যেও না কথা আছে।"

তারপর মাধবীকে সার্থক সন্ধ্যার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

রথে উঠে প্রশ্ন করলেন—"ভট্টিনী ক্রুদ্ধা হবেন না তো কবি ?"

"না, কুমার চল।" কালিদাস হাসলেন।

প্রাসাদে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে কুমারের মুখের প্রশান্ত-শ্রী অন্তর্হিত হোল। কালিদাস উদ্বিগ্ন স্বরে শুধালেন,—

"কি হয়েছে কুমার ?"

"পত্র পাঠ কর।"

"স্বস্তি নিবেদন,

কাশ্মীর-রাজ প্রবরসেন বিতস্তা নদীর উপর এক সেতু নির্মাণ করেছেন। সেতুর উদ্বোধন উৎসবে পাটলীপুত্র পৌরসঙ্ঘ তোমাকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন। উজ্জয়িনী-জনসঙ্ঘ নির্বাচন করেছেন কালিদাসকে। পত্রপাঠ তোমরা দুজনে কাশ্মীর যাত্রা করবে।

কালিদাস মাতৃগুপ্ত নামে পরিচিত করবেন নিজেকে। রাজা প্রবরসেনের একটি কাব্য তাঁকে মার্জনা করতে হবে। এজন্য তাকে এক বৎসরের জন্য রাজমন্ত্রী পদে বৃত করবেন। এই এক বৎসর তুমি মগধের রাষ্ট্রদূত রূপে কাশ্মীরে থাকবে। ভিষগাচার্য্য মণিগুপ্ত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ধন্বন্তরিকে পত্রপাঠ পাটলীপুত্রে আসতে অনুরোধ জানাবে। পরবর্তী রাজবৈদ্য পদে তাকে বৃত করা হোল।

মণ্ডলেশ্বর রুদ্রধরের কন্যা ধ্রুবাদেবীর সঙ্গে তোমার পরিণয়-পত্র হয়ে আছে। তাঁকে অগ্রমহিষী করা হবে এমন স্থির। শক রাজগণ দুর্বল হলেও মথুরায় বসে আছেন। হূণদের আক্রমণ যে কোনো মুহূর্তে ঘটতে পারে। এমন অবস্থায় অমাত্যবর্গদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা কোন মতেই সঙ্গত হবে না। তদ্ব্যতীত মহাকালবধূ উজ্জয়িনীর নটিমুখ্যাকে রাজভোগ্যা করা অসঙ্গত হবে। উজ্জয়িনী জনসঙ্ঘে এজন্য বিদ্রোহের সৃষ্টি হতে পারে। সেই মর্মে বৌদ্ধসঙ্ঘ থেকে অন্য একটি পত্র পেয়েছি। সাক্ষাতে এ প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।"

স্বাক্ষর : মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত।

কালিদাসের চোখের সামনে অক্ষরগুলি যেন নেচে উঠল। কাণে বেজে উঠল বরাহের কণ্ঠ—প্রবাসকর্তা দশমস্থ রাহু। গবাক্ষের বাইরে তাকালেন তিনি। অমাবস্যার রাত্রি। আকাশভরা তারার কৌতুক স্নিগ্ধ নয়ন কোথায় গেল? মাড়া কাজলের মত কৃষ্ণ মেঘে দিগন্ত অন্ধকার। মধ্যে মধ্যে দন্তুর হাসির মত বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। সভয়ে রাহুর ইষ্টদেবী ছিন্নমস্তার রূপ চিন্তা করলেন কালিদাস।

"এখন উপায় ?" হতবুদ্ধি বিক্রম প্রশ্ন করলেন যেন নিজেকেই। কালিদাসের ভুঁরু কুঁচকে এল। অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে তিনি বললেন,—"আমার মনে হয় যাত্রা করাই সঙ্গত। তারপর সেতু-উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেলে কোন একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

"কিন্তু, বন্ধু, মাধবীর কি হবে ?"

"তাঁকে রাজাজ্ঞার কথাটি বুঝিয়ে বল। সে নিজেও কি তা অগ্রাহ্য করতে পারত ?"

সহসা বিক্রম ভেঙ্গে পড়লেন,—"আমি পারব না। পারব না কালিদাস। এতো নির্বাসন দণ্ড। আমি বরং রাজত্ব রামগুপ্তকে ছেড়ে দেব। তিনিই ধ্রুবা দেবীকে বিবাহ করুন। কিন্তু মাধবীকে ছেড়ে আমি এক পলও জীবিত থাকতে পারব না। তুমি তো জান তাকেই আমি অগ্রমহিষী করতে চাই।"

"সে তো পরের কথা কুমার। কাশ্মীরে তো এখন এক বৎসর নির্বাসন দণ্ড ভোগ করতেই হবে। তারপর···"

"কি তারপর ?"

"তারপর ফিরে এসে মহারাজকে অনুরোধ জানাতে হবে। তবে বন্ধু, মগধরাজ্যের নিয়ামক রামগুপ্ত হতে পারবেন না। হলেও সে পদ তিনি রাখতে পারবেন না। জনপদসঙ্ঘ তাতে বিদ্রোহী হবে। কিন্তু আমি ভাবছি কে এই বৌদ্ধ সঙ্ঘের লেখক ?" কালিদাস আবার ভুঁরু কুঁচকোলেন।

"কে আবার ? ক্ষপণক।" ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল বিক্রমের কণ্ঠ। তারপর সেই রাত্রির ঘটনার অনুপূর্ব যা তিনি মাধবীর কাছে শুনেছিলেন কালিদাসকে বললেন। কালিদাস স্তব্ধ হয়ে রইলেন। এই মুহূর্তে কোন পথই তিনি দেখতে পেলেন না। রাত্রির অন্ধকার তরল হয়ে আসছে। তিনি গৃহে ফিরবার জন্য উঠলেন। চন্দ্রগুপ্তও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলেন। শোকোচ্ছ্বাসে কণ্ঠ তাঁর উদ্বেল,—"কবি, এই সেই চম্পকবন উদ্যান যেখানে মাধবীকে আমি প্রথম

লতাবেষ্টিতক আলিঙ্গনে বদ্ধ করি। দেখ দেখ, আজ যে সরোবরকে তিমির নির্ঝর বলে মনে হচ্ছে গতপক্ষেও তা ছিল চন্দ্রমণির বিগলিত রূপ। এর সোপানে মাথা রেখে কত জলক্রীড়া করেছি আমরা। আহা, এই সেই মালতী লতার দোলনা। প্রিয়ামস্তক বুকে ধরে কত দিন দুলেছি এখানে। কবি, এদিকে এস। চেয়ে দেখ একবার এই যূথীকুঞ্জটিকে—এর সৌরভ সংবাদ পেতাম তার কবরীবন্ধের মাল্যে।" বিচলিত কালিদাস বললেন,—"কুমার, শান্ত হও। পুরুষের ক্রন্দন শোভা পায় না।"

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বিক্রম বললেন—"বন্ধু, পুরুষের ক্রন্দন শোভা পায় না জানি। বিশেষতঃ যে ক্ষত্রিয় এবং রাজপুরুষ। কিন্তু আজ এই তমসার অন্তরালে আমাকে একবার ক্রন্দন করতে দাও। কাল প্রভাতের সঙ্গেই দেখবে আমি স্থিতধী পুরুষ। হায়, পুরুষেরও শোক হয়। হতভাগ্যদের জন্য সংসার সেটুকু স্বাধীনতাও দেয় না।"

সেই শেষ রাত্রেই কালিদাস প্রদীপ জ্বালিয়ে বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ সর্গ লিখতে বসলেন। বিষয়,—পুররবার উর্বশী-বিরহ। বাল্মীকির কাব্যে সীতাবিরহকাতর রামের চিত্রটিও বার বার তাঁর মনে ভেসে উঠছিল। ভূর্জপত্রের মৃদুত্বচে খস্ খস্ করে চলতে লাগল তাঁর মরাল পালকের লেখনী,—

'রাক্ষস নয়, এ যে নবীন মেঘ।

শরাসন নয়, এ যে ইন্দ্রধনু।

বাণধারা নয়, এ যে বৃষ্টিধারা।

কনকনিকষস্নিগ্ধা উর্বশী নয়, এ যে বিজলীদ্যুতি।'

প্রভাত বালারুণের হেমরেখা এসে কালিদাসের লেখনী স্পর্শ করল। তিনি লেখনী ত্যাগ করলেন। বিক্রমোর্বশীর শেষ অঙ্ক লেখা হয়ে গেছে। এখন অন্য কাব্য।

স্নানান্তে গোধূম সূপ, মধু ও তক্র পান করে কালিদাস চির অপ্রসন্না ভট্টিনীকে জানালেন পূর্ব সন্ধ্যার রাজাজ্ঞা। কালিদাসের রাজমন্ত্রী পদপ্রাপ্তির সংবাদে ভট্টিনী কিছু প্রসন্না হলেন। প্রশ্ন করলেন,—"যাত্রা কবে?"

"আজ।"

"আজই?"

ভট্টিনী চুপ করে গেলেন। তারপর মৃদু কণ্ঠে বললেন,—"তবে তো সমস্যা। অন্ততঃ আমার মাতৃষ্বসাকে আনিয়ে দিন। নাথ শর্মাকে বলুন রাত্রির প্রহরার জন্য। বাকি সব কাজ আমি চর্ষকদের দিয়ে করিয়ে নেব।"

কালিদাস বিরক্ত হলেন—"মাতৃষ্বসা আবার কেন? আমি তো বৎসরাধিক কালের বেশী থাকবে না।"

ভট্টিনী নয়ন নত করলেন—"প্রভু, আমি অন্তর্বত্নী।"

কালিদাস স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অকস্মাৎ একটি কোমলতার উচ্ছ্বাসে তাঁর সমস্ত মন আর্দ্র হয়ে গেল।

"বেশ, তাই হবে। নাথ শর্মা এখুনি দোলক নিয়ে মাতৃষ্বসার গৃহে চলে যাক। এই নাও একশত স্বর্ণমুদ্রা। আমি একবার মাধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি।"

ভট্টিনী করাঞ্জলি তুলে বললেন,—"প্রভু, আজ শেষ দিনেও কি আপনি গৃহে থাকবেন না? নটিমুখ্যার মূল্য কি চিরদিন ধর্মপত্নীর চেয়ে অধিক থাকবে?"

কালিদাস থমকে দাঁড়ালেন।

এ কথা যে এ নারী কোনদিন বলতে পারে তা তিনি চিন্তাও করেন নি। চিরকাল দেখেছেন অতিকোপনা, অতিকৃপণা এই নারীর আকর্ষণ হোল ভূমি, স্বর্ণমুদ্রা, গোধন, শস্য প্রভৃতি বৈষয়িক সামগ্রী।

তিনি ফিরে দাঁড়ালেন।

অগ্নিগর্ভা অরণির মতই পূতা বলে মনে হচ্ছিল আজ ভট্টিনীকে।

সেদিকে তাকিয়ে কালিদাস কোমল কণ্ঠে বললেন,—"কল্যাণী, তোমার আসন তোমারই আছে। সে যে ধর্মপত্নীর আসন। সেখানে তুমি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিতা আছো। তোমার মাতৃত্ব তোমাকে আরো মহিমা দিক। কিন্তু বিশ্বাস করো রাজাজ্ঞার জন্যই একবার মাধবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রয়োজন।"

"তাই হোক।"

মাধবী জানতো এ বজ্রের আঘাত তাকে সইতেই হবে। সেই আঘাত নামল। আর সেই অপার দুঃখই সে পেল। চন্দ্রগুপ্ত শেষ বক্তব্য বলে গেলেন,—"প্রিয়তমে, তুমি আমার যৌবনের প্রথম বসন্ত-মঞ্জরী। তুমি আমার একমাত্র সুখস্মৃতি। এখন থেকে শুষ্ক কর্তব্য ও গুরুভার রাজকার্য্য বাকি রইল আমার জীবনে।"

অশ্রুজলে মাধবীর কণ্ঠ রুদ্ধ।

কি বলবে সে এই শেষ পল বিপলে? এই ভয়ানক কঠিন মৃত্যু-মুহূর্তে? মাধবীর পাংশু শীতল ওষ্ঠে শেষ চুম্বন এঁকে দিয়ে কুমার চলে গেলেন। ময়ূরিকার কাঁধে ভর দিয়ে মাধবী দাঁড়ালো বাতায়ন পার্শ্বে। কুমারের অশ্বক্ষুরধ্বনি মাধবীর হৃদয়ে যেন বজ্র হানতে লাগলো। বার বার চন্দ্রগুপ্ত পিছন ফিরে দেখতে দেখতে চললেন। তারপর কুমারের দেহ বিন্দুবৎ হোল। সেই বিন্দুও অদৃশ্য হোল। মাধবী ফিরে তাকালো কক্ষের দিকে।

শূন্য সমুদ্র গৃহ।

শূন্য মরকত বেদী।

তার মনে হোল এ জন্মের জীবন শেষ হয়ে গেছে।

মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ে গেল কুট্টিমে।

বায়ুমর্দিতা ব্রততীর মতো মাধবীকে হর্ম্যতলে লীন দেখে কালিদাসও বুঝলেন জানাবার কিছু নেই। ময়ূরিকা বিষণ্ণ মুখে বীজন করছিল। সে বলল,—

"মূর্চ্ছাই এখন বন্ধুর মতো অসহ যন্ত্রণাকে ঢেকে রেখেছে।" চিত্রসেনা ললাটে ছিটিয়ে দিচ্ছিল শীতল জলধারা। কালিদাস মাধবীর পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন। ধীরে ধীরে মোহ কেটে মাধবী চোখ মেলল। কবিকে দেখেই তার শোক আবার উন্মত্ত হয়ে উঠলো। নীরবতাকে যেন দ্বিখণ্ডিত করে দিল তার করুণ ক্রন্দন। উন্মত্ত আবেগে একবার সে উঠে বসতে চাইলো। পরক্ষণেই বসুধাকে আলিঙ্গন করে পরে গেল। শিথিল কেশপাশ ধূলোয় জড়িয়ে যাচ্ছে। কেঁদে উঠলো সখীরাও তার সঙ্গে। বসুধালিঙ্গন ধূসরস্তনী বিকীর্ণ-মূর্দ্ধজা প্রিয় সখীর বিলাপে কালিদাসের চোখ দিয়েও নামল অশ্রুধারা। প্রিয় বিচ্ছেদের শোক যে মানুষকে বিদীর্ণ করে দেয় এ তিনি প্রথম প্রত্যক্ষ করলেন। আজ যেন তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারলেন চক্রবাকীর কান্না কেন রত্নাকরকে বাল্মীকি করে তুলেছিল। তিনি তার আপন হাতের উপর তুলে নিলেন মাধবীর হাতখানি। মাধবী তখনো বিলাপ করে চলেছে, "এ সংবাদ শোনবার পূর্বেই কেন আমার মৃত্যু হোল না? শোনামাত্রই কেন গতপ্রাণ হলাম না? শোনার পরেও কেন এখনো বেঁচে আছি?"

কালিদাস মাধবীর আধফোটা কমলের মত হাতখানি ধরে বললেন,—"স্থির হও, সখী, স্থির হও। এভাবে আত্মদহন কোর না। রতির সঙ্গে মদন যেমন মিলিত হয়েছিলেন তোমার সঙ্গে কুমারেরও তেমনি মিলন হবে।"

মাধবী গুমরে উঠলে,—"কবি, প্রকৃতির দিকে চেয়ে দেখ কে কবে প্রিয়াকে ছেড়ে দেয়? কৌমুদী শশীর সঙ্গে অস্ত যায়। তড়িৎ মেঘের বক্ষে লীন থাকে। তবে কেন আমি তোমাদের সঙ্গিনী হব না?"

কালিদাস মাধবীর কপোলের অলকগুলি সযত্নে গুছিয়ে দিতে দিতে বললেন,—"মাধবী-মালিনী, তুমি যেমন প্রকৃতির উপমা দিলে তার উত্তরে বলি গ্রীষ্মে প্রচণ্ড সূর্য্যকিরণে তটিনীর জলরাশি শুকিয়ে যায়—

কিন্তু বর্ষায় কি তা পূর্ণ হয় না ? বসন্তের ফুল অন্ত-বসন্তে ঝরে যায়। কিন্তু আবার তো ফাল্গুনী আসে।"

অশান্ত মাধবী তবু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল কপালে করাঘাত করে,—"হায় চাঁদ, হায় চাঁদেরকিরণ, হায় চূতমঞ্জরী।"

কালিদাস বললেন,—"কথা দিচ্ছি মালিনী সখী প্রতিমাসে তোমাকে শ্লোক পাঠাব। বাল্মীকির চক্রবাকীর মত তোমার বেদনাও সিদ্ধ হবে। এবার একবার প্রসন্ন-নয়ন তুলে চাও।"

প্রভাতের শশিলেখার মত ম্লান করুণ হেসে মাধবী বলল,—"কবি ক্ষমা কর। আমার অশ্রুজলে তোমাদের যাত্রায় যেন বিঘ্ন না ঘটে।"

পাঁচ

পর্বতের উপরে পর্বত—তারো উপরে পর্বত।

এ যেন কোন মেঘলোকে তাঁরা প্রয়াণ করছেন।

কত জ্যোতির্ময়ী ওষধী, কত উজ্জ্বল ধাতু।

খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে যেন বিলাসিনী সিদ্ধাঙ্গনা। নির্ঝর-শীকর-সিক্ত কম্পিত দেবদারুর উন্নত শীর্ষগুলি কি সবুজ। বহু-বল্কল প্রিয়াল আর মৃদুত্বচ ভূর্জবৃক্ষগুলি কেমন সুন্দর শোভাময়। নমেরুশাখা নেমে এসেছে মাটির ওপর কচি শিশুর মত। পুন্নাগকুসুমে সুরভিত বাতাসকে মদির করে তুলেছে শিলাজতুর সুগন্ধ। কোথাও বা নাকে ঠেকছে টাটকা ভাঙ্গা দেবদারু শাখার সুবাস। অলক্তকের মত রক্তের দাগ ফেলে গেছে কোন পশুর শীকারের ইঙ্গিত। কর্ণিকার ফুলগুলির উজ্জ্বল সোনালী রংয়ে কালিদাস মুগ্ধ হলেন। কিন্তু হায়, এদের কোন গন্ধই নেই। তিনি মনে মনে বিধাতার কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে উঠলেন মনে মনে,—"কেন তোমার এই পূর্ণ-পরাঙ্মুখ প্রবৃত্তি ?"

কালিদাস চোখ মেলে নয়ন ভরে দেখতে লাগলেন। মৃগগুলি ছুটছে। পিয়ালমঞ্জরীর রজকণা বাতাসে উড়ছে। হিমের প্রকোপের জন্য এ দেশের মেয়েরা মধু ও কুঙ্কুমের প্রলেপ মুখে মেখেছে। পঙ্কজ-রেণু-গন্ধি জল শুঁড় দিয়ে তুলে হস্তী হস্তিনীকে স্নান করাচ্ছে। হাস্যফেণমুখরিত জলতরঙ্গে ঢেউ তুলে চলেছে কোন কিশোরী নদী। মাধবীর কথা মনে পড়ল কালিদাসের। আহা, এ নদীর নির্মল জল যেন তার হৃদয়ের মত। নাকি শিপ্রা নদীর মত? কত নদী-ই না অতিক্রম করেছেন তাঁরা। অচ্ছোদ গম্ভীরানদী—কলহংসমুখরিত নির্ব্বিন্ধ্যা নদী—শৈবালকীর্ণা চর্ম্মন্বতী নদী। নদীর সঙ্গে নারীর যেন কোথায় একটি যোগ আছে মনে হোল কালিদাসের। আহা অপরূপা চর্ম্মন্বতীবেষ্টিত দশপুর। দশপুরের মেয়েদের কেমন চূড়োর মত চুল বাঁধা। কত পথই না পার হয়ে এসেছেন তাঁরা—কত দেশ—কত শিখর। ব্রহ্মাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, কনখল, ক্রৌঞ্চরন্ধ্র। অবশেষে পঞ্চালধার।

বাণশাল গিরিপথ থেকে কাশ্মীরকে দেখাল ঠিক দধিপাত্রের মত। অবশেষে তাঁরা পৌছলেন কাশ্মীরে। এক যোজন পথ বাকি থাকতেই রাজসমাদর সুরু হোল। কোট্টপাল এসে অভিনন্দন জানালেন মহারাজ প্রবরসেনের পক্ষ থেকে,—"পরমভাগবত, পরমশৈব পরমভট্টারক কুমার চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক। পরমশৈব, সারস্বত মন্ত্রী মাতৃগুপ্তের জয় হোক।

স্বাগত। সুস্বাগত।"

অশ্বপৃষ্ঠে কুমারের পাশে পাশে যাচ্ছিলেন কালিদাস। বড় সুন্দর এই দেশ কাশ্মীর। তাঁর বড় ভাল লাগছিল। বিশেষতঃ পার্বতীর প্রিয় এই দেশ। এখানে যে তিনি বিতস্তা রূপে প্রবাহিত। গুহ গণেশকে তৃপ্ত করে তিনি এই দেশকে আপন পীযূষ ধারায় তৃপ্ত করছেন। শুধু কি পার্বতীর প্রিয়? এদেশ শৈবদেরও প্রিয়। কপোতেশ্বর শিব থাকেন এখানে পাপসূদন উৎসের কাছে। নাগেদেরও

প্রিয় এই স্থান। বাণশাল গিরিবর্ত্মের তলায় যে নীলকুণ্ড থেকে পার্বতী-বিতস্তার উদ্ভব সে স্থানটি ছিল নীলনাগের প্রিয়।

কোট্টপাল পদ্মপুরে পৌঁছে দেখালেন কুঙ্কুমের ক্ষেত্র। এই সেই কাশ্মীর-রজ। পাশে পাশে জলের নহর। কুঙ্কুমের ক্ষেতে কমলা-রঙের ফুল। আক্ষোট, কপিত্থ, বীজপুর, নাগরঙ্গ, দ্রাক্ষা কত রকমের ফলের গাছ। তিনি দেখালেন 'সুশ্রব' নামে মিষ্ট জলের সরোবর। শ্রীনগরীর লোকেরা এই জল পান করে। বললেন যে অমরেশ্বর মন্দিরের কাছেও আছে এমন সুন্দর সরোবর—শেষ নাগ ও জামিতৃ-সর। তক্ষক-নাগ সে দুটির স্রষ্টা। কালিদাস কিন্তু দেখছিলেন কাশ্মীর বৌদ্ধদেরও প্রিয়। ধর্মযান চৈত্যটি কি বিশাল। অমর-সিংহকে জানাতে হবে।

এই সব দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত তাঁরা শ্রীনগরীর দ্বারে এসে পৌঁছলেন। দূরে হর মুখ পর্বত। একটু দূরে ভূতেশের মন্দির। নগরীর মধ্যে গোপকার পর্বত। সেখানে আছেন জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব। কালিদাস মনে মনে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলেন।

সভায় ঢুকতেই রাজা প্রবরসেন উঠে এসে আলিঙ্গন বদ্ধ করলেন দুই বন্ধুকে। প্রথম দর্শনেই যেন তাঁর প্রেম হলো। কালিদাসেরও ভাল লাগল কাশ্মীর-রাজকে। উৎসব উপলক্ষে এসেছেন অনেকেই। কপিশার রাষ্ট্রদূত, গান্ধারের যুবরাজ, কর্ণাটের বিদুষী রাজমহিষী, সাকেত—প্রতিষ্ঠান—কোশলের রাজন্যবর্গ।

মহারাজ প্রবরসেন বললেন,—"আপনাদের নন্দিকা-প্রাসাদ ভবনে থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। নিকটেই। মাত্র একগব্যূতি দূরে।"

চন্দ্রগুপ্ত বললেন—"উত্তম, উত্তম। সেতুবন্ধন উৎসব কবে?"

"জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমার দিন।"

"তবে তো আর মাত্র এক সপ্তাহ।" কালিদাস বললেন। প্রবরসেন মৃদু হাস্য করলেন,—"তাই। তবে আপনাদের কুশল না

পেলে হয়তো দিন পরিবর্তন করতে হোত। কিন্তু আর বিলম্বের প্রয়োজন নেই। নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গ সকলেই এসে গেছেন। আর দেরী করতে চাই না।

বৎসর বৎসর বড় দুঃখ দিয়েছে মহাপদ্ম সরোবরের বন্যা। রক্ত, মাংস ও মানুষের মৃতদেহে মনে হয়েছে বিতস্তা যেন ময়ূর-পালকের রং ধরেছে। কালান্তকের অট্টহাস্যের মত বরফে ভরে গেছে ধানের ক্ষেত। প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে মানুষ হারিয়েছে তার মনুষ্যত্ব, দয়া, প্রেম, স্নেহ। তাই জলনির্গম ব্যবস্থা এবার সুগম করা হয়েছে। গ্রামে গ্রামে দেওয়া হয়েছে বাঁধ—রাখা হয়েছে খেয়া। পানীয় জলের জন্য খনিত হয়েছে বৃহৎ তড়াগ, দীর্ঘিকা।"

কালিদাস খুশী মনে তাকিয়েছিলেন এই নৃপতির দিকে। ধর্ম ও অভ্য সর্বত্র ঠিক। রাজা প্রবরসেনের কীর্তি এই শ্রীনগরী। তিনি তাকিয়ে দেখলেন সভাগৃহে সবাই সুসংযত। মন্ত্রী, সর্বরত্ন, পুরোহিত, দ্রব্যসঞ্চয়কৃৎ, অটবীপাল সবাই রাজার সঙ্গে সহজে কাজ করে যাচ্ছে। শান্তি, সর্বত্র শান্তি।

কাশ্মীরে দুই বন্ধুর দিনগুলি কাটতে লাগল মধুর আলস্যে। কত দেশের কত বিচিত্র মানু‥ সমবেত হয়েছে এই উৎসবে। বিচিত্র তাদের বেশভূষা—বিচিত্র আচার। কালিদাস চোখ মেলে দেখছিলেন সেই মানব চরিত্রের চিত্রশালা। বিতস্তার সেতু নির্মাণ উৎসবকে কেন্দ্র করে মহারাজ প্রবরসেন রামচন্দ্রের সেতুবন্ধন কাব্যটি রচনা করেছেন। অবসর কাটে তাঁর সেইটি পরিমার্জনা করে।

উৎসবের দিনটি এল।

পুরনারীরা মঙ্গলকলসে জল ভরে সারা নগরী ধৌত করে দিল। পুষ্পখচিত তোরণের মধ্য দিয়ে রাজা প্রবরসেন রানী রত্নপ্রভাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন—পেছনে রাজকুমার যুধিষ্ঠির ও মন্ত্রী মাতৃগুপ্ত। পুষ্পবৃষ্টি ও লাজবর্ষণের মধ্য দিয়ে মহারাজ সেতু পার হলেন।

পুরোহিতের মঙ্গল-বচন ধ্বনিত হতে লাগল। আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হোল এক সারি হংস-বলাকা। গন্ধবারি ছিটিয়ে দেওয়া হোল সমাগতদের উপরে। নদীস্রোতে চলমান হোল একশত পুষ্পতরণী। তরণীতে নাগরিক ও রাজন্যবৃন্দ। সুন্দরী গায়িকা ও নর্তকীরা নৃত্যগীত করছেন তাতে। অপূপ, করম্ভক আর পুলাক ভারে ভারে বয়ে নিয়ে এল রন্ধনশালা থেকে ভৃত্যবর্গ। পর্বত প্রমাণ সেই খাদ্য সম্ভার দেখে বিদূষকবর্গরাও সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু এমন উল্লাসমুখর উৎসবের দিনেও চন্দ্রগুপ্ত আনমনা হয়ে রইলেন। অগত্যা কালিদাসকেই প্রবরসেনকে যথাযোগ্য সাহচর্য্য দিতে হোল। 'সেতুবন্ধ' কাব্য আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে কালিদাসের কেবলি মনে হোতে লাগল সীতাবিরহী রামচন্দ্রের মত চন্দ্রগুপ্তের বেদনাতুর মুখখানি। দূরে হরমুখ পর্বতের তুষারশুভ্র রজতকান্তিতে সোনার রোদ এসে পড়েছে—মনে হচ্ছে যেন হরপার্বতীর মিলিত রূপ। আহা, এই হিমবন্তকে অবলম্বন করে তাঁর ইষ্ট পার্বতী-পরমেশ্বরকে নিয়ে একটি কাব্য লেখা তাঁর কত দিনের সাধ। কিন্তু সুহৃদের বেদনা কালিদাসকে আবার আনমনা করে দিল।

মনে পড়লো মাধবিকাকে কথা দিয়ে এসেছিলেন প্রতি পক্ষে অন্ততঃ নয়টি শ্লোক পাঠাবেন। নবরত্নের সূত্র যে সে। তার মালিনী সখী। কালিদাস মনে মনে আরক্ত হলেন একটু। আর তো সময় নেই। জ্যৈষ্ঠসংক্রান্তি তো শেষ হতে চলল। পরশ্ব আষাঢ়ের প্রথম দিবস। কিন্তু কি কাহিনী এবার অবলম্বন করবেন তিনি ? সমদা প্রমদা উর্বশীর মদগর্ব বর্ণনার পর কিরূপ তিনি দেবেন ক্রূর নিয়তি-কিরাতের কার্মুকে আহতা মৃগবধূর মত ধূলি-লুণ্ঠিতা মাধবিকার ? তখনি কিছু মনে হোল না তাঁর। সুন্দরী নাগরিকাদের উতরোল উল্লাসধ্বনিতে বার বার খণ্ডিত হয়ে যেতে লাগল তাঁর চিন্তাধারা।

আষাঢ় মাসের প্রথম দিন। এ কয় রাত্রি অমল ধবল জ্যোৎস্নায় হরমুখের ধ্যানীরূপ দেখতে দেখতে কালিদাস নিদ্রিত হয়ে পড়তেন।

কিন্তু আজ একি? মত্তমাতঙ্গের মত প্রকাণ্ড মেঘে অন্ধকার হয়ে গেছে হরমুখের শুভ্র জ্যোতি। কালিদাস অলিন্দে এসে নির্ণিমেষে চেয়ে রইলেন সেই ধূমজ্যোতি সলিলগর্ভ শ্যামগম্ভীর মেঘের দিকে। অকাল সন্ধ্যা। কানে বাজছে রাজ্যাস্ত্যার মত মেঘসংঘর্ষের গম্ভীর নির্ঘোষ। শীকরসিক্ত বাতাস অশ্রুসিক্ত অভিমানিনীর মত বিপুল বেগে চলে যেতে চায় দূরে।

বেদীতে বসে বীণা বাজাচ্ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। রাগ মেঘ। এই কয় দিনেই কেমন শীর্ণ হয়ে গেছেন তিনি। তাঁর ক্ষীয়মান প্রকোষ্ঠের বলয় খসে পড়েছে স্বস্থান থেকে। সহসা চপলাচমকের মত কালিদাসের মনে স্ফুরিত হোল কুবের শাপে নির্বাসিত রামগিরির যক্ষের কথা। রক্তচন্দনপঙ্কে গজদন্তের লেখনী ডুবিয়ে তিনি তখুনি নবগীত রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। শোক থেকেই শ্লোক জাত। কতকাল আগে ক্রৌঞ্চবধূর মর্মবেদনাকে অমর করে গিয়েছিলেন বাল্মীকি; আবার কত যুগ পরে যক্ষবধূর ক্ষুব্ধ মর্মের অন্তর্বেদনায় আর এক কবির লেখনী স্পন্দিত হোল। যক্ষরাজ কুবের-প্রতিম সম্রাট সমুদ্র-গুপ্তের রোষে যক্ষের মতই কুমার চন্দ্রগুপ্ত নির্বাসিত হয়েছেন রামগিরি সদৃশ এই কাশ্মীরে। অভিশপ্ত যক্ষের মতই প্রিয়াবিরহিত দিনগুলি তাঁর কাটছে গুরু বিচ্ছেদ ভার বক্ষে নিয়ে। তাঁর মন পড়ে আছে সেই অলকার মত উজ্জয়িনীতে। বন্ধুর যন্ত্রণা যেন কালিদাসের যন্ত্রণা। সমুদ্রগৃহে ফেলে আসা নিঃসঙ্গিনী মাধবীর রূপটি বারে বারে ভেসে উঠতে লাগল তাঁর সজল চোখে। বাতাসে কূটজ কুসুমের গন্ধ; এ যেন উজ্জয়িনীর গন্ধ-স্মৃতি। মনশ্চক্ষে ভেসে উঠছে হরশিরশ্চন্দ্রিকা-বিধৌত উজ্জয়িনীর হর্ম্যরাজি। মাধবী আসবার সময় বলেছিল,—"বৃন্তে লাগা শিথিল ফুলের মত তোমাদের আশায় প্রাণটুকু আমি রাখব।"

কালিদাস সেই প্রণয় বিধুরাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই সমস্ত প্রকৃতিকে চৈতন্যময় করে তুললেন। শোকের সান্ত্বনা যে প্রকৃতি এ তো তিনি নিজেই হৃদয় দিয়ে বুঝেছেন। বাল্মীকির সীতাদেবীও তো

স্রাবণ কবলিত হয়ে জড়প্রকৃতিকে চৈতন্যময় ভেবে আকুল শোকাবেগ নিবেদন করেছিলেন। প্রতিটি উপমার মধ্যেই ভেসে উঠছিল মাধবীর রূপশ্রী। কদম্বফুলের রোমাঞ্চিত কেশর বর্ণনার মধ্যে ফুটে উঠল প্রিয়দর্শনের আনন্দে রোমাঞ্চিত মাধবীর পুলক। পুরললনাদের বিদ্যুদ্দামস্ফুরিত চকিত লোচনের বর্ণনায় ফুটে উঠল মাধবীর অসিত-নয়নের অপাঙ্গ। আহা, সদ্যবিকশিত শতদলশোভিত শিপ্রা নদী; পদ্মফুলের গন্ধ মাখা শিপ্রাসমীরণ। সেখানের সারসকুলের সুমধুর ডাক যেন এখনো কবির কাণে বাজে। কুন্তলসংস্কার ধূপের গন্ধে সুরভিত গবাক্ষের সুবাস যেন এখন পাওয়া যায়। হয়তো মাধবিকা অবসর কাটাচ্ছে ভবন-পালিত শিখীকে নৃত্য শিখিয়ে। তালে তালে বাজছে তার হাতের কঙ্কণ। হয়তো সোনার পিঞ্জরের সারিকাকে শেখাচ্ছে মধুর বোল। তার অলক্তকরঞ্জিত পদরেখাঙ্কিত সোপানশ্রেণী ভেসে উঠছে কালিদাসের চোখে। কাণে বাজছে নিতম্বমেখলার মৃদু নিক্কণ। আহা, এই নবজলকণায় স্নিগ্ধ হোক তার নখরক্ষত অঙ্গ। নিশীথের সূচীভেদ্য অন্ধকারে আর কি সে যায় অভিসারে? মেঘ গর্জনে ভীত হয়ে যাকে জড়িয়ে ধরত সেই অভয়-প্রদ-জন আজ কতদূরে।

এই মেঘবেদনা সঞ্চারিত হোক। পাহাড় তাকে চূড়ায় স্থান দিক—নদীরা তাকে জল দিক—বায়ু দিক গতি—ফুলেরা অর্ঘ্য—শিখীরা নৃত্যছন্দ।

আমার অলকা—আমার উজ্জয়িনী। যেখানে নিত্য ফোটে ফুল—ভ্রমবগুঞ্জনে যার কুঞ্জবন মুখর। যার সরোবরে বিকচপদ্ম—যার সরসী-নিতম্বে মবালমেখলা।

যেখানে অশ্রু মানে আনন্দাশ্রু।

তাপ মানে মদনতাপ।

দ্বন্দ্ব মানে প্রণয়দ্বন্দ্ব।

বয়স মানে স্থির-যৌবন।

সুরেন্দ্রবাঞ্ছিতা সুন্দরীরা সেখানে গুপ্তমণি কিংবা অক্ষক্রীড়া

খেলছে। কনকবরণা, বিম্বোষ্ঠী, এণ-নয়না, ক্ষীণকটি, গভীর নাভি, গুরুনিতম্বিনী শ্রীফলের মত স্তনযুগলভারে ঈষৎ সাচীকৃতা মাধবীর রূপটি মনোদর্পণে প্রতিবিম্ব ফেলল। হায়, আজ তার সকল শোভাই বিরহমলিন। কবরীতে নেই ফুলহার। কটি দেশে নেই মুক্তামেখলা। কাজলহীন নয়ন, তাম্বুলহীন অধর, লাক্ষাহীন চরণ। নিঃসঙ্গ ক্রৌঞ্চবধূর মত মূর্ছিতা, ভূমিলগ্না হয়ে পড়ে আছে। যেন ভোরবেলার অসিতপক্ষের শশীরেখা। স্বপ্নে মিলনের জন্য যে বৃথাই নিদ্রার প্রার্থনা করেছে। আর সারারাত রাহুর দন্তদলনে বিগলিত চন্দ্রের অমৃতধারার মত অবিরত অশ্রুবর্ষণে অরুণিত হয়েছে যার নয়ন। নিয়ত দীর্ঘশ্বাসে বিবর্ণ অধরোষ্ঠ যেন দিনান্তের কমলিনী।

হয়তো মাধবী মহাকালের মন্দিরে আনত হয়ে আমাদেরি কল্যাণ কামনা করছে। কলসীর তীর্থধারায় বাজছে জলের সুর। হয়তো বা নির্জনে মৃগমদ দিয়ে প্রিয়নাম লিখছে নলিনীপত্রে। গ্রীষ্মবিশীর্ণ নদীর মত বিরহক্ষীণা সেই করকমলের বলয় বারে বারে ভ্রংশ হয়ে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে দুরদৃষ্টের মত। পরিধানের বসন পাংশু।

আহা, কি সুন্দরী না তাকে দেখায় তরুণার্ক রাগের মতন পট্টাম্বরে। মেঘরুচি নীলবসনে। অগ্নিপট্ট অংশুকে পাটলবর্ণ অবগুণ্ঠন টেনে যেদিন সে প্রথম নেচেছিল মহাকালের মন্দিরে কালিদাসের মুগ্ধ নয়নে মনে হয়েছিল মূর্তিমতী বসন্ত-মঞ্জরী। হয়তো বীণার তারে সুর মিলিয়ে গাইছে কালিদাসেরি গান। চোখের জলে ছিঁড়ে যাচ্ছে সেই সুর। একটি একটি করে পদ্ম তুলে রাখছে সম্পুটে একটি একটি বিরহরজনী গণনা করে।

কুসুম শয্যাকে মনে হচ্ছে শরশয্যা,
চন্দনকে আগুন,
মলয় পবনকে হুতাশন শিখা,
চন্দ্রকে অগ্নি।

মনে হচ্ছে নীল পদ্মের মালা নয়, কৃষ্ণসর্প। অলিগুঞ্জন নয়, ও অশনি-সম্পাত।

কতদিনে চাঁদ ও কুমুদেব মিলন হবে?

কবে ভ্রমব কমলে খেলা করবে?

বক্ষে রাখেনি অংশুক চন্দন তবু প্রিয়তম আজ হিমালয় পারে। প্রিয়ের গর্ব একটি মাত্র সুখ— তাও চূর্ণ হোল।

সেই ঘন রসময় তনু অগাধ অন্তর কখনো জ্যোৎস্নাভিসারে ধবল কৌমুদীর সঙ্গে বসন ভূষণ দেহকান্তি মিলিয়ে নিয়ে চলত। তামসী অভিসাবে আবৃত করত স্বর্ণতনু নীলনিচোলে। তুলো দিয়ে নূপুর-গুঞ্জন বন্ধ করতো যেন কেউ না শুনতে পায়। ধনুমুক্ত বাণের মত ছুটে চলত। অন্ধকার মেঘাবৃত রাত্রি কিন্তু মন্মথ প্রদীপে তা উজ্জ্বল; দুস্তর পথ কিন্তু মনোবেগে তা অতিক্রম্য। একাকিনী অভিসারিকা কিন্তু সঙ্গী আছেন স্বয়ং কন্দর্প। সর্প, বস্ত্র, লোকলজ্জা সব সেখানে তুচ্ছ হয়ে যায়। হায়, সখীর বাসক-সজ্জা।

আর কি মণিমন্দিরে ভৃঙ্গারের বারি বাসিত হয়? আর কি তাম্বুল কর্পূরিত থাকে? আর কি ফুল-শয়নে কদম্ব রেণু বিছান হয়? হংস-সারস-শুক-ময়ূর-কোকিল গুঞ্জিত কাননে আর কি সে ভ্রমণ করে?

মদীশ্বরী, সঘন মেঘে যেমন দামিনী আমার বিরহ বেদনার মধ্যে তেমনি তোমার রূপ। ধৈর্য ধর। ওগো প্রিয়ে, ধৈর্য্য ভিন্ন পথ কোথায়? জীবন চক্রনেমীর মত চলে। তুমি হতাশ হয়ো না। এই কয়টা মাস কাটিয়ে দাও। তারপর তোমার সব অতৃপ্ত আশা তৃপ্ত হবে—সব অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে—সব অসাধ সিদ্ধ হবে।

প্রতি পক্ষে এমনি সব সুমধুর শ্লোক কালিদাস পাঠাতেন মাধবীকে। আর চন্দ্রগুপ্ত?

তিনি কখনো বা তাকিয়ে থাকেন মেঘের কোলে চলেছে যে শুভ্র বলাকা শ্রেণী তার দিকে। শোনেন তৃপ্ত চাতকের কূজনধ্বনি। কখনো রঙ তুলি নিয়ে নিবিষ্ট মনে আঁকেন আম্রকুট পর্বত—

শৃঙ্গারবেণী গঙ্গের অঙ্গরাগের মত রেবাবেষ্টিত বিন্ধ্য—কখনো বা তাঁর প্রণয় মিলন স্থান কেশর কুঞ্জ যেন রোমাঞ্চিত পুলকের গাঢ় রূপ। আঁকেন পথে দেখা কত না নদী, দেশ—পদ্মফুলের পরাগগোলা গন্ধাবতী। কেতকী কুঞ্জে ঘেরা দর্শনাদেশ—যার রাজধানী বিদিশায় মেখলার মত বেত্রবতী নদী। আঁকতেন মহাকাল মন্দিরের সন্ধ্যারতি। সন্ধ্যা পূজার বন্দনায় হল্লীষক নৃত্য। ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগৃহে একটি অভিমানিনীর ছবি—তার উত্তোলিত হাতে রত্নমুষ্টি যেন যৌবনের প্রদীপ নিবিয়ে দেবে জীবনের মত।

কালিদাস জোর করে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন বাস্তব পৃথিবীতে। সেতুবন্ধ কাব্য মার্জনা করতে বসেন মাতৃগুপ্ত সেজে। ভর্তৃমেন্থ বলে আর একটি নবীন কবি সম্প্রতি দিয়ে গেছেন 'হয়গ্রীবের তিরোভাব' নামে এক কাব্য। বড় সুন্দর লেখা। একটি ছোট্ট সোনার নৌকোর উপর কাব্যগ্রন্থটি রেখে দিলেন তিনি। নবীন কবিকে এই ভাবে উপহারটি দিতে হবে। কিন্তু কাব্য শুদ্ধ করতে করতে কখন লিখে বসেছেন,—

সুচারু চাঁদের রূপ আঁকে মুখ তোমার সুন্দরী
চকিতা হরিণী তব কটাক্ষ কি করিয়াছে চুরি?
তটিনী তরঙ্গে লাগে তোমার মধুর ছন্দলীলা,
প্রিয়ঙ্গুলতায় দোলে তোমার অঙ্গের সুমাধুরী।

তবু কেন অসম্পূর্ণ থেকে যায় মোর চিত্ররেখা
উপমা বা অলঙ্কার ব্যর্থ মানে তোমারে বর্ণিতে?
অন্ধকার মেঘলোকে চকিতে বিদ্যুতে আঁকে লেখা,
তেমনি এস না তুমি আন [illegible] এ অশ্রু-অন্ধ চিতে।

অসম্ভব, অসম্ভব, তুমি কোথা? আজ কত দূরে?
বিচ্ছেদের এ বেদনা সহে না, সহে না, সখী আর।

শিরায় শিরায় বাজে অগ্নিময়ী বীণা এক সুরে,
উপায় পাই না কিছু। কোথা শান্তিজল এ জ্বালার ?

তাই বলি ধৈর্য্য মানো, দুঃখ ভোলো, অশ্রু মোছ, সখী
হেথায় অনিত্য সবই সুখ দুঃখ চক্রনেমীবৎ
অমাবস্যা শেষ হয় হাতে বাঁধি পূর্ণিমার রাখী
প্রাবৃষার তৃষা অন্তে পুনঃ হেসে আসিবে শরৎ।

পত্র নিয়ে এল প্রতিহারিণী। বিক্রম তাকালেন—"কার পত্র মাতৃগুপ্ত ?"

"ঘটকর্পরের।"

"তাই নাকি ? কি লিখেছে ?" বিক্রম সাগ্রহে তাকালেন উজ্জয়িনীর সংবাদের জন্য।

"ঘটকর্পর লিখছেন, আচার্য দিঙ্‌নাগ আমার গ্রন্থগুলির নির্মম সমালোচনা করেছেন তাঁর শিষ্যদের কাছে। কিন্তু শিষ্যদের মধ্যে নিচুল তাঁর সঙ্গে একমত নয়। এ ভিন্ন বররুচির বন্ধু পাণিনির শিষ্য মল্লিনাথও এতে বিরক্ত হয়েছেন। তিনি আমার গ্রন্থাদির উপর টীকা রচনা করতে চান। কারণ নানা মুনির নানা মত দেখা দিচ্ছে। (এখানে মাতৃগুপ্ত একটু হাসলেন)।

ঘটকর্পর আরো লিখেছে যে মাধবীর কাছে প্রেরিত মেঘদূত পড়ে সেও অনুপ্রাণিত হয়ে 'প্রতিমেঘ' কাব্য রচনা করছে। এই সংবাদটি কুমারকে বিশেষ করে জানানো হোক। তার কাব্যে যমক, অনুপ্রাস প্রভৃতি যে অলঙ্কার চাতুর্য আছে দুঃখের বিষয় বৈদর্ভরীতির মেঘদূতে তা নেই। যদিও সে যদি কাছে থেকে সংশোধন করে দিতে পারত তবে মেঘদূত একটি উত্তম কাব্য হতে পারত। কিন্তু হায় নবনীতকে ভস্মে ফেলা হয়েছে। লবণভূমিতে শস্য বোনা হয়েছে।

বৈদর্ভী রীতি আবার রীতি নাকি ? নবীন কবির নবীনত্ব কেউই বুঝতে পারছে না। দুর্বোধতা দোষে দুষ্ট।"

"সাধু, সাধু।" বিক্রমাদিত্য উচ্চহাস্য করে উঠলেন অনেক দিন পরে।

"আর কি সংবাদ?"

"বেতাল ভট্ট সম্প্রতি তন্ত্র-সাধনার জন্য জামদগ্ন্য-যশোবর্ত্মে গিয়েছেন।"

"সেটা আবার কোথায়?"

"ক্রৌঞ্চরন্ধ্র নামে যে গিরিসঙ্কট আছে—সেটারই এই আরেকটা নাম।"

"তা ওরূপ নাম হোল কেন?"

"একবার পরশুরাম ও কার্তিকের মধ্যে বিক্রমের প্রতিযোগিতা হয়। তখন স্থির হোল যিনি ক্রৌঞ্চ পর্বত ভেদ করতে পারবেন তিনিই জয়লাভ করবেন। পরশুরাম জয়লাভ করেন। সেই থেকে এই রন্ধ্র জামদগ্ন্য-যশোবর্ত্ম নামে খ্যাত হোল।"

মাতৃগুপ্ত এবার ধন্বন্তরীর পত্র খুললেন। তাঁর মুখ গম্ভীর হোল। বিক্রম লক্ষ্য করলেন।

"কোন অশুভ সংবাদ?"

"সম্রাট অসুস্থ। তাঁর ভস্মক রোগ হয়েছে বলে ধন্বন্তরির বিশ্বাস। এ রোগে পিত্ত ও বায়ু কুপিত হয়। খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করলে তা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত বস্তুর মত ছাই হয়ে যায়। কিন্তু ভিষক শ্রুতসেন তাঁর সঙ্গে একমত নন। তিনি বলেন সম্রাটের বহুমূত্র রোগ হয়েছে। এই নিয়ে মতদ্বৈধতার ফলে চিকিৎসা বিভ্রাট দেখা দিয়েছে। শ্রুতসেন বয়সে প্রাচীন সেহেতু হরিষেণ প্রভৃতি মন্ত্রীবর্গ তাঁর পক্ষে। ধন্বন্তরি বয়সে তরুণ তদুপরি নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষার পক্ষপাতী। এ মন্ত্রীবর্গের তার উপর আস্থা নেই। অবশ্য কুমার যদি বলেন তবে সে পাটলীপুত্রে থাকবে। কিন্তু দিনে দিনে সম্রাটের ভুল চিকিৎসার ফলে আয়ুহীন হচ্ছে। ভারত বিজয়ী সমুদ্রগুপ্ত আজ এক হাতে গরুড়ধ্বজ তুলতে

পারেন না। অশ্বে আরোহণ করতে ভীত হন। এ দৃশ্য দেখা কষ্টকর।”

“মাতৃগুপ্ত, আমাব এখন গ্রহবৈগুণ্য চলেছে। আমি যেটাই বলব সেইটাই নষ্ট হবে। জান তো নলরাজার কি দশা ঘটেছিল। সম্রাট কি আমাদের ফিবতে প্রত্যাদেশ দিয়েছেন ?”

“না। ধন্বন্তরি লিখছেন, সম্রাটের শরীর যদি আরো খারাপ হয় তবে সে যথা সময়ে সংবাদ পাঠাবে।”

চন্দ্রগুপ্ত একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

* * *

বর্ষার পর শরতে বিতস্তা তার পদ্ম-সম্ভার নিয়ে হেসে উঠল। দ্রাক্ষাকুঞ্জে দুলে উঠল মবকতমণির মত দ্রাক্ষা ফল। ধীরে ধীরে কুমারের মনও যেন পরিবর্তিত হতে লাগল। নারী নয়, রাজকার্য। রাজকার্যেই তিনি বিশেষ আসক্ত হয়ে পড়লেন। দায়িত্বহীন দক্ষিণ-নায়ক আর নয়। দায়িত্ববান প্রজাশাসকের ভূমিকা যেন তাঁর। কিন্তু কালিদাস লক্ষ্য করলেন চন্দ্রগুপ্ত ভুলে যাচ্ছেন মাধবীকে।

তাহলে শেষ করা যাক কাব্যদূত পাঠান ?

আর কেন ?

কিন্তু তাহলে কি মাধবীর কাছে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের দায়ে তাঁকে পড়তে হবে না ? যে দূরে আছে তাকে বোঝাবেন কি দিয়ে ?

বেদনাভর চিত্তে কাব্যরচনা করতে বসে দেখলেন তাঁর কাব্যস্রোত তো মন্দীভূত হয় নি। উৎস যেখানে শুকিয়ে যাচ্ছে প্রেরণা কি করে প্রবাহিত হচ্ছে ? কালিদাস নিজের অন্তর গহনে আর একবার ডুব দিলেন। ভীত বিস্ময়ে দেখলেন সেখানে তাঁর মাধবীর প্রতি আকর্ষণ কিছু মাত্র মলিন হয় নি। বরং বিচ্ছেদের ‘কষ্টি পাথরের শাণিত হয়ে তা উজ্জ্বল হয় উঠেছে। যক্ষের বেদনা যে তাঁরই অন্তর্বেদনা—বিক্রম যে শুধু শিখণ্ডীমাত্র এটা বুঝে তিনি কণ্টকিত হয়ে উঠলেন।

একবার মনে হোল, বন্ধুকে কি তিনি প্রবঞ্চনা করে এসেছেন তবে?
—না, না, না।

মাধবীর হাসির আলো, চলার ছন্দ, নাচের ভঙ্গী, বীণার সুর রূপ-রসগন্ধ মায়ায় তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু জীবন্ত মানুষটির দিকে তো লোভের হাত কখনো প্রসারণ করেন নি।

তবে…?

কবি কালিদাস মন্ত্রী মাতৃগুপ্তকে ধিক্কার দিলো—"এতো কূটচাল হোল। অন্তর্দর্পণে দেখ তো স্পষ্ট করে যে প্রেয়সীকে নিয়ে বিলাস করছে তোমার অন্তর সে কে? কামীযক্ষের কামনা দিয়ে গড়ে তুলেছ সে কোন অবয়ব? লোধ্ প্রসবরজে পাণ্ডুশ্রী সেই নয়ন-সুভগা কি নটিমুখ্যা মাধবিকা নয়?"

না, না, না।

দুটি সুচারু হস্তে মুখ ঢাকলেন কালিদাস।

গভীর রাত্রি। আনন্দে নিদ্রাহীন কালিদাস অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন। হিমেল হাওয়ায় বিক্রমের কক্ষের প্রদীপ নিভে গেল। বিক্রম ঘুম ভেঙে ডাকলেন,—"কঞ্চুকী? প্রহরী? কে আছ?"

"কুমার, আমি আছি। আমি মাতৃগুপ্ত।"

"এস।"

কক্ষে প্রবেশ করে দীপাধারের দীপ জ্বালিয়ে দিলেন তিনি। বিক্রম নিদ্রাজড়িত স্বরে প্রশ্ন করলেন—"ঘুমোও নি কবি? এখন কত রাত?"

"আর দেড় প্রহর রাত্রি বাকি।"

বিক্রম সহসা উঠে বসলেন।

"কি করে বুঝলে?"

"আকাশ দেখে।"

"সে কি? তুমি কি ঘুমোও না রাত্রে? নবহিমজর্জর শীতের এই নিশীথে কি কর তুমি?"

"কাব্য লিখি।"

"শোনাও তবে।"

"কাল শোনাব, কুমার।"

কালিদাস নিজেকে শাসন করলেন। বন্ধুকৃত্য আমাকে করতেই হবে। মনে মনে স্থির করলেন চন্দ্রগুপ্তের স্মরণ সীমায় জাগিয়ে তুলতে হবে হরশিরশ্চন্দ্রধৌত উজ্জয়িনীর হর্ম্যরাজি। আর তারি মধ্যে শিপ্রানদীতীরে শঙ্খ চক্র আঁকা প্রিয়ার ভবনখানি। অলকা নয়, উজ্জয়িনীকেই এঁকে চললেন তিনি 'উত্তর মেঘে'। এক বেণীধরা যক্ষবধূ নয়—বিরহবিশীর্ণা মহাকালবধূ মাধবীকে।

উজ্জয়িনী থেকে পুলকিতা মাধবী কবিকে সানন্দ সম্ভাষণ জানাল,—

কবি,

উত্তর মেঘেই তোমার কাব্যলোকের অমরাবতী—পূর্বমেঘ সেই বাঞ্ছিত ত্রিদিবে যাবার মরকত সোপান মাত্র। তোমার কাব্যপাঠে যে বিরহিণী কাব্যধারাও জলদাগমে বিপুলা হয়ে উঠল। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। লেখা হচ্ছে পবনদূত, হংসদূত, পিকদূত, চন্দ্রদূত, নেমীদূত—কত আর নাম করব?"

কবির ছন্দে চন্দ্রগুপ্তের মনেও ভেসে উঠল সেই সুখস্মৃতি।

"চল, চল ফিরে চল, সেই স্বপ্নে, সেই সুখের স্বর্গে, সেই নিত্য জ্যোৎস্না, নিত্য চন্দ্রালোকে, নিত্যকলাপ বিস্তার করে ময়ূরী যেখানে নৃত্যপরা।"

কালিদাসের উপর অভিমান করে বললেন,—

"মাতৃগুপ্ত, কূটনীতিতে তুমি দক্ষ নও।"

"কেন কুমার?"

"তাহলে এমন কৌশল করছ না কেন যাতে ফেরবার আয়োজন হতে পারে?"

"কুমার, সত্যই কি আপনি ফিরতে চান?"

"কি বলছ মন্ত্রী মাতৃগুপ্ত ?"

"তাহলে বলি শোন, এখন পাটলীপুত্রে প্রচণ্ড অসন্তোষ চলেছে। রামগুপ্ত ও মহিষী জয়স্বামিনী এমন এক চক্রান্ত ঘনিয়ে তুলেছেন যার থেকে মুক্তিলাভ দুরূহ। সব থেকে বিপদ সম্রাট এখন অসুস্থ। এর মধ্যে ভিষক শ্রুতসেন নিদারুণ কলহ বাঁধিয়ে তুলেছেন ধন্বন্তরির সঙ্গে। কারণ ধন্বন্তরি কুমার চন্দ্রগুপ্তের হিতাভিলাষী। একটি উপদলে আছেন মহামাত্য ভাস্করগুপ্ত, বলাধিকৃত দেবগুপ্ত, মহাদণ্ডনায়ক রুদ্রধর, প্রাক্তন মহাসন্ধিবিগ্রহিক হরিষেণ ও পাটলীপুত্রের মহাপ্রতিহার রুদ্রভূতি। এঁরা কার পক্ষ অবলম্বন করবেন বোঝা যাচ্ছে না। তবে রুদ্রধরের কন্যা ধ্রুবাদেবীর পাণিগ্রহণ করলে এই সমগ্র দলটি তোমার পক্ষে চলে আসবে তাতে সন্দেহ নেই।

পট্টমহাদেবী দত্তদেবীর ভরসাস্থল বজ্রগুপ্তকে বসন্তমঞ্জরী আচ্ছন্ন করে আছেন এক বৌদ্ধ উপদলের সহায়তায়। এঁরাও ঠিক রামগুপ্তের পক্ষভুক্ত নন। তবে দেশে একটা প্রচণ্ড নৈরাজ্য দেখা দিক এটা তাঁদেরও ইচ্ছা। রামগুপ্ত যদি কিছুদিন রাজত্ব করেন তবে সহজেই প্রজাবিদ্রোহ ঘটবে। আর তখন······"

"তখন ?"

"তখনি বৌদ্ধরা নেতৃত্ব লাভ করবে এবং তাদের কাঙ্ক্ষিত কাউকে রাজপদে অভিষিক্ত করবে। কিন্তু সে তুমি নও সখা। কারণ তুমি বৈষ্ণব।"

"আর তুমি শৈব। শৈব ও বৈষ্ণবে যদি বন্ধুত্ব হতে পারে, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবে হবে না কেন? তবে থাক সে কথা। এত ব্যাপারের কিছুই আমি জানতাম না। তুমি কেন আমাকে এতদিন বল নি ?"

"মনে আছে, সম্রাট লিখেছিলেন এক অনামা বৌদ্ধ লেখক তোমার ও মাধবীর গুপ্ত প্রণয় সম্বন্ধে তাঁকে গূঢ়লিপি পাঠিয়েছিল ? সে বিষয়ে তথ্য সন্ধান করতে গিয়েই এত সংবাদ সংগ্রহ হয়েছে।

আগে বলে তোমাকে উদ্বিগ্ন করিনি মাত্র। সময় হলে সবই জানাতাম।"

"তাহলে সময় হয়েছে?"

"হয়েছে। এইমাত্র সংবাদ পেলাম হরিপর্বতে শারিকাদেবী ও যক্ষ অট্টের মন্দিরে বেতাল ভট্ট এসেছেন। নিশাচর বেতাল এখানে কেন? সন্ধানে জানলাম একটি শৈব উপদল সে গঠন করছে। সে দলটি বৌদ্ধ ক্ষপণকের মহাযান দলে প্রয়োজন হলে যোগ দেবে। আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী এইভাবে দল সৃষ্টি হলে তুমি যা বলেছ তার কতকটা অর্থাৎ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব দল নয়, তবে শৈব দলে বন্ধুত্ব হবে। তখন পরম ভট্টারক পরম বৈষ্ণব মহারাজ কুমার বিক্রমাদিত্যকেও ক্ষপণক শঙ্কু ও বেতাল ভট্টের নির্দেশ মেনে চলতে হবে।"

"ক্ষপণক ও শঙ্কু কি আমার বিরোধী মাতৃগুপ্ত?"

"না কুমার। ওরা প্রাধান্য চায় কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। তুমি তাদের শিখণ্ডী স্বরূপ থাকবে। আর শক্তি দেখালে তুমি ওদের বশীভূত থাকবে। তা ভিন্ন……"

"তা ভিন্ন কি মন্ত্রী?"

কালিদাস একটুখানি ম্লান হাসি হাসলেন। উত্তর দিলেন না। নিজের প্রসঙ্গ তুলে তূর্যনাদ করতে আজো তাঁর লজ্জা হয়। ততখানি কূটনীতিজ্ঞ তিনি আজো হন নি। আজো মনে সদসৎ বিচার-রেখাটি ধূসর হয়ে যায় নি। কিন্তু তীক্ষ্ণধী চন্দ্রগুপ্তের বুঝতে বাকি থাকে না।

"তা ভিন্ন তোমার প্রতি অন্ধ ঈর্ষা—কি বল? তুমি মন্ত্রী হয়েছ। তদুপরি দেশে বিদেশে কবি নামে তোমার খ্যাতি।"

"অখ্যাতিও বড় কম নেই। দিঙনাগের মত কর্ণাট রাজমহিষীও সেদিন পত্র লিখেছেন।"

"কি রকম? কি রকম? বৈদর্ভী রীতি স্বয়ং তোমাকে যেখানে বরণ করেছেন বিদর্ভ কুমারী সেখানে কি বলেন?"

"বিতস্তার সেতু-নির্মাণ-উৎসবে তিনি এসেছিলেন। মহিলা-কবি

বলে রাজা প্রবরসেন তাঁর সঙ্গে কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে আমার নাম করেন। তাতে তিনি বলে ওঠেন,—"জগতে তিনজন মাত্র কবি আবির্ভূত হয়েছেন—নলিনীতে—পুলিনে ও বল্মীকে।"

"অর্থ?" বিক্রমাদিত্য উৎসুক হন।

"এটা বুঝলে না?"

"না। বুঝিয়ে দাও।"

"প্রথম কবি যিনি মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদের রচয়িতা। তাঁর জন্ম হয় ব্রহ্মার নাভিকমলে অর্থাৎ নলিনীতে। দ্বিতীয় বেদব্যাস যাঁর জন্ম হ্রদে ঘেরা দ্বীপে অর্থাৎ পুলিনে। আর তৃতীয় যিনি বল্মীকে জন্মান তিনি বাল্মীকি। এঁরাই তিনজন ত্রিভুবনের হিতাহিত উপদেষ্টা। আর বাকি যে সব অর্বাচীন গদ্য পদ্য রচনা করেন কর্ণাট-রাজপ্রিয়া তাঁর বামচরণের পদাঘাত দেন তাঁদের মস্তকে।"

"হাঃ হাঃ হাঃ," বিক্রমাদিত্য উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন,—"বল কি সখা? কবিদের মস্তক তো অশোক বৃক্ষ নয় যে তার বাম পায়ের পদাঘাতেই মঞ্জরিত হয়ে উঠবে। আশ্চর্য পাণ্ডিত্য-গর্বিতা এই রমণী।"

"কিন্তু সখা ক্রোধ কোর না। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাতে অসম্মত হলেও আমি তাঁকে আমার সমগ্র কাব্যাবলী পাঠিয়ে দেই। অতঃপর কাব্যপাঠান্তে তিনি আমাকে গত কাল ডেকে পাঠান। রত্নসিংহাসনে বসিয়ে তাঁর বক্তব্যটিই নতুন অন্বয় করে বলেন কর্ণাট-রাজপ্রিয়া সেই অর্বাচীনদেরই বাম চরণ মস্তকে ধারণ করেন।"

"সাধু, সাধু। আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য তো!" বিক্রম উঠে বসেন সোল্লাসে।

"আশ্চর্য রমণী। আজকে একটি লিপি পাঠিয়ে প্রশ্ন করেছেন,—মেঘদূতের মেঘ যদি রাম-গিরি থেকে উত্তরে অলকায় গিয়ে থাকে তবে লঙ্কাপ্রত্যাগত রাম সীতার পুষ্পক রথ যে পথে অযোধ্যায় গিয়েছিল সেই সেই পথে গেল না কেন? কেনই বা ভরদ্বাজাশ্রম, গঙ্গা যমুনা সঙ্গম, অযোধ্যাপুরী বর্ণিত হয় নি?"

"সত্যিই তো। আমি তো এটি লক্ষ্য করি নি। আপন চিন্তায় মগ্ন আছি কিনা। এ বর্ণনাগুলি মেঘদূতে কেন করনি কবি? তাহলে ব্যাস-বাল্মীকির মতই তুমি শ্রুতকীর্ত্তি হতে।"

"কুমার, এখনি আদি কবিদ্বয়কে অতিক্রম করে যাব এমন স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবে ইচ্ছা রইল; যদি কোনদিন সরস্বতী অনুকূলা হন এই পথবৃত্তান্ত লিখব।"

"মহিষীকে কি লিখবে?"

"সেই কথাই লিখব। তাছাড়াও আর একটি উত্তর আছে।"

"কি?"

"প্রেমের পথই কুটিল।"

বিক্রমাদিত্য উচ্চহাস্য করে উঠলেন। তারপর বললেন,—"না, কবি তা নয়। বিদিশা, দশার্ণ, উজ্জয়িনী তাহলে তুমি আঁকতে কি করে? মেখলাকন্যকা নর্মদার রূপও বর্ণিত হোত না।"

"তাই বটে। সখা, সত্য বল—উজ্জয়িনীর তুল্য নগরী কি আছে? আছে কি অবন্তীপুরীর মত রাজ্য? কোথায় আছে সাধ্বী নারীর অন্তরের মত নির্মল প্রসন্নতোয়া গম্ভীরা নদী? কোথায় আছে কাল-প্রিয়নাথ আমার মহাকালের মত ইষ্ট দেবতা? ভয়ঙ্কর যিনি ভৈরব—কালেশ্বর যিনি মহাকাল—প্রেমিক যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর—নটেশ্বর যিনি নটরাজ। তাণ্ডবের তালে ধরে আছেন জীবন মৃত্যু।"

"তাহলে সেই মহাকাল-বনে ফেরবার উদ্যোগ কি করছ?"

"করছি। চেষ্টা করছি। রাজা প্রবরসেনকে বুঝিয়েছি। তাঁর লেখা সেতুবন্ধ কাব্য সংশোধন করাও শেষ করেছি। আর প্রতিমাসে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ের আবশ্যক কি? মন্ত্রী মাতৃগুপ্তকে এবার বিদায় দিন। স্থির হয়েছে বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভেই আমরা বিদায় নেব। তিনি সম্মত হয়েছেন। তা ভিন্ন তাঁর সঙ্গে এ কথাও হয়েছে শৈব সম্প্রদায় ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় এক যোগে কাজ করবে। উভয় দল উভয় দলকে সমান করে চলবে। যেখানে যেখানে শৈব কেন্দ্র আছে সেখানে

সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে বৈষ্ণব কেন্দ্র। আমাদের জ্ঞাপক ধ্বনি হবে 'হরি-হর'। ক্ষপণক যেমন বৌদ্ধ উপদল সৃষ্টি করেছেন মহাযানীদের নিয়ে অমরসিংহও তেমনি হীনযানীদের নিয়ে একটি দল গঠন করবেন। বোধিরুচি, বুদ্ধভদ্র, উপাসিকা জিনরক্ষিতা এরা সবাই ন্যায়গামী ভদ্রব্যক্তি, এঁরা অমরসিংহের সহযোগিতা করবেন। ধন্বন্তরী, বরাহ, বররুচি এঁরাও কুমারের প্রতি অনুরক্ত। এমন কি শৈব উপদলের একটি অংশ যারা বেতালভট্টকে নেতা বলে মানে তারাও কুমারকে শ্রদ্ধা করে। তান্ত্রিক বেতাল বরং কুমার চন্দ্রগুপ্তের অনুগামী হবে তবু বৌদ্ধ ক্ষপণক বা শৈব শঙ্কুকে নেতা বলে বিবেচনা করবে না।"

"বুঝলাম।" বিক্রমাদিত্য বললেন অধো-আননে।

ছয়

প্রথম বসন্তের এক উষ্ণ মধুর দিনে চন্দ্রগুপ্ত ও কালিদাস পাটলীপুত্র যাত্রা করলেন। সারদারু, বেণুবন, বল্লী, বল্ক, ওষধী, বিষ, ফল্গুবর্গ দেখতে দেখতে তাঁরা চললেন। যৌধেয় রাজ্যে পৌঁছেই সাক্ষাৎ হোল গুল্মাধ্যক্ষ ত্রিবিক্রমের সঙ্গে। প্রথম সংবাদ তাঁর কাছেই পাওয়া গেল মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের জীবন সঙ্কট এবং মহিষী জয়স্বামিনী নিয়ে নিয়েছেন রত্ন-প্রকোষ্ঠের চাবি। দ্রু· অশ্ব চালনা করেও গঙ্গাযমুনা সঙ্গমে পৌঁছতে সাতদিন লেগে গেল চন্দ্রগুপ্ত ও কালিদাসের। সেখানে নাবধ্যক্ষ ইন্দ্রগুপ্তের নির্দেশে তরিক বীটপাল অপেক্ষা করছিল।

চন্দ্রগুপ্ত এসে খেয়াপারের সন্ধান করতেই সে কুম্ভকারের ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হোল। সঙ্কেতে বুঝিয়ে দিল তিন সপ্তাহ হোল মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তিরোধান করেছেন।

সিনিবালী রজনী। অশ্লেষা নক্ষত্র। নিদারুণ সংবাদ। অশ্রু-মোচন করতে করতে বীটপাল বলছিল,—

"মহারাজ রামগুপ্ত নগর অধিকার করেছেন। বিট রুচিপতি হয়েছে তাঁর মহামন্ত্রী থেকে মহাবলাধিকৃত সবই। দিবারাত্র দুজনে ধান্যরস পান করছেন। অমাত্যবর্গের অনেকেই তাই বারাণসী যাত্রা করেছেন। তাঁরা বলে গেছেন যে মস্তক আর্য্যপট্টের কাছে নত হয়েছিল তা রজকীপুত্রের কাছে নত হবে না। পরমভট্টারিকা দত্ত দেবীর অঙ্গের সমস্ত অলঙ্কার এমন কি ক্ষৌমবস্ত্রাদি পর্য্যন্ত নরাধম রামগুপ্ত নিয়ে নিতে লজ্জা বোধ করেন নি। তিনি এখন শ্মশানে এক জীর্ণ শিবমন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন। হায়, শ্রীগুপ্তের বংশের আজ কি পরিণতি। হায় মহারাজ ঘটকচ্ছগুপ্ত, হায় মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, হায় লিচ্ছবিদুহিতা কুমারী দেবী, তোমরা কি স্বর্গ থেকে দেখছ না?"

কালিদাস কালো জলের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন অদৃষ্টের কি এই রূপ? এই কালো জলের মত? তাঁর চোখ জলে ভরে উঠছিল সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের স্মরণে। কতকটা জল হাতে তুলে নিয়ে মনে মনেই তর্পণ করলেন—'হে রাজন, তুমি গর্ব কর নি—দানে, উপহারে দ্বিধা কর নি, সকলকে সুফল দিয়ে গেছ। বর্ষার মেঘ যেমন জলধারা দেয় নিঃশব্দে কিন্তু প্রাচুর্য্য আনে পৃথিবীতে—তেমনি তুমি শুধু দিয়েই গেছ সবার অলক্ষ্যে। তোমার অনুগ্রহ যখন বুঝেছি তুমি তখন কোথায়?"

মুহ্যমান হয়েও চন্দ্রগুপ্ত বুঝলেন আর কালক্ষেপ করা সমীচীন হবে না। জননী দত্তদেবীর একমাত্র ভরসা যে তিনি। মুখে বললেন,—"বীটপাল, কতক্ষণে পাটলীপুত্রে পৌঁছতে পারব?"

"রাত্রির মধ্যযামে ভাঁটা শেষ হলে আমরা যাত্রা করব। প্রত্যূষেই আপনাকে পৌঁছে দেব কুমার।"

ঝুপ করে একটা শব্দ হোল নদীর জলে।

"কে যায়?"

"হরিহর।"

"হরিহর।"

কালিদাস অভয় দিলেন।

"আমি মকর।"

"মকর?" চন্দ্রগুপ্ত বিস্মিত হলেন। জননীর এই প্রিয় অনুচরটিকে তিনি স্নেহ করতেন।

"উজ্জয়িনী থেকে আসছ? না পাটলীপুত্র থেকে? সংবাদ কি?"

"আজ্ঞে উজ্জয়িনী থেকে পাটলীপুত্র হয়ে আসছি। সংবাদ ভাল নয়। ভট্টারক রামগুপ্তের অত্যাচারে পাটলীপুত্রবাসী জর্জরিত। তাঁর বিরুদ্ধে অমাত্যবর্গ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পাটলীপুত্রীক পৌরসঙ্ঘ ও মাগধজানপদসঙ্ঘ কুমার রামগুপ্তকে চায় না। পরম ভট্টারিকা দত্তদেবী আমাকে বললেন—কুমার যেন এখনি সৈন্যবাহিনী নিয়ে ধ্রুবাদেবীর উদ্ধারে যাত্রা করেন।"

"উদ্ধারে? সৈন্যবাহিনী?"

"আজ্ঞে সেই সংবাদই দিতে এলাম। মহামন্ত্রী জীবগুপ্তের নির্দেশ এখুনি এসে পড়বে। সৈন্যবাহিনীর একটি দল এসে গেছে। কাল প্রত্যূষে আমাদের যুদ্ধ।"

সমস্ত রাত্রি ধরে আয়োজন চলল। অতি প্রত্যূষে সন্দংশের মত নৌবাহিনী ও স্থলবাহিনী দু-দিক দিয়ে ঘিরে ধরল পাটলীপুত্র নগরীকে। পণ্যবীথিকাগুলি দ্রুত দ্বার রুদ্ধ করে দিল। পথে পথে মুক্ত কৃপাণ হস্তে ঘুরে বেড়াতে লাগল সৈন্যগণ। সব থেকে অধিক সংগ্রাম চলেছিল ঐন্দ্রীদ্বারে। কিন্তু মকরের অসীম নৈপুণ্যে সেখানেও রামগুপ্তের সৈন্যগণ পরাস্ত হোল

উজ্জ্বল কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত সভামণ্ডপের ন্যায় সমুদ্রগৃহ। সভাকুট্টিমের এক পাশে শুভ্র মর্মরের বেদী। তার উপরে মণিমুক্তা খচিত সিংহাসন। সভাগৃহের বাইরে সশস্ত্র প্রতিহার ও ভেতরে মূক বধির অন্তঃপাল। কুমার চন্দ্রগুপ্ত প্রাসাদে প্রবেশ করতেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রহরীদের সমুত্থিত কণ্ঠে জয় ঘোষণা করল—

"পরমভট্টারক কুমার চন্দ্রগুপ্তের জয় হোক!"

তখন সেখানে দ্বাদশ প্রধানের গোপন মন্ত্রণাসভা বসল। শুক্লকেশ হরিষেণ, দীর্ঘশ্মশ্রু রবিগুপ্ত, নগর প্রধান ইন্দ্রদ্যুতি, নগরশ্রেষ্ঠী জয়নাগ, মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত, মহাবলাধিকৃত হলায়ুধবর্মা, মহাসান্ধিবিগ্রহিক নৃসিংহগুপ্ত, পৌরসঙ্ঘের অধিনায়ক জয়কেশী, পরমভট্টারিকা দত্তদেবী একে একে এলেন। কুমার চন্দ্রগুপ্তের একপাশে কালিদাস অন্যপাশে বররুচি। বররুচি পাটলীপুত্রের অধিবাসী। পূর্বাহ্নে খবর পেয়ে তিনি নদীপুলিনে কুমারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সবাই একে একে আসন গ্রহণ করলেন। চন্দ্রগুপ্ত বললেন,—

"মণ্ডলেশ্বরগণ, আপনারা এবার রাজ্যশাসক নির্বাচন করুন।"

জীবগুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন। উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চক্ষু, চঞ্চু নাসা, চাপা ঠোঁটে দৃঢ় প্রত্যয়। তিনি বললেন,—

"আমি সকলের পক্ষ থেকে কুমার চন্দ্রগুপ্তকে নির্বাচন করতে চাই রাজপদে। বৃদ্ধ রাজা রজকীকন্যার মোহে ভুলে রামগুপ্তকে রাজপদে নির্বাচন করে এক ভূর্জপত্রে প্রতিজ্ঞা স্বাক্ষর করে গিয়েছিলেন বটে এবং সেই অনুসারে কুমার রামগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন বটে কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যেই তিনি দেখিয়েছেন যে গরুড়ধ্বজ ধারণের কোন যোগ্যতাই তাঁর নেই। বর্তমানে যে নৈরাজ্য চলেছে এ তাঁরই শাসনের ফল। দত্তদেবীসুত কুমার ভর্তৃহরি এবং কুমার চন্দ্রগুপ্ত দুজনেই আর্য্যপট্টের যোগ্য ব্যক্তি। কিন্তু যেহেতু কুমার ভর্তৃহরি বিন্ধ্য পর্বতে তপস্যায় জীবন কাটাবেন স্থির করেছেন সেহেতু কুমার চন্দ্রগুপ্তই এ ক্ষেত্রে একমাত্র যোগ্যতম রাজ্যশাসক।"

এই বলে তিনি তাঁর তরবারি কুমার চন্দ্রগুপ্তের পদতলে রেখে দিলেন। একে একে সকলেই তাঁদের তরবারি কুমার চন্দ্রগুপ্তের পদতলে সমর্পণ করলেন।—চন্দ্রগুপ্ত সেগুলি স্পর্শ করলেন।

তাঁর ইঙ্গিতে মকর প্রতিটি তরবারিতে গরুড় চিহ্ন লাগিয়ে দিল। জীবগুপ্ত আবার উঠে দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলেন,—"আপনারা নিজ নিজ তরবারি গ্রহণ করুন। যে রাজদণ্ড সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত দৃঢ় মুষ্টিতে

ধারণ করতেন সে মুষ্টি শিথিল হয়ে পড়ছে এ বুঝতে শকদের বিলম্ব হয় নি। মনে রাখবেন, মথুরায় কণিষ্কের বংশধরেরা আজো পরাক্রমশালী। মথুরা থেকে দ্বারকার মধ্যে সৌরসেন, মালব, লাট ও সৌরাষ্ট্র তাঁরা অধিকার করেছেন। তিন দিক থেকে গুপ্তরাজ্য আক্রান্ত হয়েছে রামগুপ্তের রাজ্যকালে। রামগুপ্তের সেনাপতি নয়নাগ নর্তকী চন্দনার ভ্রাতা। তিনি বীণাবাদক, কিন্তু অসিধারক নন। এতএব বিনা বাধায় শক সৈন্য দক্ষিণে কৌশাম্বী, উত্তরে কান্যকুব্জ অধিকার করে প্রয়াগ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। শকদের নিষ্ঠুর অত্যাচার ভারতবাসী ভোলে নি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের নগরে নগরে আর্তকণ্ঠ ধ্বনিত হচ্ছে। শত শত আয়ুক্তক, উপরিক নিত্য সাহায্যের জন্য দ্রুত অশ্বগামী দূতকে পাঠাচ্ছে। কিন্তু মহারাজ রামগুপ্ত ও মহামন্ত্রী রুচিপতি সতত উদ্যান বিহারে রত। নূতন বলাধিকৃত নয়নাগ অদৃশ্য। সীমান্ত রক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই। তদুপরি পদসেবার জন্য ধ্রুবা দেবীকে তাঁরা মথুরা পাঠাতে আদেশ করেছেন। এ অপমান অসহ্য। যে শকরাজ মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের সময় হাত জোড় করে রাজ সভায় দাঁড়িয়ে থাকত……”

এমন সময় দূত প্রবেশ করে অভিবাদন করল,—“শক সেনা প্রতিষ্ঠান দুর্গ অধিকার করেছে। প্রয়াগে ও কৌশাম্বীতে দুই রণক্ষেত্রে তারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত।”

চন্দ্রগুপ্ত তাকালেন হলায়ুধ বর্মার দিকে। ইঙ্গিত বুঝে হলায়ুধ বর্মা বললেন—“আমরাও প্রস্তুত। এক সহস্র রণহস্তী, পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী ও দুই লক্ষ পদাতিক সম্পূর্ণ তৈরী আছে। নৌবাহিনীতে আছে দ্বিসহস্র তরিক।”

চন্দ্রগুপ্ত বললেন,—“না হলায়ুধ, যুদ্ধ নয়। দ্বিমুখী সংগ্রাম চালানো রাজ্যের এই অবস্থায় কঠিন। নরক্ষয় না করে কৌশলে কাজ উদ্ধার করতে হবে। তবে সৈন্যবাহিনী সর্বদাই প্রস্তুত রাখতে হবে। পঞ্চশত শিবিকায় ধ্রুবাদেবী ও তাঁর সঙ্গিনীরা যাবেন।”

"ধ্রুবাদেবী যাবেন শক শিবিরে ?" জীবগুপ্তের মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো।

"নয় কেন ? আপনাদের মহারাজ রামগুপ্ত তো সেই আদেশই দিয়েছেন। শকরাজের কাছেও সে সংবাদ পৌঁছে গেছে। তাই তিনি অপেক্ষা করছেন। নয় তো পাটলীপুত্র এখনি আক্রান্ত হোত। এবং-যদি-ধ্রুবাদেবীকে—সমর্পণ করে—পাটলীপুত্র রক্ষা হয়···" টেনে টেনে শেষ বাক্যটি বলছিলেন চন্দ্রগুপ্ত।

শুক্লকেশ হরিষেণ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। কিন্তু এখন কি শ্লেষ করার সময় ? সত্য করে বলুন, ধ্রুবা দেবী যাবেন ?"

চন্দ্রগুপ্ত মধুর হাসলেন—"না। তাঁর পরিবর্তে রমণীর বেশে সজ্জিত হয়ে যাব আমরা। আমি, নৃসিংহগুপ্ত হলায়ুধ—মগধের বীরবৃন্দ। মহামাত্য, একদা আপনি কূটনীতিতে দক্ষ ছিলেন। এ কৌশলের ব্যাখ্যার প্রয়োজন আপনার কাছে অন্ততঃ হওয়া উচিত ছিল না।"

হরিষেণ বললেন—"বিপদে আমার মাথা ঠিক নেই। বৃদ্ধও হয়ে পড়েছি। অবসর দিন আমাকে কুমার। শেষ ক'টা দিন বারাণসীতেই কাটাব।"

চন্দ্রগুপ্ত হাসলেন—"সে কি কথা ? এখনো যুদ্ধ শেষ হয় নি। শকেরা এখন রাজধানীর অনতিদূরে অপেক্ষা করছে। এই বিপদে আপনি আমাদের ত্যাগ করে চলে যাবেন ? বররুচি, তুমি থাকবে পট্টমহাদেবীর দায়িত্ব নিয়ে। আর কালিদাস ? তুমি চলে যাবে উজ্জয়িনীতে। সেখানের সব দায়িত্ব তোমার।"

কালিদাস তখুনি উঠতে চাইছিলেন, বিক্রম বাধা দিলেন,—

"অপেক্ষা কর, তোমাকে আরো নির্দেশ দেবার আছে। কারণ এখন থেকে উজ্জয়িনী হবে আমার রাজধানী—পাটলীপুত্র নয়।"

"পাটলীপুত্র নয়?" সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হোল বিস্ময়।

"না। রাজধানী এ ভাবে শত্রুহস্তে বারংবার অধ্যুষিত হওয়া লজ্জার। কুশান ও শকদের কাছ থেকে তা দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের প্রচেষ্টা হবে কলিঙ্গ ও দাক্ষিণাত্যকে মিত্র করা। লাট, ভাকাটক, কাদম্ব, গঙ্গ পল্লব, পাণ্ড্য এদের মৈত্রী বন্ধনে যুক্ত করতে হবে। তাহলে আমাদের দুই সীমান্তে আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না।"

সেই রাত্রেই দূতবেশী মকর শকশিবিরে সংবাদ দিল গৃহযুদ্ধে বিড়ম্বিত মগধের ধ্রুবাদেবী পঞ্চশত সখী পরিবৃতা হয়ে শকরাজকে পরিচর্য্যা করতে আসছেন। শকরাজ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে একশত শঙ্খ বেজে উঠলো। কালিন্দীর কালো-জল-বিধৌত রক্তাশ্ম-নির্মিত শকপ্রাসাদে মহাসমারোহ। যে গুপ্ত সম্রাটের সম্মুখে ষাহীষাহানুষাহী দেবপুত্র শকরাজ সপ্তম বাসুদেব হাত যোড করে থাকতেন সেই সমুদ্রগুপ্তের পুত্র রামগুপ্ত তাঁর ভাবী পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবীকে মথুরায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন শকরাজের পদসেবার জন্য। এ কি কম উল্লাসের!

মালব ও সৌরাষ্ট্র থেকে অগণিত শক সেনানী মথুরায় এসেছে। সৌরাষ্ট্ররাজ মহাক্ষত্রপ পোরস্বামী রুদ্রসিংহ, মালবরাজ ক্ষত্রপ জয়দাম প্রভৃতি সমবেত হয়েছেন শকজাতি লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের শুভ মুহূর্তটির জন্য। শকরাজ বাসুদেবের সিংহাসনের বাম পার্শ্বে পঞ্চনদ, সৌরসেন, আনর্তের অধিপতিবৃন্দ ও দক্ষিণ পার্শ্বে কুকুর, অশ্মক ও অপরান্ত প্রভৃতি দেশের শক নেতারা সভা উজ্জ্বল করে বসলেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজলক্ষ্মী শক অন্তঃপুরে আছেন এই দৃশ্য নয়ন ভরে দেখবার জন্য।

পথে পথে শক বালকেরা ধনুঃশর নিয়ে গুপ্ত-সম্রাট রামগুপ্তকে ক্রীড়াচ্ছলে বধ করছিল। রাজপথের দু পাশে শকাঙ্গনারা লাজপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে। তোরণে তোরণে মঙ্গল বাদ্য—পথে পথে গন্ধবারি।

এমন সময় এক শকসৈনিক সিংহাসনের কাছে এসে অভিবাদন করে বলল,—

"মহারাজ, পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবী পঞ্চশত সখীসহ মণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন।"

শকরাজ তাঁর লোহিত লোচন তুলে বললেন,—"তাঁকে নিয়ে এস।"

মাগধী দণ্ডধর তখন সভায় প্রবেশ করে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল,—"মহারাজাধিরাজ দেবপুত্র কুষাণপুত্র সাহী-ষাহানুষাহী শ্রীশ্রী সপ্তম বাসুদেবের জয়। মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক পরমভাগবত শ্রীরামগুপ্তের আদেশে পরমেশ্বরী পরমভট্টারিকা পরম বৈষ্ণবী পট্ট-মহাদেবী শ্রীমতী ধ্রুবাদেবী সমুপস্থিত।"

ধ্রুবাদেবী ও তাঁর সঙ্গিনীরা প্রবেশ করলেন।

শকরাজের মনে হোল নববধূর নম্রত্বের কিছু অভাব আছে। মকরকে ডেকে প্রশ্ন করলেন,—

"দূত, পট্টমহাদেবী তো বেশ দীর্ঘাঙ্গী।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ, মগধললনারা বীরাঙ্গনা।"

"বাহু যুগলে কোমলতার কিছু অভাব দেখছি।"

"আজ্ঞে, মগধবধূরা বীরপ্রসূ।"

"তা বটে। এবার অবগুণ্ঠন মোচন করতে বল।"

বধূ সহসা বলে উঠল, "শকরাজের আদেশ শিরোধার্য।" ঘোমটা খুলে দাঁড়িয়ে উঠলেন গুপ্তবংশের পঞ্চশত বীর। হায়, কোথায় ঝলকিত হবে কটাক্ষ—আস্ফালিত হলো তলোয়ার, কোথায় বলয়িত হবে মৃণালভুজ—ঘূর্ণিত হোল বজ্রবাহু, কোথায় কূজিত হবে কোকিলস্বর—গর্জিত হোল রণহুঙ্কার। পরাভূত শকরাজ ও তাঁর দলের অন্যান্য রাজারা কোনক্রমে অন্তঃপুরে পালিয়ে প্রাণ বাঁচালেন।

* * * *

গাঙ্গেয় প্রাসাদের এক স্বস্তিকায় বসেছিলেন কালিদাস। তাঁর

দৃষ্টি উত্তরে নিবদ্ধ। ভূর্জবৃক্ষ ও নমেরুশাখাশোভিত হিমালয়ের কথাই কি তিনি ভাবছিলেন ?

ঐ যে হিমাচল, নিকটে কনখল অঙ্গে নামে তার গঙ্গে
জহ্নু কন্যকা সাগরতনয়ের স্বর্গসোপানের মার্গ
গৌরী ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে দেন ফেনার হাস্যের রঙ্গে
উর্মি মুঠি ধরা শম্ভু জটা জাল যেথায় জ্বলিছে শশাঙ্ক।

বররুচি প্রবেশ করলেন।

"কে ? কাত্যায়ন ? বোস, বোস। পট্টমহাদেবী কেমন আছেন ?"

"কতকটা সুস্থ। পুত্রের কথা ও কলহদীর্ণ সাম্রাজ্যের কথা ভেবে শরীরটাকে পাত করে ফেলেছেন। এখন যদি ধ্রুবা দেবীর সঙ্গে বিবাহটা শান্তিতে হয়ে যায় তবে অন্ততঃ অমাত্যবর্গকে এক রাখা যাবে।"

"ধ্রুবা দেবীর সঙ্গে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ অত্যাবশ্যক এটা বুঝছি। নতুবা আর একটা গৃহ যুদ্ধ বেধে উঠতে পারে।"

"তাহলে তুমিও একমত ? আজকে যখন কুমার তোমার সঙ্গে গঙ্গাবিহারে যাবেন তখন কথাটা একবার বলবে নাকি ?"

"কথাটা মহাদেবী বললেই তো ভাল হয়।"

"হয়। শাস্ত্রানুসারে তিনি এখনো পট্টমহাদেবী ; কারণ রামগুপ্ত বা চন্দ্রগুপ্ত এখনো ধর্ম-বিবাহ করেন নি এবং সে হিসেবে তিনি দ্বাদশ প্রধানের মুখ্যা। মহাদেবী বারংবার বলেছেন। কিন্তু কুমার নিরুত্তর। শুনেছি উজ্জয়িনীর নটিমুখ্যার প্রতি কুমারের কিঞ্চিৎ আসক্তি আছে।"

কালিদাস নীরব রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন,—

"কিঞ্চিৎ নয়, বিলক্ষণ ; আসক্তি নয়, প্রণয়।

"ও, তুমি তো সবই জান। দেখ একবার বলে, রাজত্বটা নিরাপদ করা যায় কি না।"

কালিদাস অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—

"বেশ, বলব।"

"আর একটা কথা। আমার একটা গ্রন্থ……"

"পড়েছি। তোমার বার্ত্তিক সূত্রটি পড়েছি।"

"না, না সেটি নয়। 'উভয়াভিসারিকা' বলে একটি একাংক নাটক লিখেছি। 'চারুমতী', 'মনোবতী' ও 'শতকর্ণীহরণ'—এই তিনটেই অবশ্য গদ্যকাব্য। এগুলোও তুমি দেখ নি। সময় মত দেখো।"

বররুচি গ্রন্থগুলি কালিদাসের হাতে দিলেন। কালিদাস পাতা উল্টোতে উল্টোতে স্মিতহাস্যে প্রশ্ন করলেন,—

"তিন তিনটে গদ্য কাব্য লেখার সময় কখন পেলে হে? আর্য্যা উপকোশা ক্রুদ্ধ হন নি তোমার উপরে?"

কালিদাস একটু রঙ্গ করলেন। বররুচি তাঁর চেয়ে বয়সে অল্প একটু বড়। এজন্য তাঁর স্ত্রীকে তিনি সর্বদাই কিঞ্চিৎ পরিহাস করতেন। কিন্তু বরাহ বয়সে ছোট বলে তিনি বরাহের পত্নীকে ঠাট্টা করতেন না অবশ্য বরাহ সর্বদা ভট্টিনীকে নিয়ে পরিহাস করতো।

বররুচি কালিদাসের কথায় একটু সলজ্জ হাসি হাসলেন। তারপর আসল কথা পাড়লেন—"এবার কুমারকে বলে আমার একটা ব্যবস্থা করে যাও। শুনেছ তো পাটলিপুত্রে আর রাজধানী থাকবে না।"

"তুমি কি চাও?"

"বাল্মীকিতাল গ্রামটিকে ব্রহ্মদেয় করে দাও যদি তো ভাল হয়।"

"বলব।"

"সাধু, সাধু। কালিদাস তুমি শুধু কবিশ্রেষ্ঠ নয় হে, সুহৃত্তম। ঘটকর্পর কি করেছে শুনেছ তো? তোমার মেঘদূতের অনুকরণ করে 'প্রাবৃর্মেঘ' বলে এক কাব্য লিখেছে। কাব্যগুণ কিছু নেই কেবল যমকের কচকচি। কিন্তু মেঘদূত! আহা তুলনা হয় না। বড় ভাল লিখেছ হে। বড় ভাল। কিছু বৈয়াকরণিক ভুল আছে বটে। তবে ও কিছু নয়। নব্যলেখকেরা সবাই তাই করছে। রসসিদ্ধির

জন্য ব্যাকরণ তো তোমরা মান না হে। তা সিংহ বলেন পরে ওটাই চলিত হয়ে যাবে আর্ষপ্রয়োগ বলে।"

"সিংহ?"

"অমর।"

"ও।" কালিদাস হেসে উঠলেন।

"ঘটকর্পরকে বললুম তুমি লাগতে যাও কেন হে কালিদাসের সঙ্গে? ধ্বনিজ্ঞান তো তোমার কিছুমাত্র নেই। কি বলে জান? বলে অলঙ্কার-জ্ঞান তো আছে। তাহলেই হোল। কাব্য কান্তার মত। তাকে আভরণ দিলেই তুষ্টি পাওয়া যায়।"

কালিদাস স্মিত হাসলেন।

"সেই কাহিনীটি শুনিয়ে দিলাম।"

"কোন কাহিনী?

"বাঃ তোমার স্মরণে নেই? সেই যে পাটলীপুত্রের প্রান্তে নন্দিকারণ্যে একদিন ভ্রমণকালে কুমার চন্দ্রগুপ্ত বলেছিলেন 'বল দেখি, সামনের ঐ কাষ্ঠখণ্ডটিকে ললিত কাব্যে কি ভাষায় ব্যক্ত করবে?' ঘটকর্পর তখনি বলে উঠলেন শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে। আর তুমি বলেছিলে······"

"নীরস তরুবর পুরতঃ ভাতি।"

"বাঃ বাঃ বাঃ। কালিদাস তুমি সত্যই ভাই সরস্বতীর বরপুত্র। সর্বশুক্লা চিরদিন তোমার জিহ্বাগ্রে থাকুন। উঠি। মনে রেখ আমার ঐ ব্রহ্মদেয় গ্রামটির কথা।"

বররুচি বিদায় নিলেন।

কালিদাস গঙ্গাবিহারের জন্য উত্তরীয় গায়ে জড়ালেন।

বর্ষার গঙ্গার জল রক্তবর্ণ সর্পিণীর মত লকলক করছে।

কালিদাসের মনে পড়ল বাল্মীকি বলেছিলেন 'মত্তেব প্রমদাগতি।' সত্যিই ভরা বর্ষার নেশায় যেন মত্তা কোন রমণীর মত অরুণলোচনা। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের সমারোহ। উপরে নীচে সর্বত্রই রক্তবর্ণ।

কোথাও কুসুম্ভফুলের মত রক্তিম—কোথাও সিন্দূরের মত অরুণ, কোথাও রুধিরের মত শোণবর্ণ। তারি মাঝে রক্তাক্ত হৃদয়ের মত মেঘচ্ছিন্ন সূর্য।

সহসা কালিদাসের দৃষ্টিকে অবরোধ করে দাঁড়ালো এক কালোছায়া। বিক্রমাদিত্য।

আলোর বিরুদ্ধে ছিলেন বলেই বোধহয় কৃষ্ণবর্ণ দেখাচ্ছিল।

"সখা ?"

"হ্যাঁ, কালিদাস, আমি। উপায় কি বলতে পার ? রজকীকন্যা সর্বদা চক্রান্ত করছেন। রামগুপ্ত নির্বোধ। তা না হলে কবে তাকে রাজ্য দিয়ে আমিও কুমার ভর্তৃহরির মত সাধনা করতে বনে চলে যেতুম। রাজ্য দ্বিধা জর্জর। উত্তরে দক্ষিণে শক ও কুশানগণ প্রবল হচ্ছে। এদিকে ধরবংশ সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ততম বংশ—কুলমর্যাদায় তাঁরা গুপ্তবংশের সমকক্ষ। আবহমান কাল এই ধরবংশ রোহিতাশ্ব দুর্গে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষা করে এসেছে। তাঁদের তুষ্ট করতে গেলে রুদ্রধরসুতা ধ্রুবাদেবীর পাণিগ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হায় মর্ম চায়……

থাক সে কথা। রামচন্দ্রের মত আমাকেও রাজকর্তব্যের কথা সর্বপ্রথম ভাবতে হবে।"

বিক্রমের গলা ধরে এল।

কালিদাস এগিয়ে এসে বন্ধুর হাত দুখানি ধরলেন।

বিক্রম মুখটা ফিরিয়ে নিলেন আত্মসংবরণের জন্য। তারপর কঠিন বিকৃত কণ্ঠে বললেন—"ফাল্গুনমাসে স্বাতীনক্ষত্রস্থিত চন্দ্রে বিবাহ হবে। এই বিবাহউৎসবের সঙ্গে উজ্জয়িনীতে দ্বিতীয় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হবে। কাল প্রাতে তোমার জন্য দ্রুতগামী রথ প্রস্তুত থাকবে।"

"আমি প্রস্তুত।"

কিন্তু কালিদাস্ অন্তরে জানেন তিনি প্রস্তুত নন। বসন্তকালে কুসুম ফুটবে। অলি মধুপান করবে। রবি ঠিক সময়ে মীনরাশিতে

পদার্পণ করবে। কিন্তু মাধবীর গৃহ প্রিয়প্রসাদে পূর্ণ হয়ে উঠবে না। কি বলবেন তিনি তাকে? কোন স্তোকবাক্যে ভোলাবেন? বাতায়ন থেকে দেখলেন দ্বাদশপ্রধান সমুদ্রগৃহে একে একে চলেছেন। মহানায়ক মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত, মহাবলাধিকৃত হলায়ুধ বর্মা, ধ্রুবাদেবীর সহোদব জাপিলীর মহানায়ক জগদ্ধব, পরমভট্টারিকা দত্ত দেবী, নগবাধ্যক্ষ হরিষেণ ঢুকলেন একের পব এক। আজকের সভার কার্য-সূচী মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ।

সাত

এক সন্ধ্যায় কালিদাস গিয়ে পৌছলেন উজ্জয়িনীতে।

শঙ্খ-চক্র-আকা মাধবীব ভবনে।

মণিকুট্টিমে বসে বীণায় তাব বাঁধছিল মাধবী।

কবিকে দেখে তাব আয়ত-নয়ন দুটি মেলে ধবল।

প্রেম, বিশ্বাস, নির্ভবতা।

এ যেন লতাব মত কোন সহৃদয় সহকাবকে জড়াতে চায়।

কালিদাস এক মুহূর্ত থামলেন।

ভাবলেন চলে যাই।

নিষ্ঠুব ব্যাধেব মত ক্রৌঞ্চীকে বিঁধে লাভ কি?

কিন্তু তা হোল না।

শুক্লবসনা মাধবীকে মনে হচ্ছিল তপব্রতা। বিশীর্ণ তনু। চুলগুলি কোনক্রমে এক বেণীতে বদ্ধ। সুন্দব, শুচি, পবিত্র। তাব সেই কাকচক্ষু দীঘিব মত চোখেব দিকে তাকিয়ে কালিদাস একে একে সব কথাই বললেন। ধীবেধীবে মাধবীব চোখেব পাপড়ি নত হয়ে এল। তিনি অধোমুখে তাবগুলি বাঁধতে বাঁধতে শুনতে লাগলেন।

এক সময়ে বলা শেষ হয়ে গেল।

কালিদাস তাকালেন মাধবীর মুখের দিকে। ভেবেছিলেন সেই সে দিনের মত সে উচ্ছ্বসিত কান্নায় আবার লুটিয়ে পড়বে, তিনি বক্ষে তুলে নেবেন। হয়তো মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়বে মণিকুট্টিমে। তিনি শীতল ধারায় ধুইয়ে দেবেন শীতল ললাট।

কিন্তু মাধবী সে সব কিছুই করল না।

তার মুখের রঙ শুধু বদলে গেল। শুভ্র থেকে রক্তিম—রক্তিম থেকে পাংশু। বীণার তারগুলি আবার ঢিলে করে দিল সে। তারপর রেখে এল যথাস্থানে।

কালিদাস উদ্বিগ্ন হলেন।

এর চেয়ে মাধবী যদি উতলা হোত, মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ত, আকুল উচ্ছ্বাসে ক্রন্দন করে উঠতো, সেও যে ভাল হোত। হায়, কালিদাস জানতেন না মেয়েরা একবারই জীবনে কাঁদে—নিঃশেষ করে কাঁদে। তারপর? তারপর বজ্রের মত কঠিন হয়। সে কাঠিন্য পুরুষেরা কল্পনাও করতে পারে না। নারীচরিত্রের সবটুকু বুঝতে কালিদাসেরও কিছু বাকি ছিল। রুদ্ধ আবেগে তিনি বললেন,—

"মাধবী, কথা দাও আমাকে না বলে সহসা কিছু করবে না?"

হঠাৎ জ্বলে ওঠা আগুনের মতো মাধবী ফুঁশিয়ে উঠলো,—

"চঞ্চল হোচ্ছ কেন কবি?"

"তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গের লজ্জা যে আমি রাখতে পারছি নে সখী।"

"রাজকার্যের কাছে প্রতিশ্রুতি!" মাধবী হাসল।

কিন্তু সে হাসি কি হাসি?

কালিদাস মূক হয়ে গেলেন। এক সময়ে ক্লান্ত, পরাজিত কালিদাস বিদায় নিলেন।

উজ্জয়িনীতে বৎসর খানিক ধরে একটির পর একটি সংবাদের ঢেউ এসে আলোড়ন তুলছিল।

খবর এল মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত তিরোধান করেছেন।

খবর এল গুপ্তবংশে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

খবর এল গৃহযুদ্ধান্তে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে ধ্রুবাদেবীর বিবাহ নাটকীয় ভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

চৈত্রমাস ফিরে এল। উজ্জয়িনীতে উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়েছে। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও পট্টমহাদেবী ধ্রুবাদেবীর অভিষেক-উৎসব। চম্পকবন উদ্যানভবনে ফুল, আলো, পুষ্পসারের ছড়াছড়ি। সুবৃহৎ মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছে। একশত দেবনর্তকী তাতে হল্লীষক নৃত্য দেখাবে। বিদুষী বসন্তমঞ্জরী দেখাবেন বলন্তিকা নৃত্য। কিন্তু নটিমুখ্যা? না পাটলীপুত্রের নির্দেশিত সূচীতে তাঁর কোন নাম নেই। মাধবী চুপ করে শুনল। ময়ূরিকা ছুটে এসে বলল—"কি অন্যায়! কি ষড়যন্ত্র! তুমি এখনো চুপ করে আছ?"

"কি করতে বলিস?"

"প্রতিবাদ করতে বলি।"

বিষাক্ত হয়ে গেছে মাধবীর অন্তর। তবু সে গেল একবার রাজখুল্লতাত ইন্দ্রগুপ্তের কাছে। এই বৃদ্ধ একদা স্নেহ করতেন মাধবীকে। মাধবীর প্রতিবাদ তিনি মন দিয়ে শুনলেন। মুখে শুধু বললেন—"স্থির থাক।"

কিসে কি হোল জানেনে। খবর এল,—সম্রাজ্ঞীর সম্মানার্থে মাধবীকে একটি একক নৃত্য দেখাতে হবে।

দেবরাতকে মাধবী বলল—"মৃদঙ্গ ঠিক করো।"

"কি নাচ দেখাবে? মধুবারতি?"

মধুবারতি নাচের একটি ইতিহাস আছে। ঐ নৃত্যটি সাধিকার নৃত্য—লাসিকার নয়। শোনা যায় একমাত্র চারুদেষ্ণা এ নৃত্যটি নাচতে পারতেন। কারণ তিনি জপ, ব্রত, প্রভৃতিতেও দীক্ষিতা ছিলেন। মাধবী একদিন সুখের শিখরে উঠে দেবরাতকে বলেছিলেন —"আমাকে নাচটি শেখাও।" দেবরাত হেসেছিলেন। বলেছিলেন,

—"ও নাচ আমার আজও জানা নেই। একমাত্র আচার্য জানতেন। আর……"

"আর কে জানে ?"

"কামরাজ।"

"কামরাজ কি করে জানল ?"

"ও কি তখন এমন লম্পট ছিল ? ও যখন গুরুর শিষ্য তখন এমন সংযমী ছিল যে দেখলে অবাক হয়ে যেতে হোত। মানুষের কত পরিবর্তনই না হয়।"

মাধবী হাসল—"আমাকে শেখাবে না সে ?"

"বলে দেখব।"

কিন্তু দেবরাতের অপেক্ষা করে নি মাধবী। সেদিন সন্ধ্যায় আরাত্রিকের শেষে কামরাজকে নিজেই নিবেদন করল,—"সৌম্য, মধুরারতি নৃত্য সব নটীদেরই শেষ আকাঙ্ক্ষা।"

"ভদ্রে, সে কথা সত্য।"

"তার ধারা কি লুপ্ত হয়ে যাবে ?"

"কেন এই প্রশ্ন ?"

"আপনি কি এই নৃত্যের যোগ্য পাত্রী কাউকে পান নি ?"

স্মিত হাসলেন কামরাজ। উত্তর দিলেন না।

মাধবী কিন্তু এত অল্পে হতাশ হোল না। পেতে হলে মূল্য দিতে হবে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সবই সাধনার ধন। আবার প্রশ্ন করল—"দিত্বরী কামাক্ষী কেন এ নৃত্যে ব্রতিনী হন নি ?" কামরাজ হাসলেন।

"কিসে আর কিসে ? কোথায় জপনিরতা চারুদেক্ষা—আর কোথায় মদালসা কামাক্ষী।"

"তবে বসন্ত-মঞ্জরী নিশ্চয় এ নৃত্যের যোগ্যা ?"

বঙ্কিম ভুরু তুলে শুধিয়েছিল মাধবী।

কামরাজ হাসলেন।

"না। তার মধ্যে প্রবৃত্তি আছে—নিবৃত্তি কই?"

"তবে কি সৌম্য আমাকে ব্রতিণী করতে পারেন?"

চমকে উঠেছিলেন কামরাজ। গম্ভীর মুখে বলেছিলেন,—"কালম্ কালম্, মহাকালম্।"

এগিয়ে এসে মাধবীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন,— "ভদ্রে, তুমি কি সত্য করে কাউকে ভালবেসেছ?—ভালবেসেছ আত্মা দিয়ে?"

"নিশ্চয়ই।"

কিন্তু মনের মধ্যে সব এলোমেলো হয়ে গেল। সত্যিই কি আমি সব ছেড়ে কুমার চন্দ্রগুপ্তকে ভালবাসি? নাকি শুধুই কামনা?

কিন্তু মাধবীর ইতঃস্তত ভাব কামরাজ লক্ষ্য করেন নি। তিনি প্রশ্ন করলেন,—

"তুমি দুঃখ পেয়েছ কখনো? সত্যকার দুঃখ? যাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে শতধা হয়ে যায়?"

মাধবী সত্যি অবাক হোল—একি অদ্ভুত সব প্রশ্ন? আমার মত সুখী জগতে কে আছে? সদা প্রমদার মত গর্বভরে সে বলেছিল,— "না। আমার মত সৌভাগ্যবতী কে আছে?" তখন কামরাজ বলেছিলেন—"যে শিল্পী প্রেমের আনন্দ ও বেদনা দুইই জানে সেই কেবল এ নৃত্যের যোগ্য। বেদনার অগ্নিশুদ্ধি না হলে মধুরারতি নাচা যায় না।"

"চারুদেষ্ণা কি তার যোগ্যা হয়েছিলেন?"

"হয়েছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে তিনি প্রাণ ঢেলে ভালবেসে-ছিলেন। তারপর......। থাক সে বৃত্তান্ত। ভদ্রে, তোমার নবীন বয়স, নাই বা শুনলে জীবনের অন্ধকার কাহিনী।"

কামরাজ সেদিন চুপ করে গিয়েছিলেন।

মাধবী অনেক অনুনয়েও তাঁকে সম্মত করাতে পারে নি। আবার এই কামরাজই নিজে থেকে এসে শিখিয়ে দিয়ে গেলেন মধুরারতি।

কুমার তখন কাশ্মীরে প্রবাসী। আবার গুরুগৃহে থাকার সময়ের মত তার তপব্রতার জীবন শুরু হয়েছিল। উষা আর মধ্যাহ্নে নাচতে তার ভাল লাগতো। কেন না মন্দির তখন থাকে জনহীন। এ তো নৃত্য নয়—এ যে নিবেদন। পূজা। কিন্তু সন্ধ্যার আরাত্রিকে বহু লোকের সামনে আরাধনায় যেন তৃপ্তি নেই।

লাস্য নৃত্যের মন মাধবীর ধ্বংস হয়ে গেছে। কামরাজ হয় তো তাই লক্ষ্য করেছিলেন।

দেবরাতের কথার উত্তরে কিন্তু মাধবী বলল—"না, ভ্রামরী গতি।"

দেবরাত শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল। এ নাচ একদিন সেই মাধবীকে শিখিয়েছিল। বলেছিল জীবনে যদি কোনদিন প্রত্যাখ্যান পাও তবে এ নাচ নেচো। কিন্তু তাই বলে রাজসভায় অভিষেক উৎসবে মাধবী এ নাচ নাচতে যাবে তা সে স্বপ্নেও ভাবে নি। কিন্তু মাধবীর সঙ্গে তর্ক করে যে কোন লাভ হবে না তা তাঁর জানা ছিল। শুধু মুখে একবার বলল—"পরিণাম ভেবে দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ।"

এসে পড়ল উৎসবের দিন। পথে পথে আলোকাধার—তার শীর্ষে পুষ্পগুচ্ছ। তোরণে তোরণে আতোদ্য বাজছে। শোভাযাত্রা শুরু হোল।

এসেছে সাকেতের পার্বত্য ঘোড়ায় চেপে পার্বত্য অধিবাসী—সমতটের ভল্লধারী সেনা—কুন্তক হাতে চলেছে আভীর—দেশীয় মল্লবৃন্দ। হাতীতে চেপে চলেছেন প্রতিষ্ঠানরাজ, চোলরাজকুমার। অশ্বপৃষ্ঠে গুপ্তবংশীয় রাজপুরুষগণ। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত ও ধ্রুবাদেবী দুটি সুদৃশ্য শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে আবির্ভূত হলেন। পেছনে তাঁদের চতুরঙ্গ বাহিনী।

উৎসবমুখরিত প্রাঙ্গনে মাধবী এল যথা সময়ে। প্রতি

লোমকূপের বেদনাকে জোর করে চেপে রেখে মাধবী ভাণ করছিল সে সহজ, ভারমুক্ত। যবনিকার অন্তরাল থেকেই সে দেখল সম্রাট পট্টমহাদেবীর পাণিগ্রহণ করে বিভিন্ন রাজন্যবর্গের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন।

তাঁর মধুর গম্ভীর কণ্ঠ।

উদাত্ত হাসি।

বরেণ্য দেবতনু।

বিক্রম···বিক্রম···আমার বিক্রম। মাধবীর অন্তরাত্মা চেঁচিয়ে উঠল। না, না, কি বলছি? মহারাজ, পরমভাগবত, পরমভট্টারক, পরমেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত। তিনি সম্রাট। আমি? আমি তাঁর পরিচারিকা মাত্র। ওরে অবোধ মন, আজ থেকে এ কথা তুই স্মরণে রাখবি।

আর যিনি তোর বিক্রমকে চিরকালের জন্য চুরি করেছেন তিনি পরমশ্রদ্ধেয়া সম্রাজ্ঞী।

উৎসব শুরু হোল।

সম্রাজ্ঞীকে একটি সুবৃহৎ চম্পকস্তবক দেবার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যানে, কাননে, প্রাসাদে, রাজপথে ছড়িয়ে দেওয়া হোল সহস্র পিচকারীতে সুগন্ধ বারি। লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে উঠল মন্দিরে, প্রাসাদে, ভবনে, কুটিরে। আকাশে উত্থিত হোল শত শত আলোর ফুলঝুরি। ছড়িয়ে পড়ল লাল তারা, নীল তারা। রাত্রির দ্বিতীয় যামে মাধবীর নাচ।

মন্দ খবর আগেই আসে।

শোনা গেল মহারাজ ও মহাদেবী ততক্ষণ থাকবেন না। চলে যাবেন ভাকাটক রাষ্ট্রদূতের ভবনে। বিদেশী রাজন্যবর্গ সেইখানেই সম্রাটকে সম্বর্ধনা জানাবেন।

বিষের পাত্র এবার পূর্ণ হোল।

মাধবী মনে মনে বলল—"হে মহাকাল, তোমার কাছে পাপ করেছি। আর কত দুঃখ দেবে প্রভু?"

শেষে সে নৃসিংহগুপ্তকে না ডেকে পারল না।

"মহাসান্ধিবিগ্রহিক, আমার নাচ রাত্রির দ্বিতীয় যামে আছে। সম্রাটকে কি সে পর্যন্ত এখানে রাখা একান্ত অসম্ভব?"

নৃসিংহগুপ্ত হাসলেন।

মাধবী বুঝল তিনি ইচ্ছা করলেই সে কাজ সম্ভব করতে পারেন।

"কিন্তু?"

মাধবী বলল,—"আমার একটি লিপি মহারাজকে পৌঁছে দেবেন?"

"লিপি কোথায়?" নৃসিংহগুপ্ত চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন।

মাধবী তখনি মাথার কাঁটা রক্তচন্দনপঙ্কে ডুবিয়ে একটি পত্র লিখে দিল পিপুল পাতায়।

নৃসিংহগুপ্ত ফিরে এলেন না। নেপথ্যে সজ্জাগৃহে একটি বিষাদের ভাব নেমে এল। নর্তকীরা আর সাজ সজ্জায় মন দিচ্ছে না। এমন গুজগুজও শোনা যেতে লাগল—'মাধবিকার জন্যই আমাদের নাচ সম্রাট দেখলেন না।' দেখা গেল অনেক রাজপুরুষই চঞ্চল হয়ে হয়ে উঠেছেন চলে যাবার জন্যে। অথচ এঁরাই মাধবীর সোমপানক উৎসবে কত মধুর কথাই শুনিয়ে গেছেন। হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অর্থাৎ সম্রাটের যাত্রার উদ্যোগ সমাপ্ত। মাধবী কিন্তু নিপুণভাবে বেশ সম্পন্ন করে নিল।

সহসা মহাপ্রতীহার ভানুগুপ্ত মঞ্চের সামনে এসে ঘোষণা করলেন, "সম্রাট ও পট্টমহাদেবী দেবাঙ্গনাদের নৃত্য দেখবার পর ভাকাটক ভবনে যাবেন। জনসঙ্ঘ, আপনারা স্থির হয়ে নৃত্য দেখুন।"

সহসা সব কিছু পরিবর্তিত হয়ে গেল।

নর্তকীরা ছুটে এল সাজসজ্জার শেষটুকু সমাপন করতে। কেউ কাজলকে আরো ঘন করল। কেশের উপর কেউ বা ছড়ালো কেতকী সুবাস। মেখলার গুটিকাগুলিকে সুন্যস্ত করতে লাগল বা কেউ। মুখের উপর শেষ বারের মত শিরীষগুচ্ছ দিয়ে লোধ্ররেণু মাখল মাধবী। তারপর এসে প্রবেশ করল মঞ্চে।

তার ব্যক্তিত্বের প্রভায় জনতার দৃষ্টিকে এক মুহূর্তে আকর্ষণ করে নিল সে। তার নাচটি ছিল এই,—

হে কমল, তুমি মলয়াবতীর সনে
দুলিছ ফিরিছ দিতেছ মধুর রেণু
আমি লাঞ্ছিত ভ্রমরী অন্যমনে
প্রদক্ষিণিয়া বৃথাই বাজাই বেণু।

মাধবী তাব তিক্ত ব্যর্থতার সবটুকু উন্মোচিত করে দিল নাচের অঙ্গহারে। যেখানে কমল ও মলয়সমীরণ প্রেমে ঢল ঢল সেখানে ঈর্ষাপরা ভ্রমরীর বিষাক্ত হাসিটুকুতে সে ফুটিয়ে তুলল নাটকের তীব্র দ্বন্দ্ব। আবাব পরাভূতা ভ্রমরী যেখানে তার বিজয়িনী প্রতিদ্বন্দ্বিনীর সম্মুখে নৃত্য করছে সেখানে তার হতাশা যেন গীতিকবিতার মাধুর্য।

অভিনয় তো অভিনয় নয়। সত্য সত্যই মাধবীর ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা। শুষ্ক কাষ্ঠে স্ফুলিঙ্গের মত অগ্নিবৃষ্টি ঝরছিল। তার নিভৃত প্রেমের চিত্র আজ সকলের সামনে সত্য হয়ে দেখা দিল। চন্দ্রগুপ্তের কুণ্ঠিত মুখে বেদনার রেখা সুস্পষ্ট। থাকতেও তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—উঠে গেলেও সকলকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। সবলে তিনি নিজেকে সংযত রেখে নর্তিনীর অঙ্গহাবের নৈপুণ্য দেখতে লাগলেন।

নাচের বিষাদ রস উৎসবের উল্লোলকে কেমন স্তব্ধ করে দিয়েছিল। মনে হোল যেন নীল আকাশে এক খণ্ড জলভরা মেঘ সহসা এসে সূর্যজ্যোতির খরত্বকে কিছুটা ম্লান করে দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হোল।

নাচ শেষ হবার পরেও তাই নিস্তব্ধ হয়ে রইল সভাতল। তারপর একটি মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। সেইটেই বাড়তে বাড়তে ক্রমে উতরোল সমুদ্র তরঙ্গের মত ফেটে পড়লো—“সাধু, সাধু।”

“উত্তম, উত্তম।”

কিন্তু একটি বিরুদ্ধ মতও উচ্চকিত হোল।

“একি নাচ? এতো বিদ্রোহ। রাজার সম্মুখেই রাজার সমালোচনা।”

মহাবলাধিকৃত হলায়ুধবর্মা, মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত, প্রাক্তন নটিমুখ্যা কামাক্ষী এঁরা মুখর হয়ে উঠলেন বিরূপ মন্তব্যে। অথচ সম্রাট কিছুই বললেন না। তাঁর বিষণ্ণ দৃষ্টি মাধবী নৃত্যের উত্তেজনার মধ্যেও বারে বারে অনুভব করেছে। তাতে ক্রোধ ছিল না—স্নেহ ছিল।

কিন্তু মহামন্ত্রী সজ্জাগৃহে এসে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে মহাপ্রতীহারকে ভর্ৎসনা করে কৈফিয়ৎ দাবী করলেন। মাধবিকা এগিয়ে এসে সবিনয়ে বলল,—

"ভদ্র, নাচের পদকারু কি ভুল হয়েছে?"

"না।"

"মুদ্রা?"

"না।"

"রসপরিবেশন?"

"একটু বেশী হয়েছে।" মহামন্ত্রী ব্যঙ্গ করে উঠলেন।

"ঐ টুকুই শিল্পসৃষ্টি। সে আপনি বুঝবেন না। যাঁরা বোঝবার তাঁরা বুঝেছেন।"

"দর্পিতা, মূঢ়া। তুমি কি বিস্মৃতা হয়েছ যে আমি মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত?"

"আপনিও কি বিস্মৃত হয়েছেন যে আমিও উজ্জয়িনীর নটিমুখ্যা মাধবিকা?"

মহামন্ত্রী হলায়ুধবর্মাকে নিয়ে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে প্রস্থান করলেন। মাধবী কান্নায় ফেটে পড়তে গিয়েও গেল না। সকলের সমক্ষে তা করা মানেই পরাভব স্বীকার করা। "কেন তা করব? আমি তো অপরাধ করি নি। আমি শিল্পী।"···শিল্পী তো শিল্পের মাধ্যমেই তার মনোভাব ব্যঞ্জিত করবে। মহামন্ত্রীও কি কূটনীতির ভেদ-মৈত্রীতে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোভাব?' তবে?

উৎসব শেষের আগেই মাধবী ফিরে এল শিরঃপীড়ার ছল করে। 'ভাকাটক-ভবনে' তারও আমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু না। আর

কত সে স্নায়ুর পীড়ন সইবে? কতবার সে দেখবে তার বিক্রম তার নেই?

নিজ প্রাসাদে ফিরে এসে মাধবী অট্টহাসি হেসে উঠলো। শত রোদনের চেয়েও তা ভয়ঙ্কর। শূন্যপ্রাসাদে ঐকতানের মত শত কণ্ঠে সে হাসি বাজতে বাজতে এক সময় মিলিয়ে গেল। প্রতিধ্বনি। কিন্তু তারপর ভয়ানক শূন্যতা। কেউ কোথাও নেই। সবাই গেছে উৎসবে। আলোক, মাল্য, ভোজ্য, সুরার স্রোত বয়ে যাচ্ছে যেখানে উজ্জয়িনীর নাগরিক নাগরিকার জন্য।

মাধবীব ভবনেও জ্বলছে সহস্র দীপ।

সহস্র কেন?

লক্ষ, লক্ষ দীপ জ্বলুক।

পঞ্চ-প্রদীপ, সপ্ত-প্রদীপ, নব-প্রদীপ। জ্বলে উঠুক দীপবৃক্ষগুলি। ঘৃতের—তৈলেব—কর্পূরেব। জ্বলুক, জ্বলুক, সব জ্বলে যাক। পুঞ্জীভূত জ্বালা আগুনের শিখা হয়ে দীপ্যমান হোক। রক্তাংশুকা মাধবী উন্মাদিনীর মত মশাল হাতে শূন্য প্রাসাদকে আলোকময় করে তুলতে লাগল।

পদধ্বনি।

কাব পদধ্বনি?

কে আসে এই নির্জন নিশীথে ত্যক্ত নটির আলয়ে?

মাধবিকা ভাবল তার মনের ভ্রম সে কি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে?

কিন্তু না।

ঐ তো সোপানমূলে কবি কালিদাস।

"কবি?"

"মাধবী?"

ক্ষোভে মাধবীর দুটি ভুরু বেঁকে গেল। বেদনার পিণ্ডটাকে সবলে কণ্ঠের মধ্যে গিলে ফেলে দাঁতে দাঁত দিয়ে সে বলল,—

"কি সৌভাগ্য, এতকাল পরে মনে পড়ল। কিন্তু, কবি, শেষে মহারাজ তোমাকেই চর করে পাঠালেন?"

"চর? কি বলছ মাধবী? তুমি কি বিদ্রূপ করছ?"

"না, কবি, আমি তো ভেবেছি তুমিই আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করতে এসেছ।"

কালিদাস আহত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন মাধবীর দিকে।

এ মাধবী কি সেই মাধবী

ক্ষোভ, ঈর্ষা, বেদনায় মানুষ এমন বিকৃত হয়ে যায়? কিন্তু মাধবীর বেদনা কি তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করছেন না? তবে? ধীরে ধীরে কালিদাস বললেন,—

"মালিনী, একি তোমার রূপ? অগ্নিশিখার মত তুমি কি প্রলয়-রূপিণী হয়ে উঠেছ?"

মাধবী তাকিয়ে দেখল তার হাতে জ্বলন্ত মশাল।

হঠাৎ স্মরণ হোল সব কিছু।

মশাল দূরে ছুঁড়ে ফেলে সে মণিকুট্টিমের উপর আছড়ে পড়তে গেল কিন্তু তার পূর্বেই কালিদাস এসে তাকে ধরে ফেলেছে। আর তার হাতের অঞ্জলিতে টপ্ টপ্ করে উষ্ণ অশ্রু ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। জল তো নয় যেন বজ্র ফোঁটা। ফুঁপিয়ে ওঠা মাধবীর পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে কালিদাস বললেন,—

"ভুল কোর না, সখী, ভুল কোর না। পাথরে যদি ঘা মার তবে পাথরের কিছু হবে না, মাধবী। আহত হয়ে শুধু ফিরে আসবে। তার চেয়ে ধৈর্য ধরে পথ সন্ধান কর। দেখ, দুর্গমে স্রোতস্বিনীও এঁকে বেঁকে যায়। তারপর স্রোত যখন বৃদ্ধি পায়, বৃহৎ প্রস্তরগুলিকেও সে অবহেলে ভাসিয়ে নিতে পারে।"

মাধবী চোখ মুছল। "কবি, ও কথা থাক। আর উপদেশ দিও না। উপদেশে হৃদয়-বেদনা শমিত হয় না।"

"সবই মহাকাল পূর্ণ করে দেবেন।"

"আর যতক্ষণ তা না করছেন? ততক্ষণ? না, না, না কবি, জীবনের উৎসব থেকে আমি দীপ নিবিয়ে প্রস্থান কোরব না। জেনে রেখ কবি, ব্যর্থ চোখের জলের তিরস্করিণী রচনা করে চারুদেষ্ণার মত আমি জপনিরতা থাকব না। যৌবনদীপাধারের আলো নিবিয়ে দেব না।"

সোপানে দৃঢ় পদক্ষেপ শোনা গেল।

কে আসে?

মাধবী চকিত হয়ে উঠলো। তারপব বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো, —"মহাসান্ধিবিগ্রহিক? আপনি উৎসবে যান নি?"

মাধবীর প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই নৃসিংহগুপ্ত এগিয়ে এলেন। জিহ্মবীক্ষণে কালিদাসের দিকে তাকিয়ে কতকটা স্বগত ভাবে বললেন, —"কবি দেখছি এখানে। মহারাজ ওদিকে আপনার সন্ধান করছিলেন।"

কালিদাস দেখলেন তার সামনে একটি ক্ষেষ্ঠ লোলপতা কুক্ষিম্ভর ক্ষুধা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু নৃসিংহগুপ্ত বেশী কথাব মানুষ নন। মাধবীর দিকে ফিরে তিনি তৎক্ষণে অভিবাদন করে বলতে শুরু করেছেন,—

"শোভনে, শুনলুম তুমি পীড়িতা। মহারাজ উদ্বিগ্ন হয়ে তাই আমাকে পাঠিয়েছেন।"

কথাটার সততায় সন্দেহ ছিল।

কিন্তু নৃসিংহগুপ্তকে দেখামাত্রই মাধবীর মধ্যে একটা বৈলক্ষণ্য দেখা গেল। স্বৈরিণীসুলভ স্তনপাশ দেখিয়ে ললিত কটাক্ষ করে বিভ্রমনিপুণা নটির মত এমন ভাবে দাঁড়ালো যে কালিদাস বিস্মিত হলেন। তাঁর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না চিত্রশার্দুলের মত ধূর্ত্ত ও ক্ষিপ্র এই ব্যক্তিটির সান্নিধ্যে মাধবী তার শোকোন্মত্ত হৃদয় নিয়ে থাকুক! এখনো যে ক্ষোভে তার ভ্রূ যুগ্ম—অধর থেকে থেকে কেঁপে উঠছে—ধূপায়িত দুঃখ স্বর্গের দিকে উঠছে। কিন্তু সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত

খোঁজ করছেন এ কথার পর আর থাকা চলে না। তা ভিন্ন এ কথাও বুঝলেন নৃসিংহগুপ্ত এখুনি যাবেন না। কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তিনি এসেছেন। কে তাঁকে পাঠাল ? রাজা ? না মহামন্ত্রী ?

নিষ্প্রভ কালিদাস বিদায় নিলেন।

কবি বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে মাধবী অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। বহুবলী, বহুভাষাদক্ষ, কূটনীতি ও রণকৌশলে সমান পারঙ্গম এই মানুষটির সঙ্গে একা থাকতে তার চিত্ত সায় দিচ্ছিল না। এতক্ষণ যেন তার অভিমানক্ষুব্ধচিত্ত তাকে দিয়ে স্বৈরিণীর অভিনয় করাচ্ছিল। নাকি কালিদাসকে ব্যথা দেবার জন্য তার এই ছলনা ? নাকি মহামন্ত্রীর রোষ থেকে রক্ষা পাবার প্রবৃত্তিই তাকে সহসা নৃসিংহগুপ্তের প্রতি আকৃষ্ট করিয়েছিল ? নাকি কামাক্ষীর অভিশাপ এতদিনে ফলল ?

আজ মনে হোল নৃসিংহগুপ্তের পৌরুষে কোথায় একটা আকর্ষণ আছে। কোন অন্ধকার গর্ভ থেকে তার আদিম পৌরুষ মাধবীর অন্তরস্থ আদিম নারীকে সবলে টানতে লাগল। সেই সোমপানক উৎসবের বিদ্যুৎস্পর্শ সহসা চমকে গেলো মনের আকাশে। মাধবী কেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। প্রভিন্ন হস্তীর মত তার মদগন্ধ যেন বাতাসে ভাসছে। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত একটা শিহরণ খেলে গেল তার। সহসা নৃসিংহগুপ্ত প্রকোষ্ঠের নিভৃতে টেনে নিয়ে গেল মাধবীকে। একটা বিশাল প্রস্তর স্তম্ভের তলায় কুসুমের মত পিষ্ট হয়ে যেতে যেতে মাধবী আশ্চর্য্য হয়ে দেখল তার মন বিদ্রোহী হলেও দেহে কি আশ্চর্য্য সঙ্গীত বাজছে। আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন নৃসিংহগুপ্তও। এই পদ্মিনী নারীর মধ্যে বাঘিনীর মত্ততা কোথায় লুকিয়েছিল ?

কিন্তু তিনি অভিজ্ঞ পুরুষ।

বিক্রমের মত প্রথম প্রণয় তাঁর নয়।

মহাসান্ধিবিগ্রহক তিনি। বহু নূতন দেশের সঙ্গে কূট মৈত্রীর

জন্য তাঁর আদান প্রদান, যোগাযোগ। বহূদক তিনি। নারী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও তাঁর বিচিত্র। মাধবীকে তিনি এক নূতন রাজ্যের দ্বার খুলে দিলেন। এতদিন মাধবী ছিল প্রথম-প্রণয়-ভীরু মুগ্ধা নায়িকা। প্রণয়ীজনের পায়ে সে তার হৃদয়ের সমস্ত আবেদনটুকু সমর্পণ করে দিতে চেয়েছিল। নৃসিংহগুপ্ত তাঁকে দীক্ষিতা করে তুললেন প্রগলভা নায়িকায়। এতদিন প্রেম ছিল হৃদয়ের ধন। আজ তা হোল মস্তিষ্কের বস্তু। চিরে চিরে দেখ কে ঐ পুরুষ? শশ, না বৃষ, না অশ্ব?

তুমি কোন নারী—পদ্মিনী, চিত্রিনী না শঙ্খিণী?

পীড়িত চুম্বনে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠেছিল মাধবী। নখরাঘাতে বক্ষে, কণ্ঠে, জঘনে ফুটে উঠেছিল অর্দ্ধচন্দ্র, ব্যাঘ্রনখ। বিক্রমের নখর ছিল গৌড়ের নাগরিকের মত দীর্ঘ তথা চিত্রিত। নৃসিংহগুপ্ত ইচ্ছে করেই দীর্ঘ নখর রাখতেন না। দক্ষিণাপথের লোকদেব মত তাঁর নখ—ক্ষুদ্র কিন্তু শক্ত। কপোল, অধর, চিবুকে দন্তাঘাতে তিনি সৃষ্টি করলেন খণ্ডাভ্রক ও বরাহচর্বিতক। বিক্রম সেখানে মৃদু আঘাতে সৃষ্টি করতেন প্রবালমণি।

কিন্তু কোথায় সেই জলহংসীর মত শীৎকার? নৃসিংহগুপ্ত অঙ্গ বস্ত্রের গোপন থেকে বার করে দেখিয়েছিলেন সেদিনের অশ্বখুরে গুঁড়িয়ে যাওয়া অলকমণি। রাঙাবজ ও সবুজ মণিবেণুতে মিশে ধরেছিল আশ্চর্য্য ময়ূরকণ্ঠী রঙ্। আর নৃসিংহগুপ্তের মন মত্ত হয়ে উঠেছিল অবারণীয় আবেগে। অবাক হয়েছিলেন সেদিন। উজ্জয়িনীর মেয়েরা তো এটি জানে না। পরে মনে হয়েছিল এ তো গৃহবধূ নয়। চৌষট্টিকলাভিজ্ঞা রসবতী নটিমুখ্যা। তা ভিন্ন কে না জানে গৌড়ীয়-ললনারা ললিতবিহারিণী। কামকেও তাঁরা শিল্প করে তুলতে জানেন। অপরান্ত বা লাট দেশের মেয়েদের মত স্থূল রুচি তাঁদের নয়। কিন্তু আজ মাধবীর দেহটাকে দলিত পেষিত মর্দিত করেও নৃসিংহগুপ্ত শুনতে পেলেন না সেই মদোল্লাস।

আর প্রভাতে উৎসব শেষে ময়ূরিকা ফিরে এসে যাতযাম মাধবীর দেহটিকে দেখে বিস্মিত হোল।

কাল রাত্রের মধুভিখারী ছিল কোন পুরুষ?

মাধবীর জ্বালা কি সে মেটাতে পেরেছে?

আট

উষারতি।

বিনিদ্র কালিদাস প্রত্যুষেই এসেছিলেন মহাকালের মন্দিরে। তাঁর মনে প্রশ্ন ছিল।

কিন্তু গত যামিনীর মালার মত মাধবীর ধ্বস্ত রূপ দেখে তাঁর আর কোন প্রশ্নই থাকলো না। হৃদয় ক্ষত থেকে রক্ত যেন ঝরে পড়লো। মায়াবিনী, প্রেম নিয়ে তোর এ কি খেলা? কেন এই অপ্সরা-প্রবৃত্তি?

একটা তীব্র বিতৃষ্ণা নিয়ে কালিদাস মন্দির থেকে চলে এলেন! এই স্বৈরিণীকে চিরন্তন বধূর প্রতীক রূপে তিনি এঁকেছিলেন? হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে······না থাক। আর তবে কি রইল?

যোগাভ্যাস দ্বারা বৈদান্তিক মুক্তি!

তবে তাই হোক।

অন্তর্মনা হয়ে ফিরে চললেন তিনি গৃহাভিমুখে। এমন সময় পথে দেখা গেল নাথশর্মা সঙ্গে একটি ব্রাহ্মণ নিয়ে আসছে। ব্রাহ্মণ অর্থী; কিন্তু দ্বারপাল গুম্ফসজ্জায় ব্যপৃত বলে প্রবেশপথ পাচ্ছে না। কালিদাস শুনে মৃদু হাসলেন।

"আসুন আমার সঙ্গে। গিয়ে রাজাকে আশীর্বাদ করবেন কিন্তু।"

"নিশ্চয়, আর্য্য, নিশ্চয়।"

"কি বলবেন?"

"সেই তো কি বলব ? বাবা, তুমিই বলে দাও। রাজদ্বারে কখনো আসি নি।"

"বলবেন—ত্রিপীড়াপরিহারো'হস্তু। কেমন ?"

"ঠিক বলব, বাবা, ঠিক। গিয়েই তুহাত তুলে আশীর্বাদ করে বলব ত্রিপরিহারো'হস্তু।"

"না, না, ভুল হোল। বলবেন ত্রিপীড়াপরিহারো'হস্তু। মানে ত্রিপীড়া যেন আপনার না হয়। ত্রিপীড়া কাকে বলে ?"

"জানি নে বাবা। ত্রিপীড়া আবার কি বস্তু ?"

"ত্রিপীড়া হোল আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক।"

"বুঝেছেন তো এবার ?"

"নিশ্চয়, বাবা, নিশ্চয়। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। কিন্তু অর্থটা আমার আজকেই দরকার। পাব তো বাবা ?"

"পাবেন বৈকি। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কাছে অর্থী এলে কি ফিরে যায় ?"

মণিকুট্টিমে এক শিলাসনে চন্দ্রগুপ্ত বসে আছেন। পাশে মন্ত্রী জীবগুপ্ত ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুরুষবর্গ। না, পাটলীপুত্রের মত সুবৃহৎ সমুদ্রগৃহ এখানে নেই। (কি করে হবে ? এই তো প্রথম উজ্জয়িনীকে রাজধানী করা হোল।) তাই চারিদিকে বেশ একটা হৃদ্য, অন্তরঙ্গ আবহাওয়া। তবু ব্রাহ্মণ বিশেষ ভীত হয়ে পড়লেন। চারিদিকে এত দিব্যদ্যুতি।

কালিদাস ইশারায় বললেন,—"বলুন"

"কি বলব ?" ব্যাকুল চোখে তাকালেন ব্রাহ্মণ।

কাণে কাণে কালিদাস বললেন,—"ত্রিপীড়া……"

"বাস্ বাস্ আর বলতে হবে না।" ব্রাহ্মণ ছুটে গিয়ে তুই হাত তুলে সজোরে বলে উঠলেন—"ত্রিপীড়াস্তু।"

সভাসুদ্ধ চমকিত। বলে কি ?

কালিদাস সবেগে ব্রাহ্মণকে টেনে সরিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন,—

আসনে বিপ্রপীড়াস্তু শিশুপীড়া চ ভোজনে
শয়নে দারপীড়াস্তু ত্রিপীড়াস্তু দিনে দিনে।

সভায় হাসির রোল উঠল।

মহামন্ত্রী জীবগুপ্তের গাম্ভীর্য্যে পর্য্যন্ত হাসির ফাটল ধরল।

অমরসিংহ হাসতে হাসতে বিষম খেলেন। বেশ জমিয়েছে কালিদাস।

"খুব বাঁচিয়েছে ব্রাহ্মণকে।" হেসে বললেন বররুচি।

চন্দ্রগুপ্ত খুব খানিকক্ষণ হেসে নিয়ে ভাণ্ডারীকে শত স্বর্ণ মুদ্রা দিতে আদেশ দিলেন। রাজকার্য্যে সভা গম্ গম্ করছে। এরি মধ্যে বররুচি একান্তে কালিদাসকে জানালেন,—

"শুনেছ তো ঘটকর্পর কি বলছেন? যমক কাব্য রচনার শক্তিতে যে তাঁকে অতিক্রম করতে পারবে তাকেই তিনি পা ধোবার জল ঘটে করে এনে দেবেন।"

অমরসিংহ অমনি ঘটকর্পরের অনুকরণ করে হাত নেড়ে বলে উঠলেন,—

"আলম্ব্যাবাম্বুতৃষিতঃ করকোশপেয়ং
ভাবানুরক্তবণিতা স্মরতৈঃ শপেয়ম
জীয়েয়বেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ।

কিন্তু যাই বল ভাই নারকেল ফলের রস পান করা কঠিন।"

কালিদাস ও বররুচি দুজনেই হেসে উঠলেন। চন্দ্রগুপ্ত প্রশ্ন করলেন, "কবি, এ বছরের রাজপারিতোষিক মাত্র দুজন বিদগ্ধ নাগরিককে দেওয়া যাবে বলে কোষাধ্যক্ষ জানাচ্ছেন।"

কালিদাস একটু হেসে চোখ মুদে বললেন,—

"আমার মনে হয় তাঁরা দুজন এখানেই আছেন।"

"এখানে?"

"হ্যাঁ রাজন্, অমরকোষ রচয়িতা অমরসিংহ আর পাণিনিবৃত্তিকার আচার্য্য উপবর্ষশিষ্য বররুচি।"

"তাই লিখে নাও।" চন্দ্রগুপ্ত আদেশ করলেন কোষাধ্যক্ষকে। কালিদাস বললেন,—"ভাল করে লিখুন,

পণ্ডিত আদিত্যদাসপুত্র অমরসিংহ এবং আচার্য্য সোমদত্তের পুত্র বররুচি।"

"আর কালিদাস ?" মহামন্ত্রী শুধালেন সবিস্ময়ে।

"এ বছরে আমার প্রাপ্য কিছুই নেই। এখনো কিছু লিখে উঠতে পারি নি। লেখবার মত বিষয় পাচ্ছি না।" কালিদাস সহসা বিমনা হয়ে গেলেন।

চন্দ্রগুপ্ত চোখ টিপলেন—"লেখার খোরাক পাচ্ছ না কি হে ? পাবে, পাবে।"

মধ্যপ্রহরের ঘণ্টা বাজল। অমরসিংহ ও বররুচি রাজাকে অভিবাদন করে বিদায় নিলেন। কালিদাস বররুচির দিকে চেয়ে একটু হাসলেন,—"ভট্টিনী উপকোশাকে বোল ব্রাহ্মণভোজন করাতে।"

বররুচি একটু সলজ্জ হাসলেন।

"তুমি যাবে না ?" অমরসিংহ প্রশ্ন করলেন।

চন্দ্রগুপ্ত আবার চোখ টিপলেন—"না, ওঁর লেখার বিষয় খুঁজে দেব বলে থাকতে বলছি।"

ওঁরা হাসতে হাসতে বিদায় নিলেন। সভাকুট্টিম নির্জন হয়ে গেল। শুধু দ্বারে মূক অন্তঃপাল। দূরে একজন তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী সুন্দরী তাম্বুল সোনার থালায় সাজিয়ে রাখছে। অন্য একটি যুবতী শীতল ফলরসের ভৃঙ্গার হাতে বসে আছে। বিক্রমাদিত্য কালিদাসের পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন,—"চল।"

"কোথায় ?"

"অন্তঃপুর।"

"সহসা ?"

"পট্টমহাদেবী ধ্রুবস্বামিনী তোমাকে দেখতে চেয়েছেন। কাল ভাকাটক ভবনে সুরসিদ্ধি নামে এক যাদুকর নানা ইন্দ্রজাল দেখাল। ময়ূরপুচ্ছ ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'কি দেখতে চান বলুন—মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা—উডুম্বরের পুষ্প—ধরায় চাঁদ ?' এই বলে সে দেখাল আকাশে কমলাসনে সরস্বতী, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, শশাঙ্কমৌলী শম্ভু। আরো কত কি। কিন্তু পট্টমহাদেবীর এতে মনোরঞ্জন হোল না। তিনি বললেন, 'এতো নকল বস্তু প্রকৃত তো নয়। এ তো কৃষ্ণ বিদ্যা—শুক্ল বিদ্যা নয়।' তখন আমি বললুম সৃষ্টি করতে পারেন এক প্রজাপতি ব্রহ্মা আর কোন মহাকবি।

তাতে তিনি শুধালেন—'তোমার সভার নবরত্নের কবি কালিদাস কোথায় ?' এদিক ওদিক খোঁজ করে তোমাকে পেলুম না। তখন বললুম—লেখা পড়েছ তাঁর ?"

মহাদেবী বললেন—"শুধু পড়ি নি, কণ্ঠস্থ করে রেখেছি। মেঘদূত আমার অতি প্রিয় কাব্য। কিন্তু ওঁর নায়িকাটি কে ? ভট্টিনী নাকি ?"

"তাই হবে।"

"না, মহারাজ, আমি রমণীর মন নিয়ে বলতে পারি এ ভট্টিনী নয়। এর নায়িকা স্বকীয়া নয়।"

আমার গা কণ্টকিত হোল—হৃদয় উতরোল হোল। বললুম,—"প্রিয়ে, রাজকার্য্য নিয়ে থাকি এতটা কাব্যালোচনার সময় কোথায় ? তুমিই জিজ্ঞেস করে নিয়ো কবিকে।"

কালিদাস মৃদু হাসলেন।

অন্তঃপুরের যবনী প্রতিহারিণী মহারাজকে দেখেই ভল্ল নীচু করল। এই ওদের অভিবাদন প্রথা। অবরোধে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই শোনা গেল ওড়না, রেশমের খস খস ধ্বনি। শোনা গেল নূপুরের নিক্কণ। কোন ঘরে অক্ষক্রীড়া হচ্ছে তারি সোল্লাস ধ্বনি—কোথাও বা বীণার ঝঙ্কার। কোন সুন্দরীদ্বয়ে কলহ হচ্ছে,—

"বাছা, তোমাকে বিকর্ণ করা ছাড়া আমার গতি কি? এত করে বললাম বীজটিকে দুধে ভিজিয়ে ঘি মাখাবে। গোময় ও হরিণমাংস মিশিয়ে বপন করবে। বললাম আর্য্য বরাহমিহির এই নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তা ভিন্ন নষ্ট শিংশপা বৃক্ষটিকে ছুরি দিয়ে চেঁছে তাতে ঘি ও পঙ্ক দেবে—দুধ ও জল ছিটোবে। বরাহমিহির তাই বার বার বলে গেছেন। আর তুমি কি না সবই উল্টো পাল্টা কাজ করে রেখেছ?"

উত্তরে মুখরা বলছেন,—

"কি? না হয় ভুল হয়েছে বীজটিকেই চেঁছে ঘৃতপঙ্কে দুধে জলে রেখেছি আর বৃক্ষটির গায়ে দিয়েছি গোময় আর হরিণমাংস। তাই বলে এত অপমান? তবে আমিও তোমার অঙ্গে উত্তরআষাঢ়ার পরের যে নক্ষত্রটি আছে তাই ভেঙ্গে দেব।"

"ওলো, মহারাজকে বলে মহাদেবের মাথার ভূষণে তোকে সাজাব।"

"অশোক গাছের সাধ দিয়ে তোমার মুখ ভাঙব।"

মহারাজ ও কালিদাস হাসতে হাসতে সে স্থান ত্যাগ করে অলিন্দ দিয়ে অগ্রসর হলেন। একটি ষোড়শী কিশোরী হাতে তালি বাজাতে বাজাতে আসছিল। মহারাজকে দেখে জিভ বার করে পালাল,—"ওমা মহারাজ যে।"

চন্দ্রগুপ্ত তাকেই ডাকলেন,—"পুষ্পবেণী।"

"আজ্ঞে মহারাজ", পুষ্পবেণী নতজানু হয়ে অভিবাদন জানাল, যেন চিত্রার্পিত বিনয়।

"পট্টমহাদেবীকে সংবাদ দাও।" রাজা হাসি চেপে বললেন।

"যে আজ্ঞে।" তন্মুহূর্তে মর্কটির মত লম্ফ দিয়ে সে ছুটল। চন্দ্রগুপ্ত ও কালিদাস হো হো করে হেসে উঠলেন। সে ততক্ষণে দোলক ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে ধ্রুবস্বামিনীর প্রকোষ্ঠে। রাজা প্রবেশ করলেন,—

"ধ্রুবা, এই যে কালিদাস।"

ধ্রুবস্বামিনী একটি মৃগচর্মের উপর বসেছিলেন। নীহারশুভ্র

উত্তরীয়—গৈরিকাভ পরিধেয়—দীর্ঘ এলায়িত চুলে ধূপের ধোঁয়ায় শুকনো হবার ফলে কিছুটা জটা বেঁধেছে। একটি শুভ্র শুদ্ধ পূজার ফুল যেন।

সকাল থেকে যে বিতৃষ্ণা কবির মনে লেগেছিল—যে কল্মষ শিপ্রার জলেও বিধৌত হয় নি এই মুহূর্তে যেন তা সুচিরস্নিগ্ধ হয়ে গেল। চন্দনের গন্ধ হাওয়ায় ভাসছে। মৃদু ধূপের সুরভি।

পট্টমহাদেবী স্মিত হেসে একমুঠো চাঁপা ফুল কবির হাতে তুলে দিয়ে করজোড়ে প্রণাম জানালেন। যেন গঙ্গার জল তরঙ্গ তুলে গেল। মৃদুকণ্ঠ ধ্বনিত হোল, "সৌম্য,—উপবেশন করুন।"

মহার্ঘ্য স্ফটিক পাত্রে কর্পূরসুবাসিত নারিকেল জল নিয়ে এল সখী-প্রধানা নাগশ্রী। চন্দ্রগুপ্ত তৃপ্তির সঙ্গে সেই ফলাম্বু এক নিঃশ্বাসে পান করে বললেন,—"তোমার প্রশ্নটি কর এবার।"

"আঃ কি যে বলেন, আর্যপুত্র," হাতের পদ্মের পাপড়ীতে হঠাৎ মনোনিবেশ করেন ধ্রুবস্বামিনী ঈষৎ রক্তিম হয়ে।

নববধূর এই লজ্জাটুকু পরম উপভোগ করলেন কালিদাস।

চন্দ্রগুপ্ত এবার বন্ধুকে নিয়ে পড়লেন,—

"কিন্তু কবি, সত্যি সত্যিই কি তুমি মন্ত্রী হয়ে সব লেখাপড়া বিসর্জন দিলে?"

সঙ্গে সঙ্গে ব্যথিত দুটি চোখ তুললেন ধ্রুবস্বামিনী।

সেই চাউনি—গন্ধাবতী নদীর জলের মত নির্মল।

হস্তিদন্তখচিত চন্দনকাঠের আসনে বসেছেন মহারাজ, পায়ের কাছে মৃগচর্মে ধ্রুবস্বামিনী। কি সুন্দর!

অম্ভোবিন্দুগ্রহণচতুর চাতকের মত তাকালেন কালিদাস। স্বাতী নক্ষত্রে যে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে তাতে কি মুক্তাফল ফলবে? এই আশাই কি ছিল দত্তদেবীর মনে?

সহসা কালিদাসের মাথায় উপমার পর উপমা বন্যাস্রোতের মত ভেসে আসতে লাগল। বিদ্যুৎজ্যোতির মত ঝলকিত হোল 'পার্বতী-

পরমেশ্বরৌ।' সঙ্গে সঙ্গে নয়নপথে ভেসে উঠলো হিমবান হরমুখ পর্বত। এই রাজদম্পতীকে দেবদম্পতীর রূপকল্পে স্মরণীয় করে রাখলে কেমন হয়? মুখে বললেন—"দেবী, একটি নতুন কাব্য রচনার ইঙ্গিত পাচ্ছি।"

"সাধু, সাধু, কবি, তবে এ কাব্যের নায়িকা হবেন ধ্রুবস্বামিনী।" চন্দ্রগুপ্তের প্রগলভ হাতের চাপড় কবির পিঠে পড়ল। হাতের পদ্মের পাপড়ীতে আবার মনোনিবেশ করে রইলেন দেবী। তাঁর অনুক্ত সম্মতিটুকু হৃদয় দিয়ে বুঝে নিলেন কালিদাস। বললেন,—

"দেবী, আপনাকে নায়িকা করবার দুরাশা—রাখি না। তবে যে কাব্য আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছে সে কাব্য আপনারই।" ধ্রুবস্বামিনী তাঁর নলিন-নয়ন দুটি তুলে বললেন,—"তাহলে আমি কিন্তু প্রথম শুনব সেই কাব্য।"

"সাধু, সাধু, আমি তোমার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলুম।" —চন্দ্রগুপ্ত আবার উচ্ছসিত হলেন।

দ্বিপ্রহরের তীব্র রোদ মাথায় নিয়ে ফিরতে ফিরতে কালিদাসের মনে হোল বজ্রমণির ছিদ্র তো তিনি পেয়ে গেছেন এবার সূত্র প্রবেশ করালেই তো হয় উন্মত্তের মত গৃহে প্রবেশ করেই তিনি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। ভূর্জপত্রের পর ভূর্জপত্রে মরালপালকের পর মরালপালকে ঘর পূর্ণ হয়ে গেল। ভোজ্য নিয়ে বার বার এসে ফিরে গেলেন ভট্টিনী। কালিদাস আবার মেতে উঠেছেন শব্দের খেলায়। এ খেলার জ্বাল নটী মাধবীর পানকউৎসবের চেয়েও কঠিন।

কপালে করাঘাত হানলেন ভট্টিনী।

"অপ্রতিহত জমিগুলির কোন ব্যবস্থাই হোল না। নদীমাতৃক ভূমি আর কতই বা আছে? অথচ এই তো শঙ্কু বলে গেল, অমর-সিংহ এবং আর্য বররুচিকে ব্রহ্মদেয় গ্রাম, পারিতোষিক, রাজবৃত্তি সব পাইয়ে দিয়েছেন কালিদাস। ঘটকর্পর কত কালের বন্ধু। সে পর্যন্ত

কপালে করাঘাত করে খেদ করে গেল 'আমার কপালে সবই নিষ্ফল।' মানুষটার কি সবই উদ্ভট ?"

বন্ধ দ্বারে কাণ পেতে শুনলেন ভট্টিনী—

কালিদাসের কণ্ঠ বাজছে,—

"অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।" সে আবার কি ?

এদিকে যবের শক্তু শক্ত হয়ে উঠল। অন্ন না লাজ বোঝা কঠিন। ভট্টিনী গিয়ে সব খাদ্য ধরে দিলেন গৃহবলিভুক কপোতগুলির কাছে।

পক্ষের পর পক্ষ কাটল, মাসের পর মাস।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সর্গ লেখা হয়ে গেল।

কালিদাসের তুলিকায় কখনো ফুটে উঠল অরণ্য—কখনো পর্বত—কখনো গেয়ে উঠল কিন্নর মিথুন—কখনো কূজন করে উঠলো কোকিল-কপোত। তিনি আঁকলেন স্বর্গের চক্রান্ত—মর্তের মহিমা।

হেমবেত্রহস্ত কঠিন নন্দীর মত মুখ বেঁকালো ধ্রুবা দেবীর সখীরা। শিবের নিবাত নিষ্কম্প রূপটি চোখ মুদে ধ্যান করলেন ধ্রুবস্বামিনী।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এখনো গেল না ভোলা ?

কোন অন্ধকার থেকে উঠে আসে মাধবী ?

অশ্রুভরানেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে মানিনী ?

সে যে তার অনেক দিনের নায়িকা। মালবিকা, উর্বশী, যক্ষবধূ। এবারের কাব্যে সে কি উপেক্ষিতাই রইবে ?

পট্টমহাদেবীর সখী পুষ্পবেণী ধৃষ্টার মত বলেছে সেদিন,—"কবি, কাঁদাতে পার ?"

কালিদাসও অহঙ্কারের সঙ্গেই জবাব দিয়েছেন,—"যে নবরসে সিদ্ধ নয় সে আবার কবি কিসের ? পারি বৈ কি।"

সেই স্পর্ধিতারও উত্তর দিতে হবে।

শিপ্রা নদীতে অবগাহন করতে করতেই মাথায় কল্পনাটি এল।

চতুর্থ সর্গে রতিবিলাপ লিখবেন। মাধবীকে সেই সর্গটি দেবেন কেবল। কান্না ?—মাধবীর মত কেউ কাঁদতে পারবে ? মনে পড়লো কাশ্মীরে যাত্রার দিনটির কথা। মাধবী তার জীবনের সব কান্নাই সেদিন উজাড় করে দিয়েছে। হয়তো তাই আজ সেখানে শিলার কাঠিন্য। রতিবিলাপ শুনে ধ্রুবস্বামিনীর চোখে অশ্রুধারা বইল। সখীরাও চোখ মুছলেন। দ্বারপার্শ্বে বসে পুষ্পবেণীও কাঁদল। প্রিয়বিয়োগব্যথার অনুভবে কেমন পাণ্ডুর দেখাল সেদিন ধ্রুবস্বামিনীকে।

কালিদাস মনে মনে লজ্জিত হলেন।

হয়তো এতটা করা ঠিক হোল না।

হয়তো এতে পরিমিতি নষ্ট হোল।

ধ্রুবাদেবী শুনে বললেন,—"না, কবি, এ সর্গটি তোমার অমর হয়ে থাকলো। পুরুরবার বিলাপে তুমি পুরুষের উক্তি লিখেছ। রতির বিলাপে তোমার নারীর উক্তি ফুটে থাকুক।"

উমার তপস্যার সর্গ লেখা শুরু হতেই কালিদাস শুনলেন ধ্রুবস্বামিনী অন্তর্বত্নী। তপঃক্লশা পার্বতীর মতই যেন ভিতরে আগুন বহন করছেন মহাদেবী। তাহলে শুধু বিবাহ এ কাব্যের পরিণতি নয় ? কালিদাসের মনে শোল কে বলে কাব্য নিযতিকৃতনিয়মরহিতা ? কোথায় যেন নিয়তির তর্জনী উদ্যত হয়ে আছে। শুধু প্রগলভ রসের মধুরিমা নয়, একটি পরিণত শান্তি মহিমা তাঁকে দেখাতে হবে। সম্ভোগে নয়—সাধনায় তার সিদ্ধি। দুটি সত্তার আনন্দে সৃষ্ট হবে এক মোহন পূর্ণতা যা সমাজকে দেবে অভয় ও স্বস্তি।

সেদিন অপরাহ্নে তিন ঘটিকায় কাব্যপাঠ করতে গিয়ে কবি দেখলেন ছোট্ট চন্দনকাঠের বেদীর [illegible] তাঁর কৌষিক বস্ত্রে মোড়া পুঁথিটি যেমন থাকে তেমনি রয়েছে। মৃগচর্মে আসীনা ধ্রুবস্বামিনীও আছেন প্রতিদিনের মত। কিন্তু সখীদের পরিবর্তে গজদন্তের পালঙ্কে উপাধানের উপর অর্দ্ধশায়িত হয়ে আছেন চন্দ্রগুপ্ত।

কবিকে দেখে শুধালেন,—"আজ কোনক্রমে পালিয়েছি মহামন্ত্রীর কাছ থেকে। নাও প্রসঙ্গ শুরু কর। আজ কি হবে?"

"বিবাহ প্রস্তাব এবং বিবাহ।"

"দেবদম্পতীর না রাজদম্পতীর?" বিক্রম সারল্যের ভাণ করলেন। "দেবতাই রাজা, রাজাই দেবতা, সখা।" কালিদাস স্মিত হেসে উত্তর দিলেন।

"অথ?"

"কুমার-সম্ভব। ধর্মবিবাহের পূর্ণ পরিণতি পুত্রলাভ অর্থাৎ পুণ্যলাভ। দম্পতীর আনন্দই তো সন্তানরূপ ধরে।"

"উত্তম, উত্তম। কবি আমার যদি পুত্র হয় তবে তার নাম দেব কুমার গুপ্ত। কন্যা হলে, কুমার-দেবী।"

"পুত্রই হোক। আমাদের মত দরিদ্র ব্রাহ্মণদের কিছু অধিক ভোজ্য লাভ হবে।"

হেসে উঠলেন ধ্রুবস্বামিনী। পার্বতীমন্দিরের ছোট ঘণ্টাগুলো যেন বেজে উঠলো টুং টাং করে।

দিনে দিনে ধ্রুবস্বামিনীর মুখখানি হয়ে উঠলো লোধ্রকুসুমের মত পাণ্ডুবর্ণ। ধীরে ধীরে তিনি প্রসাধন, ভূষণ ত্যাগ করে তপঃকল্পা পার্বতীর মত কৃশা হয়ে উঠছেন। দৌহৃদ-লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর অঙ্গে। তারই সাথে সাথে একমন একপ্রাণ চন্দ্রগুপ্তও যেন সেই বেদনা অনুভব করেন। বিরহী যক্ষের দণ্ডের চেয়েও এ যে কঠিন— দম্পতীর একত্রে এই ব্রত পালন।

পীন পয়োধর পীবর হোল। অগ্রভাগ হয়ে উঠলো নীলমুখ, যেন পদ্মকুট্মলে নিবিষ্ট ভ্রমর। গুরুভার গর্ভে দুর্বহ হয়ে উঠেছে দেহ তবু কবি এলে অভ্যর্থনার জন্য আসন থেকে অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত নিয়ে কষ্ট করে উঠে দাঁড়াতেন মহাদেবী। পরিপ্লুত হোত তাঁর নেত্রদ্বয়। জলভারনত মেঘের মত প্রসবমুখী রাণী যেন মহাপ্রকৃতি। কালিদাস

মুগ্ধনয়নে দেখতেন রমনীর জননীসত্ব। কে বলে নারীর তন্বীরূপ শ্রেষ্ঠ? তারা এসে দেখে যাক নিধিগর্ভা ধরিত্রীর মত সসত্ত্বা এই মহিষীকে।

নয়

মহাসান্ধিবিগ্রহিক নৃসিংহগুপ্ত কবি কালিদাসকে সংবাদ পাঠিয়েছেন—বিদেশ থেকে এসেছেন এক চৈনিক পরিব্রাজক। তিনি শ্রমণও বটেন। বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। একবার কি কবি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন?

কালিদাস ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। নৃসিংহগুপ্ত! নামটা পর্য্যন্ত তাঁর অসহ্য লাগে। কিন্তু রাজকার্য্যে বহু অসহনীয়কেই সহ্য করতে হয়। শিপ্রার অপর পারে তাঁর ভবন। নৃসিংহগুপ্ত তাঁর শুকমুখী তরণী পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উত্তম। কবি অঙ্গে জড়িয়ে নিলেন শুভ্র উত্তরীয়। কপালে রক্ত চন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক। দূরে মাধবীর ভবন। কালিদাস চোখ ফিরিয়ে নিলেন। আজকাল মহাকাল-মন্দিরেও যান না। কেমন আছে সে কে জানে?

প্রবালকুট্টিম, মন্ত্রণাগৃহ প্রভৃতি অতিক্রম করে যখন তিনি পৌঁছলেন মহাসান্ধিবিগ্রহিকের প্রকোষ্ঠে নৃসিংহগুপ্ত তখন তাঁর প্রিয় চিত্রব্যাঘ্রটির সঙ্গে গোলক নিয়ে খেলছিলেন। কবিকে দেখেই উল্লাস প্রকাশ করে বললেন,—"এস, এস, কবি। তোমার যে দেখাই পাই নে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধিনী বলছিলো বটে তুমি নাকি বর্তমানে মহিষীর কাছে রাজকার্য্যে ব্যস্ত আছ।"

কথাটার মধ্যে খোঁচা ছিল।

কালিদাস তপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বলবার

আগেই ব্যাঘ্রশিশু একটি গর্জন দিয়ে কালিদাসের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। কালিদাস অবিচলিত। নৃসিংহগুপ্ত ত্রস্ত হয়ে এসে তাকে রজ্জুবদ্ধ করলেন। কালিদাস মনে মনে বললেন—"জান্তব"। মুখে বললেন,—

"পৌণ্ড্রবর্দ্ধিনী কে?"

"মাধবী, মাধবিকা, নটিমুখ্যা। কেন, ও যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মেয়ে তুমি জান না?"

"শুনেছিলাম বটে। চৈনিক পরিব্রাজক কোথায়? আলোচনা শুরু হোক।"

"এই তো এসেছ। এত অধীর কেন? একটু উপবেশন কর। কি খাবে মাধ্বী? না কাদম্বী? নতুন গুড়ের রসে তৈরী এক রকম সুরা পাঠিয়ে দিয়েছেন নাবধ্যক্ষ ইন্দ্রগুপ্ত। খাবে নাকি? কাজ তো করবেই।"

"কাজ যখন করতেই হবে বিলম্বের প্রয়োজন দেখি না।"

একটু ম্লান হয়ে গেলেন নৃসিংহগুপ্ত। বললেন,—

"চল।"

একটি কক্ষের সম্মুখে পীত যবনিকা সরিয়ে দিলেন তিনি। কালিদাস দেখলেন মুণ্ডিত মস্তক পীতবসনাবৃত এক ব্যক্তি অমিতাভ বুদ্ধের চরণে নত হয়ে প্রণাম করছে। আত্মনিবেদনের রূপটি কি সুন্দর।

ধূপ জ্বলছে পাশে।

আর কোন উপচার নেই।

ধূপের ধোঁয়ায় যেন সেই সন্ধানী আত্মার বিকাশ। যে চলেছে অমৃতের প্রার্থনায় অনন্তের পথে।

কতক্ষণ পরে শ্রমণ উঠলেন।

একটু মিষ্টি হেসে বললেন,—

"স্বাগতম্, সুস্বাগতম্।"

নৃসিংহগুপ্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন,—"এঁরই নাম ফা হিয়েন।

এসেছেন সুদূর চীন দেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মের সারাৎসার জানতে। বালুকাম্বুধি (গোবি) পার হয়ে এসেছেন অনেক দুঃখ সহ্য করে।"

কালিদাস শুধালেন,—"তাই নাকি উপাসক ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। যদিও তুং-হুয়াং-এর প্রদেশপাল আমাদের জন্য সব ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন তবু সেই সিকতা-সিন্ধু অতিক্রম করা বড় কঠিন—বড় কষ্ট। চতুর্দ্দিকে অশুভ আত্মারা মানুষকে মারবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে যেন। পথ চিনবার উপায় নেই। না আছে পাখী, না পশু, যে তাদের পদরেখা ধরে যাব। শুধু বিরাট বালুকারাশি—কখনো শোঁ শোঁ করে গজরাচ্ছে, কখনো দুরন্ত ঝড়ের আঁধি তুলছে। পলকে সৃষ্ট করছে বালুর পাহাড় ; পলকে সে পাহাড় উড়িয়ে নিচ্ছে। দিনের বেলা জ্বলন্ত নরকের মত দাউ দাউ জ্বলছে —নিশীথে মৃতপুরীর মত হিম নিঃসাড়। শাস্তি নেই, স্বস্তি নেই, জল নেই, খাদ্য নেই। শুধু মাঝে মাঝে মৃত মানুষের অস্থি দিক নির্ণয় করছে মাত্র।"

"আশ্চর্য্য। এই জলবতী ফলবতী ভারতভূমিতে বসে বিধাতার এ সৃষ্টি আমরা কল্পনাও করতে পারি নে।" কালিদাস বললেন।

নৃসিংহগুপ্তের এসব কথা ভাল লাগছিল না। একটু মাধ্বী পান অন্ততঃ প্রয়োজন। তিনি জৃম্ভন করলেন। তারপর বললেন,— "তাহলে, মাতৃগুপ্ত, আমি এবার যাই। তোমরা কথা বল। উপাসক, আপনি যাঁদের সাক্ষাৎ কামনা করেন এঁকে বলবেন। হ্যাঁ, দেখ, মাতৃগুপ্ত, ইনি ক্ষপণকের সঙ্গে একবার কথা বলতে চান।"

"ক্ষপণক!" কালিদাস অবাক হলেন।

"হ্যাঁ।" নৃসিংহগুপ্ত মাথা নাড়লেন।

"অমরসিংহ নয় কেন ?" ভুরু কুঁচকে কালিদাস শুধালেন।

ফা হিয়েন সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন,—"অমরসিংহ কে ?"

"ইনিও একজন বৌদ্ধ। তবে হীনযান মতের।" জানালেন কালিদাস। "আমি তো এঁর নাম জানতাম না। হীনযানীর সঙ্গেও

আমার সাক্ষাৎ দরকার। কারণ তাঁরাই প্রাচীন মত ধরে রেখেছেন। পাপীরাও যে উদ্ধার পাবে এ কথা তাঁরা ছাড়া আর কে বলেছেন? মহাযান তো পরবর্তী পরিবর্তন। বুদ্ধ সেখানে ত্রাতা। ত্রিশরণ সেখানে ব্যক্তিরূপ নিচ্ছে। এই তো শান-শান দেশে গিয়েছিলম— সেখানে ভূমি বন্ধ্যা, বন্ধুর। সেখানের সকলেই হীনযান মতে বিশ্বাসী। সবাই সেখানে ভারতভূমির ভাষায় কথা বলে। কারাশরেও দেখলুম চার হাজার হীনযান শ্রমণ। তবে কারাশর আমার ভাল লাগেনি। সেখানকার লোকগুলো না জানে ভদ্রতা— না জানে অতিথিসেবা! সংকীর্ণ হৃদয়।"

কালিদাস মুচকি হাসলেন।

অসহিষ্ণু নৃসিংহগুপ্তকে বললেন,—"তুমি যেতে পার।"

তারপর ফা হিয়েনের দিকে তাকিয়ে বললেন—"ত হলে বৌদ্ধধর্মও হৃদয়ের পরিবর্তন করতে পারেনি বলুন।"

"পেরেছে বৈকি। অনেকখানি পেরেছে। বন্য জাতিগুলিকে সংহত করেছে—বর্ণমালাহীন জাতিকে বর্ণমালা দিয়েছে—সাহিত্য দিয়েছে—শিখিয়েছে মূর্তি রচনা করতে—গঠন করতে বিহার-চৈত্য। মানুষকে শিখিয়েছে চিন্তা করতে—শিখিয়েছে বিনয়। অহিংসা ও ও শান্তির মূল্য বুঝিয়ে মানুষকে প্রেরণা দিয়েছে আধ্যাত্মিক হতে। হীনযানের মধ্যে একটি সমগ্র জাতি নৈতিক চরিত্র শিখেছে—শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করেছে সহস্র সহস্র মানুষ। আর মহাযান দিয়েছে ভবিষ্যৎ জীবনের আশা।"

কালিদাস বিস্মিত। মনে মনে ভাবলেন। এতো সাধারণ শ্রমণ নয়। আরো কিছু।

ফা হিয়েন তখন তদ্গত ভাবেই বলে চলেছেন,—

"অমিতাভের দিব্য বিভা ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কারাগার থেকে এলুম খোটানে। কি দুর্গম সেই পথ। নদীগুলো পার হওয়া অসম্ভব প্রায়। খোটানে পৌঁছলুম একমাস পরে। এরা মহাযান

সম্প্রদায়ের। বড় সহৃদয় সকলে। অনেক স্তূপ আছে। আমাদের দেশে তাকে প্যাগোডা বলে। অতিথিদের থাকবার সুবন্দোবস্ত আছে। আমরা ছিলুম গোমতী-বিহারে। ঘণ্টা বাজলে একসঙ্গে খেতে যেতুম। তিন হাজার শ্রমণ একসঙ্গে খেত। ব্রাহ্মণদের মত খাবার সময় কেউ কথা বলত না। পাত্রগুলির আওয়াজ হোত না। আরো খাদ্যের প্রয়োজন হলে হাততালি দেওয়ার নিয়ম সেখানে।

এলাম কাশগড়ে। সেখানে আছে শাক্যমুনির একটি পিকদানী। বোলারতাগ গিরিপথ পার হলুম। বৃষ্টি—বরফ—ঝড়—কি নেই সেই পর্বতমালায়? তার পর পৌঁছলুম দারেলে। সেখানে এক অর্হৎ তপস্যার বলে এক কারুবিৎ-কে নিয়ে গিয়েছিলেন তুষিত স্বর্গে মৈত্রেয় বুদ্ধের রূপ দেখাবার জন্য। সেই কারুবিৎ িপ্পান্ন হাত দীর্ঘ এক মৈত্রেয় বুদ্ধ মূর্ত্তি রচনা করেছে। আহা কি প্রশান্ত মহিমা সেই মূর্ত্তির।

দেখলাম উদ্যানে শাক্যসিংহের পদচিহ্ন—যে প্রস্তর খণ্ডটির উপর তিনি চীবর শুকোতে দিতেন সেটি আজও আছে। গান্ধার দেশে দেখলুম তাঁর ভিক্ষাপাত্র। নগরহারে শুনলুম আছে শাস্তার দন্ত। হিরোনগরে মস্তিষ্কের অস্থি। মাথুরে দেখলুম রমণীদের প্রিয় বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দের স্তূপ। কিশোরদের প্রিয় বুদ্ধপুত্র রাহুলের স্তূপ। শ্রাবস্তীতে আছে বুদ্ধধাত্রী মহাপ্রজাপতির বিহার। এখানে অমিতাভ জীবনের পঁচিশ পঁচিশটি বছর কাটিয়েছিলেন। হায়, তখন কেন জন্মগ্রহণ করলাম না? সে রাজা নেই—সে রাজ্য নেই। অরণ্যের মধ্যে যেখানে একদিন ছিল শুদ্ধোদনের প্রাসাদ সেখানে একটি বিহার মাত্র দাঁড়িয়ে আছে।

গেলুম যেখানে মায়াদেবী দেখেছিলেন শ্বেতহস্তীর শুভস্বপ্ন —যেখানে মায়াদেবী পূর্বাস্য হয়ে বৃক্ষশাখা ধরে জন্ম দেন সিদ্ধার্থের —যেখানে শাক্যসিংহ রুগ্ন মানুষ দেখে রথ ফিরিয়ে ছিলেন—যেখানে নন্দ ও দেবদত্ত তাঁকে হস্তী দিয়ে পিষ্ট করে ফেলতে চেয়েছিল—যেখানে

বুদ্ধ তীর ছুঁড়ে তীর-উৎস সৃজন করেছিলেন। দেখলুম সেই পুণ্য স্থান যেখানে তিনি বুদ্ধ হবার পর ফিরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন শুদ্ধোদনের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশত শাক্যবংশীয় রাজকুমার চিরদিনের মত পার্থিব বিলাস বিসর্জন দিয়ে তাঁর শিষ্য হয়েছিল। যেখানে সেই ধর্মবৃক্ষ পিপুল-দ্রুমতলে মহাপ্রজাপতি তাঁকে চীবর দান করেছিলেন…

তারপর কুশীনগর। হিরণ্য নদীর তীরে মহাপরিনির্বাণ।" ফা হিয়েন নীরব হলেন। কণ্ঠ তাঁর অশ্রুরুদ্ধ। ধূপকাঠিগুলি জ্বলে জ্বলে নিঃশেষিত। ভস্মশেষ রক্তস্তূপিলে আলপনা রচনা করছে। কালিদাস স্তব্ধ হয়ে ভাবছিলেন সেই সন্ন্যাসী রাজপুত্রের কথা। আর আজকের দিনের বিহারগুলি? চক্রী ক্ষপণকের কূট রাজনীতির কেন্দ্র। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ল তাঁর হৃদয় থেকে। হয়তো সেই শব্দেই ফা হিয়েন আবার চকিত হলেন। মৃদু থেকে উচ্চ, ক্রমে উচ্চতর স্বরে বলতে শুরু করলেন।

"তারপর, আর্য্য, শুনুন, গেলাম বৈশালী, মগধ ও রাজগৃহে। গৃধ্রকূট পর্বতের যে গহ্বর থেকে তিনি সুরঙ্গমসূত্র প্রচার করেছিলেন —যেখানে আনন্দকে গৃধ্ররূপী মারের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। আজো আছে সেখানে তাঁর হাতের ছাপ। সৌম্য, ফুল ও ধূপ দিয়ে সাজিয়ে দিলাম সেই স্থান। দীপ জ্বালিয়ে রাখলাম সারারাত। আবৃত্তি করলাম তাঁর সূত্র। তারপর এলাম বুদ্ধগয়া—যেখানে ষড় বর্ষ ধরে তিনি ধ্যান করেছিলেন। এখনো আছে সেই বোধিদ্রুম তাঁর সিদ্ধিক্ষেত্রে। সেখান থেকে গেলাম মৃগদাবে যেখানে তিনি প্রথম প্রচার করেন তাঁর সৎ ধর্ম।

সৌম্য, এখানে এসেছি তাঁর বিনয়পিটকের একখানি পুঁথি সংগ্রহ করতে। বিনয়সূত্র গুরুমুখী বিদ্যা। শিষ্যপরম্পরা চলেছে শ্রুতির সাহায্যে। কোন লিখিত গ্রন্থ নেই যা দেখে অনুলিপি করতে পারি।"

কালিদাস সস্মিত বদনে বললেন,—"সে তো উত্তম কথা। কিন্তু

শীলবন্ত, সেজন্য তো দীর্ঘকাল আপনাকে এ দেশে থাকতে হবে। আপনি উত্তম সংস্কৃত জানেন দেখছি। পালি ও নিশ্চয় জানেন ?”

“ভাল জানি না। কিন্তু শিখে নিতে আমি প্রস্তুত আছি। অভিধর্ম-সূত্র আর নাগার্জুনের সর্বাস্তিবাদসূত্র আমি পেয়েছি, সেগুলিও পড়া দরকার।”

“উত্তম। আমি আপনার শিক্ষকের ব্যবস্থা করে দেব।”

কালিদাস উঠলেন।

দ্বার পার্শ্বে ফা হিয়েনের অন্যতম সঙ্গী তাও। সে এতক্ষণে একটি কথাও বলে নি। এবার বলল—“অভিবাদন, আর্য্য।”

“স্বস্তি।”

কালিদাস মুখে বললেন বটে কিন্তু প্রাণে অস্বস্তি বোধ করলেন। কোথায় যেন দেখেছেন এর মুখ ? কিছুতেই স্মরণ হোল না। কিন্তু তরণীতে যেতে যেতেই মনে পড়লো একে দেখেছেন বিগত নটিমুখ্যা কামাক্ষীর আলয়ে।

এই তো সেদিন প্রাক্তন-নটিমুখ্যা তাঁকে ডেকে নানা অভিযোগ করেছেন কন্যা বসন্তমঞ্জরীর বিরুদ্ধে। সে নৃত্য ত্যাগ করে কোন এক দরিদ্র বিটের গৃহিণী হতে চায়। সে ধনশুল্কা হতে চায় না— হতে চায় গুণশুল্কা। কামাক্ষী রুষ্ট কণ্ঠে বলেছিল,—

“অথচ সব কিছু শিখিয়েছি আমি! চতুঃষষ্টি কলার গূঢ় রহস্য। অনঙ্গবিদ্যার সব পাঠ। নৃত্য, সঙ্গীত, বীণাবাদন, চিত্র রচনা, ফুলের মালা গাঁথা, ঘর সাজানোর বিদ্যে……। প্রসিদ্ধ কলাবিদ্‌দের আনুকূল্যে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়েছি ওর যশ। গণৎকারদের দিয়ে প্রচার করেছি ওর সুলক্ষণ।

ঐ যে ইন্দ্রগুপ্তের মূখ ছেলে পুরগুপ্ত এসে বসে থাকত। অথচ অর্থের বেলায় নিরাসক্ত যোগী। তাকে তাড়ালুম কেমন করে ? শুধু পরিহাস করেই তো। কুন্তলের রাষ্ট্রদূতের এক অনুচরকে তো রীতিমত গঞ্জনা, অপমান, শেষ পর্য্যন্ত চৌরদ্ধরণিকের প্রহরীদের

সাহায্যে ভবনের বাইরে বার করে দিতে হোল। কিন্তু বারযোষা কেন গৃহস্থ বধূ হতে যাবে? ঐ তো নটিমুখ্যা গৃহস্থকন্যা হয়েও দিব্যি রাজপুরুষদের মনোরঞ্জন করছে।”

কামাক্ষী এখানটায় লক্ষ্য করেছিলেন কালিদাসের মুখের রক্তোচ্ছ্বাস। তারপর সান্ত্বনার ছলেই বলেছিলেন,—

“যার যা কাজ। ব্রহ্মার সময় থেকে চলে আসছে এই নিয়ম। মেনকা, রম্ভার তো ইন্দ্রাণী পার্বতী হবার দরকার নেই।”

এমন সময় সহসা সেখানে ক্ষপণক প্রবেশ করেছিলেন। কামাক্ষী যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ করছিলেন। আর ক্ষপণকের সঙ্গে ছিল একজন চৈনিক শ্রমণ। সেই শ্রমনই তাও।

এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে সব কালিদাসের।

অথচ আশ্চর্য্য! সেদিন কিছুই মনে হয়নি!

আজ মনে হচ্ছে যোগাযোগটি রহস্যময়। কামাক্ষীর ভবনে ক্ষপণক। এবং ক্ষপণকের সঙ্গী তাও। আবার ফা হিয়েনের সঙ্গী তাও। অথচ ফা হিয়েন ক্ষপণককে চেনেন না। চিনতে চান।

ফা হিয়েনের কথার মধ্যে এমন এক অলৌকিক স্পর্শ আজ তিনি পেয়েছেন যাতে তাঁর হৃদয় মন তৃপ্ত। কিন্তু, তাও?

নগরে পৌঁছেই শুনলেন মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের একটি দিব্য লক্ষণ-যুক্ত পুত্র হয়েছে। ঘরে ঘরে ফুলের মালা দোলান হচ্ছে। উজ্জয়িনী যেন হাসছে। মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত কোষাগার খুলে দিয়েছেন। বিপণিতে, বীথিকায় সুসজ্জিত নাগরিক-নাগরিকারা উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত শুরু করেছে। দেবমন্দিরে অর্ঘ্য দান চলেছে।

শরৎকাল।

চারিদিকে শুভ্রতা ভাসছে।

পৃথিবী শুভ্র হয়ে উঠেছে কাশ ফুলে। রজনী শুক্লা হয়ে উঠেছে দীধিতিকিরণে। নদীর জল অমল হয়ে উঠেছে শ্বেত বলাকায়।

সরোবর ধবল হয়ে উঠেছে সাদা কুমুদে। সপ্তচ্ছদ বৃক্ষে তুষার-কুসুম ভার—বনপ্রান্ত আবৃত সিতশেফালিকায় আর উপবন উল্লোল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায়।

কালিদাস মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে মহিষীর অঙ্কে পুত্রমুখ দেখলেন। আহা যেন মহোদধির কোলে পূর্ণ-ইন্দু। ধ্রুবস্বামিনী মৃদু হাসলেন। জননীর গর্ব তাঁর অধরে। নয়ন দুটি স্নেহে মেদুর।

কালিদাস বললেন,—"দেবী, পুত্র মুখ দেখে রত্ন দিতে হয়। সখা সে অভাব পূরণ করবেন। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কি আর দেব? তোমাকে দিই আমার শেষ সম্পদ এই তালপত্রের পুঁথি।"

ধ্রুবস্বামিনীর হাতে তুলে দিলেন কৌষিক বস্ত্রে মোড়া,—"কুমার-সম্ভব।"

চন্দ্রগুপ্ত হাসলেন—"তুমি আবার রত্ন দেবে কি হে? তুমি নিজেই তো এক রত্ন।" ধ্রুবস্বামিনীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—"প্রিয়ে, চন্দনসম্পুটে তুলে রেখ মহাকবির পাণ্ডুলিপি। তোমার আমার রাজ্য যখন থাকবে না তখনো মহাকবির রাজ্য থাকবে, এ কথা মনে রেখ।"

কবির দিকে তাকিয়ে বললেন,—

"কবি, তোমাকে বলি এটা তোমার শেষ সম্পদ নয়। আমার কীর্ত্তিকাহিনী এখনো শেষ হয় নি, সেটা স্মরণে রেখ। সবে তো বংশ রক্ষা হোল।"

সবাই হেসে উঠলেন।

সব থেকে জোরে হাসল পুষ্পবেণী।

সে একটি কটাক্ষ হেনে বলল,—"বিপ্রবর, এই বংশরক্ষার কাহিনী লিখে অমরত্ব পর্য্যন্ত পেতে পারেন। ভেবে দেখুন, এত বড় সুযোগ কি আর পাবেন?"

কালিদাস উজ্জ্বল চোখে তাকালেন এই মুখরার দিকে,—"বড় সুন্দর কথাটি বলেছ প্রিয় সখি। সত্যিই এবার গুপ্তবংশকে নিয়ে লিখব। এতদিন খণ্ড কাব্য লিখেছি। এবার লিখব মহাকাব্য।"

বিক্রম বললেন—"লেখ হে লেখ। ব্যাস বাল্মীকির মতন একটা লেখ দেখি। মনে আছে কর্ণাট মহিষীর বক্রোক্তি? নলিনে, পুলিনে আর বল্মীকে মাত্র তিনটি কবি সৃষ্টি হয়েছে। এবার যেন উজ্জয়িনীতে হয়।"

কালিদাস স্মিত হেসে বললেন,—"লিখব। সূর্য্যবংশের সঙ্গে তুলনীয় যে বংশের যশগৌরব তাকে নিয়ে লিখব না তো কাকে নিয়ে লিখব, বন্ধু? এই মহাকাব্য হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দান। এ মহাকাব্যের নাম হবে………"

ধ্রুবস্বামিনী মৃদু হেসে বললেন—"রঘুবংশ।"

ধীরে ধীরে শব্দটি উচ্চারণ করলেন কালিদাসও—"রঘুবংশ। চমৎকার।"

কয়েক লহমা মাত্র। বিক্রম সবেগে আলিঙ্গন করলেন কালিদাসকে। কণ্ঠের মরকত-মালা ঝুলিয়ে দিলেন কবিকণ্ঠে। কালিদাস মালাটি মাথায় ঠেকালেন। রাজকণ্ঠে পুনশ্চ বিন্যস্ত করে বললেন,—

"এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।"

তারপর ধ্রুবস্বামিনীর দিকে নীচু হয়ে অভিবাদন করে বললেন—"দেবী, অভাগাকে কিছু দান কর।"

ধ্রুবস্বামিনী কর্ণ হতে বর্হ খুলে কবির উষ্ণীষে বেঁধে দিলেন। চোখ দুটিতে তাঁর কৌতুকের স্নিগ্ধ আভা।

ভূতপক্ষের রাত্রি। কৃষ্ণ আকাশে শুধু তারাগুলি ঝক ঝক করছে। সংস্থাসর্পে জীবগুপ্ত বিষণ্ণ বদনে পদচারণা করছেন। প্রত্যন্ত প্রদেশের খবর শুভ নয়। মহামন্ত্রী চকিত হলেন,—

"কে?"

"আমি কল্লক।"

"কি সংবাদ?"

"কামাক্ষীর ভবনে আজ মন্ত্রণাসভা বসবে না।"

"কি করে জানলে ?"

"বিদুষী কামাক্ষীর অরালিক এবং আস্তরক দুজনে একই সংবাদ দিয়েছে।"

"উত্তম। আর কি সংবাদ ?"

"শোণ নদীর অন্তর্বর্তী ঔদক-দুর্গের নিকটের জঙ্গলে যে কিরাত গোষ্ঠী আছে তাদের প্রধান জানিয়ে গেছে, যে পরিব্রাজকের দল সেখানে ছিল সম্প্রতি তারা চলে গেছে।"

সহসা দূরে সঙ্গীতের সুর শোনা গেল।

"কে গায় ? প্রহরী।" জীবগুপ্ত হাতে তালি দিলেন।

প্রহরী আসতেই বললেন "গায়ককে ডেকে আন।"

গায়ক প্রবেশ করল।

সঙ্গে সঙ্গে কল্লক বিবর্ণ হয়ে গেল। সে মহামন্ত্রীকে বলল,—"আর্য্য, আমি যাই।"

"না।" জীবগুপ্তের কণ্ঠে দৃঢ় আদেশ। তারপর গায়কের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন,—"কি সংবাদ ?"

"ত্রিকোণ-বিহারে আজ বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে চীবর দান করা হবে শ্রমণ ফা-হিয়েন কে। ক্ষপণক ও কামাক্ষী উভয়েই সেখানে থাকবেন। ফা-হিয়েন অতঃপর মাতৃগুপ্তের পরিচয়-পত্র নিয়ে যাবেন তাম্রলিপ্তে। সেখানে কিছুকাল কাটাবেন।"

"বেশ। ঔদক দুর্গের খবর কি ?"

"সেখানে যে পরিব্রাজক দল ছিল তারা প্রচুর তৈল, শস্য, শর্করা, লবণ ও জ্বালানীকাঠ সংগ্রহ করেছে। মনে হয় তারা কোন সৈন্য বাহিনীর অগ্রগামী দল।"

"মিথ্যা কথা।" চেঁচিয়ে উঠলো কল্লক।

"সত্য।" গায়ক একবার তার দিকে চেয়ে মহামন্ত্রীর দিকে চাইল। তারপর বলে যেতে লাগল—"সেখানে তারা একটি জঙ্গল

দুর্গও গোপনে তৈরী করছে। এই সেই দুর্গের নক্সা।" একটি নক্সা সে মহামন্ত্রীর হাতে দিল।

কল্পক বিবর্ণ হয়ে গেল।

জীবগুপ্ত আড়চোখে তা লক্ষ্য করছিলেন।

একটি মুদ্রাপূর্ণ থলি গায়কের হাতে দিয়ে তাকে চলে যাবার ইঙ্গিত করলেন। তাঁর ঈশারায় দুজন অন্তঃপাল এসে কল্পককে ধরল। কল্পক সহসা উদরে হাত দিয়ে বসে পড়ল।

জীবগুপ্ত কঠিন চোখে তাকালেন তার দিকে। তারপর বললেন, —"কল্পক, মিথ্যাবাদী চর হঠাৎ উন্মাদ বা রোগী হবার ভাণ করে। কিন্তু জেনে রেখ মিথ্যা কথা বলে আমার কাছে রক্ষা পাবে না। ক্ষপণক তোমাকে কি কারণে এই মিথ্যা বলতে এখানে পাঠিয়েছে যদি না বল তবে তোমাকে এখনি বিষমূলীর রস পান করতে হবে।"

"আর্য্য, আমাকে ক্ষমা করুন। মার আমার মধ্যে প্রবেশ করেছিল। দোহাই আর্য্য, আমি সত্য কথা বলছি। আমাকে বিষমূলীর রস দেবেন না।"

"তবে বল। কিন্তু একটিও যদি মিথ্যা কথা বল তবে······"

"আর্য্য দোহাই আপনার। ফা-হিয়েন কাল প্রত্যূষে চলে যাবেন —তিনি সত্যই ধর্মশীল ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর একটি অনুচর, নাম 'তাও', এখানে থেকে যাবে। সম্ভবতঃ সে ক্ষপণকের বন্ধু। এখানে কিছুকাল থেকে সিংহল যাবে সে।"

"কেন?"

"সিংহল থেকে কাশ্মীর পর্য্যন্ত এক বৌদ্ধদল তৈরী করাই ক্ষপণকের সংকল্প।"

"মিথ্যা কথা"—চীৎকার করে উঠলেন জীবগুপ্ত।

কল্পক তোতলাতে লাগল। তার দৃষ্টি ছোট বড় হতে লাগল। সারা অঙ্গে স্বেদ।

"হ্যাঁ প্রভু, মিথ্যা কথা। না, না, সবটা নয়······"

"তবে কিসের জন্য বলছ? সব আবিল করে দিচ্ছ তার কারণ কি? প্রতিহারী এই মুহূর্তে এই সারমেয়টাকে জ্বলন্ত কুণ্ডে নিক্ষেপ কর।"

দুজন অন্তঃপাল কালান্তকের দূতের মত কল্লককে টেনে নিয়ে চলল। কল্লক চীৎকার করে উঠল—"ক্ষমা করুন অমাত্যবর। ভয়ে আমার মাথার ঠিক নেই।"

"প্রতিহারী, একে চিত্রভেক কারাগারে বন্দী করে রাখো।"

আর্তনাদ করে উঠল কল্লক। অন্ধকার, আধো পঙ্কিল সেই কারাগার। চারিদিকে মণ্ডুকেরা লাফাচ্ছে। তাদের বিষাক্ত লালায় যে দগদগে ঘায়ের সৃষ্টি হয় অপরাধীদের মৃত্যু তাতেই। ভয়াবহ সেই পরিণাম।

"না, না, মহামন্ত্রী, না। সত্য বলেছি সবই। শুধু শেষ কথাটি সত্য নয়। ক্ষপণক তাও-কে পাঠাচ্ছে সিংহলরাজের কাছে কোন গূঢ়লেখা দিয়ে।"

"সত্য?"

"সত্য।"

"উত্তম। তবু তুমি আজ বন্দী থাকবে। যদি এ সংবাদ সত্য হয় তবে কাল মুক্তি পাবে। প্রতিহারী একে নীচের প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখ।"

প্রহরী দুজনে কল্লককে নিয়ে চলল।

মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত বিভীষণ-বদনে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। মুষ্টিবদ্ধ করে আপন মনে বললেন,—"ক্ষপণক, তোমার ষড়যন্ত্র আমি মুহূর্তে ধ্বংস করে দিতে পারি। গুপ্তবংশের ধ্বংস দাঁড়িয়ে দেখব তেমন মহামন্ত্রী আমি নই। কিন্তু আরো কিছুকাল থাক। দেখি তোমার দৌড় কতদূর। জাল ফেলেছি। এবার ধীরে ধীরে জাল গুটোব। দেখি কে কে ধরা পড়ে?"

একটা ক্রূর হাসি ফুটে উঠল জীবগুপ্তের মুখে।

ভৃঙ্গার থেকে কিছুটা সুরা পান করলেন বিকৃত মুখে। তীব্র সুরা তরল আগুনের মত। কিন্তু মহামন্ত্রীর এ সুরা নইলে চলে না। মাধ্বী? কাদম্বী? ও সব তো ফুলের মধু।

কালিদাস প্রবেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে মুখোশ টেনে নিয়ে স্মিত মুখে তাকালেন জীবগুপ্ত। একটি মধুকণ্ঠ রণিত হয়ে উঠল—"আমাকে ডেকেছেন, মহামন্ত্রী?"

"হ্যাঁ, কালিদাস, বিশেষ প্রয়োজন বলেই তোমাকে রাত্রির এই তৃতীয় যামে ডেকে পাঠিয়েছি।" তারপর কাজের মানুষের মতই জীবগুপ্ত বিলম্ব না করে কাজের কথা পাড়লেন। "প্রত্যন্ত প্রদেশগুলির সংবাদ শুভ নয়। এ কয় দিন ধরে বিভিন্ন গূঢ় পুরুষের কাছ থেকে নানা ভাবে সংবাদ পেয়েছি। প্রব্রাজিকা, বিট, সৈরিন্ধ্রী, গন্ধবণিক, নাপিত, গায়ক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর থেকে যা শুনলাম তাতে মনে হয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের একবার রাজ্য পরিক্রমার প্রয়োজন আছে। সকলেই তাঁকে দেখতে চান। আমি বৃদ্ধ হয়েছি। তদুপরি উজ্জয়িনীতে একজন কাউকে থাকতে হবে। অতএব তুমি যদি তার সঙ্গে যাও তবে উত্তম হয়।"

"আরো তো অনেকে আছেন। অমরসিংহ, ধন্বন্তরী······"

"বাস্ বাস্।" মহামন্ত্রী হাত তুলে কালিদাসকে থামিয়ে দিলেন। তারপর গম্ভীর স্বরে বললেন,—

"কবি, তুমি মাতৃগুপ্তও বটে। বোঝ সবই। রাজ্যের প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে সর্বদাই ষড়যন্ত্র চলে। মহারাজা সমুদ্রগুপ্তের সময়েও চলত। একদিকে হূণদের চক্রান্ত চলেছে; অন্যদিকে একদল অসন্তুষ্ট মানুষ অন্তর্ভেদ ঘটাবার চেষ্টা করছে। ক্ষপণক শুনলাম কাশ্মীর থেকে সিংহল পর্যন্ত এক বিশাল বৌদ্ধ আন্দোলন শুরু করতে চায়।"

"সেটা কি ধর্মীয় আন্দোলন?"

"আপাতধর্মীয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে রাজনীতি।"

কালিদাস মৃদু হাসলেন,—"শাস্তার নীতির কি সুন্দর অনুসরণ!"

জীবগুপ্তও ক্ষোভের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন—"এ অবস্থায় আমি চাই তুমি আমার চক্ষুর চক্ষু ও কর্ণের কর্ণ হয়ে রাজার সঙ্গচর হও। তা ভিন্ন মহারাজ তোমাকে বিশ্বাস করেন।"

"বেশ।"

"আর একটি কথা। ফা-হিয়েন কালই চলে যাচ্ছেন! তাঁর অনুচরটি থেকে যাচ্ছে।"

"তাও ?"

"তুমি কি করে জানলে ?"

"ফা-হিয়েনের সঙ্গে সাক্ষাৎ কালে একে দেখেছি! কম কথা বলে—কিন্তু শোনে সবই। লোকটিকে তখনি আমার ভাল লাগে নি। আপনাকে তো এর কথা বলছিলাম।"

"হ্যাঁ বলেছিলে বটে। একেই তো নটি কামাক্ষীর গৃহেও দেখা গিয়েছিল ?"

"হ্যাঁ।"

"তার উপর সংস্থার দৃষ্টি থাকবে। আর ফা-হিয়েন…"

"ফা-হিয়েন প্রকৃত সাধুব্যক্তি। সত্যই একজন শুদ্ধশীল বৌদ্ধ। যদিও তিনি যখন প্রথম ক্ষপণকের বন্ধুত্ব চেয়েছিলেন আমার সন্দেহ হয়। কিন্তু অমরসিংহ বুদ্ধভদ্র প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হবার পর জেনেছি তিনি সত্যই অনুসন্ধিৎসু। তিনি যে অমরসিংহ বা বুদ্ধভদ্র বা জিনরত্নকে জানতেন না তার কারণ এঁরা তো ক্ষপণকের মতো বিহারবাসী দশশীলের অনুসরক নন। এঁরা গৃহী এবং পঞ্চশীলের অনুপন্থী। দেখুন না আমাকেও তিনি কবি কালিদাসরূপে জানেন না—জানেন মন্ত্রী মাতৃগুপ্তরূপে।"

জীবগুপ্ত মৃদু হাসলেন।

"কবি, শান্তিপর্বে আছে ভীষ্ম বলছেন রাজাদের ষড়দুর্গ রক্ষা করতে হয়। তার মধ্যে নরদুর্গ সর্বদা সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে হয়!

তোমার ফা-হিয়েন দশবলের উপাসক—আমরা সপ্তবলের। এমনিতেই হেরে আছি।"

কালিদাসও হাসলেন।

জীবগুপ্ত অতঃপর প্রশ্ন করলেন—"উত্তম। ফা-হিয়েনকে তাম্র-লিপ্তে পাঠাবাব কোন ব্যবস্থা করেছ?"

"হ্যাঁ. হেমধরেব পুত্র রত্নধরের পোতশ্রেণী তাম্রলিপ্তে যাচ্ছে। তাদেব সঙ্গেই পাঠাচ্ছি।"

"ভাল। রত্নধর কি আসবার সময় কিছু হস্তী আনতে পারে? কলিঙ্গ ও অঙ্গের হাতী চাই কিন্তু। সৌরাষ্ট্রের যে হাতীগুলো গত বার এনেছিলো সেগুলি একেবারে অধম।"

"কেন, মহামাত্য, দশার্ণের হাতী কি ভাল নয়?"

"মধ্যমবলী। কলিঙ্গ বা অঙ্গের মত উত্তমবলী নয়।"

"রত্নধরকে বলব।"

"আর একটি কথা ফা-হিয়েনেব সঙ্গে দু একজন ছাত্র দাও। তারাও অনুলিপি লিখুক।"

কালিদাস বলতে যাচ্ছিলেন. 'কেন সৌম্য?'

সহসা তাঁর মস্তকে খেলে গেল ইঙ্গিতটি। মহামন্ত্রী কপট ছাত্র পাঠাবার সঙ্কেত করেছেন। একটু হেসে অভিবাদন করে মৃদুকণ্ঠে বললেন,—"প্রয়োজন ছিল না।"

"অধিকন্তু ন দোষায়। বুঝেছ কালিদাস। রাজকার্যে কৌটিল্যই ভাল।"

তারপর মহামন্ত্রী হাততালি দিয়ে ডাকলেন কঞ্চুকীকে। বৃদ্ধ দণ্ডধর কঞ্চুকী প্রবেশ করল। চোখে সর্বদাই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি। জীবগুপ্ত প্রশ্ন করলেন,—

"কাল রাত্রে ছত্রধর. পাদুকাধর, তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী ও রথচালক কে ছিল?"

"ছত্রধর ছিল ক্ষেমবৃদ্ধি, পাদুকাধর সর্ব, তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী ছিল নন্দা, রথচালক ছিল দ্বৈমাতুর।"

"আজ ?"

"ছত্রধর থাকছে সোম, পাদুকাধর অনঙ্গ, তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী মন্দালিকা, রথচালক থাকছে ভৃঙ্গ।"

"আচ্ছা যাও।"

কঞ্চুকী প্রস্থান করল।

জীবগুপ্ত কালিদাসের দিকে ফিরে বললেন—"রাজঅন্তঃপুরের সব দায়িত্ব ওর উপর। যদিও জানি এখানে প্রতিটি লোক বহু বিশ্বাসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তবে নিযুক্ত হয়েছে তবু প্রতিরাত্রে তাদের পরিবর্তন করা হয়। কেন ? রাণীর শয়ন কক্ষেও রাজাকে হত্যা করা যেতে পারে। রাজা ভদ্রসেনকে তাঁর ভাই শয়ন কক্ষেই হত্যা করেছিলেন। রাজা কারূষকে তাঁর পুত্র মাতৃশয্যাতলে লুকিয়ে থেকে হত্যা করে। এদের কাউকে সাহায্য করেছিল পাদুকাধর—কাউকে বা তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী। কাউকে বা……কি হোল আবার তোমার ?"

কালিদাসের মুখে বেদনার রেখা ফুটে উঠেছিল।

বিকৃত মুখে তিনি বলে উঠলেন—"অসহ্য, অসহ্য, মহামন্ত্রী। মানুষ কেন মানুষকে ভালবাসতে পারে না ? কেন জান্তব সত্তাকে মানব সত্তা প্রশমিত করতে পারে না ?"

"পারে যে না এটাও তো সত্য ? আর একটা ক্রুর সত্য তবে প্রত্যক্ষ করে যাও। প্রতিহারী, মহানস থেকে প্রধান অরালিককে ডেকে পাঠাও।"

"জয় হোক মহামাত্যের"—প্রধান অরালিক এসে দাঁড়াল।

"এই নিয়ে তোমার দ্বিতীয়বার স্খলন হোল।" জীবগুপ্তের চিবুক কঠিন হয়ে গেল।

"প্রভু !" পাংশু বদনে বিভ্রান্ত চোখে তাকালো অরালিক।

"মনে আছে তোমার দধিতে কৃষ্ণনীল রেখা একবার দেখা গিয়েছিল ?"

"আজ্ঞে……" ভগ্নকণ্ঠে বলল অরালিক।

"এবার অন্নের বর্ণ ময়ূরকণ্ঠী ছিল। তোমার অন্ন পরীক্ষার সময় ক্রৌঞ্চপক্ষী ক্রন্দন করে ওঠে—চকোর পক্ষীর চোখ রক্তিম হয়ে যায়। আরো প্রমাণ চাও ?"

অরালিক কম্পিত হোল। তার বচন জড়গ্রস্ত। ললাটে স্বেদ।

জীবগুপ্ত তখন বললেন—"আমি জানি দোষ তোমার নয়। কিন্তু তুমি অত্যন্ত অমনোযোগী—তদুপরি তুমি আসবমত্ত হয়ে থাক। তুমি যদি আজই অনুসন্ধান করে প্রকৃত দোষীর সঠিক সংবাদ আমাকে দাও তবে এবারেও ক্ষমা পেতে পার। কিন্তু মনে রেখ তৃতীয়বার যদি……"

ঘূর্ণিত রক্তিম নয়নে জীবগুপ্ত অরালিকের দিকে তাকালেন। অরালিক প্রস্থান করল।

নৃসিংহগুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করলেন।

তাঁর মাথায় নানা পরিকল্পনা আছে ভাকাটকের সঙ্গে সংশ্রয় করতে হবে—মথুরার সঙ্গে বিগ্রহ। কুন্তল দেশে দ্বৈধীভাব আনা যায় কি না এইসব।

মহাসান্ধিবিগ্রহিককে দেখে কালিদাস উঠলেন,—"এইবার আমি চলি মহামন্ত্রী।"

কালিদাস মুক্ত আকাশের তলে এসে দাঁড়ালেন। গভীর ভাবে টেনে নিলেন নিশীথের শীতল বায়ু। আঃ কি আরাম। কি স্বস্তি! তারাগুলি তাঁর দিকে ঝক্ ঝক্ করে তাকাচ্ছে অপাপবিদ্ধা কুমারীর চোখের চাউনির মত। না, মানুষ ভাল—মানুষের উপর তাঁর বিশ্বাস আছে। অমঙ্গল যদি থাকেও তাকে দমন করতে হবে। নটরাজের পায়ের তলায় যেমন শিশুপাপ।

এবার বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে ভট্টিনীকে বোঝান কঠিন হোল। তিনি কেবলি বাধা দিতে লাগলেন। শেষে বললেন,—"তুমি তো যাচ্ছ ছেলেকে দেখবে কে ? সে যে ব্রাহ্মণসন্তান হয়েও অধ্যয়নে মন দেয়

না, কতগুলো পীঠমর্দ্দের সঙ্গে কেবল অক্ষক্রীড়া করে বেড়ায়। বলি, অক্ষ-হৃদয় জানলেই কি তার দিন চলবে?"

কালিদাস বললেন,—"কুটম্বিনী, তুমি আছ। নাথশর্মা আছে। প্রয়োজন হয় আচার্য্য কাশ্যপের আশ্রমে দিয়ে যাব—সেখানে থাকুক ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত।"

"সেই ব্যবস্থা কর তবে। এখানে সে দিবারাত্র দৌরাত্ম করছে।"

কালিদাস ডাকলেন,—"দেবীদাস।"

একটি শ্যামবর্ণ অষ্টমবর্ষীয় বালক এসে দাঁড়াল।

"তুমি অধ্যয়ন কর না কেন?"

"করি তো।"

"দেখি তোমার হস্তলিপি।"

তালপত্রে অঙ্কিত বিচিত্র লিপি দেখে কালিদাস হাসবেন কি কাঁদবেন বুঝলেন না। গম্ভীর ভাবে বললেন,—"এ কিছুই হয় নি। তোমাকে আচার্য্য কাশ্যপের আশ্রমে যেতে হবে। সেখানে ষোড়শ-বর্ষ পর্যন্ত থাকতে হবে। গুরু যা বলবেন তাই শুনবে। যা করতে বলবেন তাই করবে। যাও, প্রস্তুত হও।" দেবীদাস চলে গেল বটে, কিন্তু ক্ষোভে তার মুখ রক্তকৃষ্ণ হয়ে উঠেছে।

কালিদাস ভ্রূকুঞ্চিত করে পুত্রের গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বরাহমিহির দেবীদাসের যে জাতকপত্রটি করে দিয়েছিল সেটি খুলে একবার দেখলেন।

বৃশ্চিকলগ্নে নীচস্থ চন্দ্র—গুরুস্থানে নীচস্থ রাহু—ভাগ্যস্থানে নীচস্থ মঙ্গল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তাঁর।

এ পুত্রের কাছে কিছু আশা নেই। বরাহ তবু সান্ত্বনা দিয়েছেন—এর অর্থকষ্ট হবে না। রবি, শনি ও বৃহস্পতি তিনটি মহাগ্রহই স্বস্থানে থেকে একে সর্বদা রক্ষা করবে। কিন্তু কালিদাসও কিছু জ্যোতির্বিদ্যা জানেন। তিনি স্পষ্টই দেখলেন অপমান—অপবাদ—ও অপরাধে ভরা থাকবে এর জীবন। কালিদাসকে পরামর্শ দিয়েছিলেন বরাহ—

"এ পুত্র ত্যজ্য। যার দ্বারা পতন হয় না সেই তো অপত্য। একে ত্যাগ কর।"

কালিদাস করুণ হেসেছিলেন,—

"ভট্টিনীর আর সন্তান হবে না। ধন্বন্তরী বলে গেছেন।"

"অন্য ভার্য্যা গ্রহণ কর।"

কালিদাস হেসেছিলেন,—"আবার ভার্য্যা? বরাহ, আমার ভাগ্যে যদি এমন সংসার থেকে থাকে, ঈশ্বরের বিধানকে লঙ্ঘন করতে যাব কোন সাহসে?"

"মানুষ চেষ্টা করে।"

"মানুষের তাই কর্তব্য। কিন্তু পুত্র অর্থ অঙ্গজ। সে যদি দুষ্ট হয় তবে বুঝতে হবে আমার মধ্যেই তা ছিল। আর পৃথিবীই তো সদসতে মিশ্রিত। দিবা ও যামিনী শ্বেত ও কৃষ্ণ সূত্রে জীবন বুনছে। এ নিয়ে ক্রন্দনে কি লাভ?"

দশ

আবার পথ। কিন্তু এবার চতুরঙ্গবাহিনী চলেছে সঙ্গে। দেবশ্রী চন্দ্রগুপ্ত এখন হূণবিজয়ী গুপ্তকুলসম্রাট। আর মাতৃগুপ্ত তাঁর মন্ত্রী। প্রথমে তাঁরা গেলেন পশ্চিমে। লাট অঞ্চলের শকরাজ রুদ্রসিংহকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করে তার রাজ্য সংযুক্ত করা হোল গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে। অর্থাৎ পূর্ব সমুদ্র থেকে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হোল চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য। বণিকদের ব্যবসারও এতে সুবিধে হোল। তার পর তাঁরা গেলেন পূবে—বঙ্গ-সমতটের বিদ্রোহী সামন্তরাজদের শাসন করে এসে পৌছলেন তাম্রলিপ্তে। এখানে কিছুদিন অবসর যাপন করবেন এই স্থির হোল। কালিদাস পেটিকা থেকে আবার ভূর্জপত্র ও লেখনী বার করলেন।

চোখের উপর ভেসে উঠলো ধ্রুবস্বামিনীর রূপ। মণিবেদীতে রাজা চন্দ্রগুপ্ত—মৃগচর্মে ধ্রুবস্বামিনী। সেই শব্দটি মনে এল যেটি কুমার সম্ভবের অষ্টম সর্গ লিখেও লাগান নি। পার্বতীপরমেশ্বরৌ। এবার এ শব্দটি দিয়েই আরম্ভ করেছেন।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।

বন্ধুর চরিত্রও তাঁর সামনে ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে। ইনি আর মালবিকাগ্নিমিত্রের মত দক্ষিণ নায়ক নন। প্রেম যার বিলাস, সংসারে যে দায়হীন। এঁর শাস্ত্রে অকুণ্ঠিত বুদ্ধি—ধনুতে সজ্জিত মৌর্ব—সংবৃত মন্ত্র, গূঢ় ইঙ্গিতজ্ঞ।

প্রতিহারী সংবাদ দিল—"শুদ্ধশীল ফা-হিয়েন এসেছেন।"

"তাঁকে এইখানে নিয়ে এস।'

ফা-হিয়েন প্রবেশ করলেন,—"শাক্যমুনির জয় হোক। শীলবান, সংবাদ শুভ ?"

"আসুন, উপাসক আসুন। এখানে উপবেশন করুন, সৌম্য। আপনার অনুলিপির কাজ কেমন চলেছে ?"

"প্রায় শেষ। আপনার ছাত্র দুটি আমাকে বহু সাহায্য করেছে। কিন্তু মহামন্ত্রী ওদের এখুনি চলে যাবার নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আমি ওদের সাহায্যে মঞ্জুশ্রী, প্রজ্ঞাপারমিতা এবং অবলোকিতশ্বরের তিনটি মনুষ্যপ্রমাণ মূর্ত্তি চীনাংশুকে অঙ্কিত করে নিয়ে যাচ্ছি। সুতরাং ওরা যদি আরো কিছুদিন থাকবার অনুমতি পায়……"

"বেশ আমি সে কথা তাঁকে জানাব। এরা আপনার যাত্রা না করা পর্যন্ত থাকবে। কিন্তু আপনার সব আশা পূর্ণ হয়েছে তো ?"

"বুদ্ধ আপনার কল্যাণ করুন। হ্যাঁ, আমি যা চেয়েছি সব পেয়েছি। শাস্ত্রগুলির অনুলিপি পেয়েছি। মূর্তিগুলির রূপও আঁকা হয়ে এল। আজ দ্বাদশবর্ষ হোল দেশ ছেড়েছি। সঙ্গীদের মধ্যে কেউ ফিরে গেছে দেশে—কেউ পথশ্রমে মৃত্যুবরণ করেছে—কেউ ত্যাগ করেছে আমার সঙ্গ। তাই আমাকে ফিরে যেতেই হবে এই

সংগ্রহ নিয়ে। যে রাজার কাছ থেকে এসেছিলাম শুনলাম তিনি নেই। জানি না এ সংগ্রহের আদর হবে কি না। তবু নিয়ে যাব এই সংগ্রহ সেই পরম উপাসকদের জন্য যারা জানতে চাইবে সত্য কি।"

একটি পরম আভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো বৃদ্ধ শ্রমণের মুখ। সেই আভার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কালিদাস প্রশ্ন করলেন,—

"কি পেলেন আপনি যাতে এত তৃপ্তি? এত আনন্দ?"

"তৃষ্ণার শান্তি।"

"এরপর কি করবেন?"

"রেশমের উপর লিখে রাখব আমার ভ্রমণ কাহিনী। মরুভূমে, তুষারে, সমুদ্রে, পর্বতে, নগরে, জনপদে শুধু চলেছি—চলেছি। সহস্র সহস্র উপাসক দেখেছি—শত শত বিহার—লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ। মন্ত্রী, আর কোন প্রার্থনা নেই আমার।"

ফা-হিয়েন বিদায় নিলেন।

তাঁর বিদায় নেবার কয়েক মুহূর্ত পরে প্রবেশ করলো এক বৌদ্ধ ভিক্ষুনী। মণ্ডিত মস্তক। কিন্তু চোখের দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। কালিদাস সবিস্ময়ে বললেন,—"পুষ্পবেণী?"

ভিক্ষুণী তার জ্বালাভরা চোখ তুলে বলল,—"কবি, চিনতে পেরেছে তাহলে?"

কিন্তু কোথায় সেই মধুকণ্ঠ? কোথায় সেই বিলোল কটাক্ষ? কালিদাস প্রশ্ন করলেন—"তোমার এই বেশের কারণ?"

ভিক্ষুণী ম্লান হাসল। বলল,—'প্রব্রজ্যা নিয়েছি।'

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কারণটা বল।"

পুষ্পবেণীর চোখে জল টলটল করে উঠল।

"আমার সঙ্গে অমাত্যপুত্র চন্দ্রাংশুর বিবাহ স্থির ছিল।"

"জানি।"

"তিনি প্রব্রজ্যা নিয়েছেন।"

ভিক্ষুণীর চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

কালিদাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একবার উদভ্রান্তের মত চেঁচিয়ে উঠলেন,—"উপাসক।" পরক্ষণেই মনে পড়ল ফা-হিয়েন তো অনেকক্ষণ চলে গেছেন। কিন্তু যদি থাকতেন তবে কি উত্তর দিতেন এই সমস্যার? তিনি কি বলতেন,—"শীলবতী, তার তৃষ্ণা শেষ হয়ে গেছে। এখন তুমিও সে পথ গ্রহণ কর।"

হায়, তৃষ্ণাই যে আনন্দ।

তৃষ্ণা শেষে মুক্তি লাভ হতে পারে। কিন্তু আনন্দ? কখনই না। কালিদাস মানেন না এই অতিমিতির ধর্ম। তাহলে জীবনের প্রয়োজন কি? যখন মহামূল্য মানব-জন্ম লাভ হয়েছে, যখন ঈশ্বর দিয়েছে তোমাকে দৃষ্টি—শ্রবণ—স্বাদ—ঘ্রাণ—কামনা, সেই ইন্দ্রিয়োপলব্ধিকে ছেড়ে দেবে কেন মূর্খ? বায়ুভূত-নিরাশ্রয় হবার আগে একবার স্বাদগ্রহণ করবে না—এই কটু-তীব্র-মধুর-কষায় জীবনের? পুষ্পবেণীব দিকে তাকালেন সস্নেহে।

হায় প্রব্রাজিকা, অন্তরে অনন্ত বাসনা—বহিরঙ্গে ভিক্ষুনীর পীতবাস। কি সিদ্ধি তোমার হবে এতে? এই কি ধর্ম? দয়িতার অঙ্ক থেকে দয়িত—নাবীব কোল থেকে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া? কি ভয়ানক প্রতিক্রিয়া ঘটবে তাবপরে। বিহারগুলিতে যে কলঙ্ক স্পর্শ কবছে তা স্মরণ কবে কালিদাস শিহরিত হলেন। মুখে বললেন,—"ভদ্রে, শোক কোব না। চন্দ্রাংশুকে এখুনি ডেকে পাঠাচ্ছি।"

"এখন তাব নাম হয়েছে বুদ্ধদত্ত। তা ছাড়া তিনি বোধহয় এতক্ষণে ফা-হিয়েনের গ্রন্থাদির সঙ্গে পোতশ্রেণীতে উঠে পড়েছেন।"

"ফা-হিয়েন?" কালিদাসের ভ্রূ যুগ্ম হোল। মুখ থমথমে। পুষ্পবেণীও তাঁকে দেখে ভীত হলেন। কালিদাস ডাকলেন,—"ভাস্কর বর্মা।"

একজন সৈনিক পুরুষ এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালো।

"এখনি তরিক সোমপালকে নিয়ে যাও। উপাসক ফা-হিয়েনের

পোতশ্রেণী থেকে বুদ্ধদত্ত নামে যে ভিক্ষুক আছে তাকে নিয়ে আসবে।"

"পোতশ্রেণী আটক করা হবে কি?"

"যদি বুদ্ধদত্ত আসেন তবে আটক করা হবে না। না আসতে চাইলে তাই করতে হবে।" মহামন্ত্রীর জলদগম্ভীর স্বর পশ্চাৎ থেকে শোনা গেল।

কালিদাস সবিস্ময়ে পেছনে তাকালেন—"মহামন্ত্রী জীবগুপ্ত? আপনি এখানে কি করে এলেন?"

"কিছুক্ষণ পূর্বে। মাতৃগুপ্ত, তোমাকে কি বলেছিলাম? ফা-হিয়েনের উপর সংস্থার চোখ থাকবে।"

"তবে কি ফা-হিয়েন?"

"না। ফা-হিয়েনকে কতকগুলি চক্রী লোক ইচ্ছাপূরণে ব্যবহার করতে চেয়েছে মাত্র। তাঁর পাণ্ডিত্য—তাঁর নিরলস সাধনা এদের ছদ্মবেশ দিতে সাহায্য করেছে মাত্র।"

"আর চন্দ্রাংশু?"

"চন্দ্রাংশু ধনী পিতার মুগ্ধ সন্তান। তাকে হাত করে নিতে পারলে বিহারে অর্থ আসতে কোন বাধাই হবে না। এটা ধর্ম নয় কবি, ধর্মের বেশে রাজনীতি। পুত্রী, যাও, অন্তঃপুরে যাও। তোমার কোন ভয় নেই। আজ থেকে এক পক্ষের মধ্যে তোমাদের বিবাহ হবে। কিন্তু বৎসে, প্রণয়ের জন্য কি ধর্ম পরিবর্ত্তন করা তোমার সঙ্গত হয়েছে?"

কালিদাস বাধা দিলেন—"মহামন্ত্রী, কামার্ত্ত মানুষ অচেতন।"

জীবগুপ্ত একটু হাসলেন।

পুষ্পবেণী অভিবাদন করে প্রস্থান উদ্যত হলেন। কালিদাস ছদ্মশোকে বলে উঠলেন—"আহা, অমন ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদাম কি করে উৎপাটিত করলে সেই নিষ্ঠুরা কল্পক-বধূ?"

পুষ্পবেণী কটাক্ষ করল।

কালিদাস হাসলেন।

যাক্, এখনো সময় আছে।

"কালম্, কালম, মহাকালম্।

প্রভু, তোমার তো পূর্ণ সংসার। জয়শীলা পার্বতী গৃহিণী। শ্রীরূপিণী লক্ষ্মী—বাণীরূপিণী সরস্বতী দুই কন্যা। সিদ্ধিবান গণেশ্বর ও শক্তিমান কার্তিকেয় দুই পুত্র। অজস্র ঐশ্বর্য্যে শক্তিতে শোভিত হয়েও তুমি ভিক্ষাডনর। তবে?"

চন্দ্রাংশু এসে দাঁড়ালো। পেছনে ভাস্কর বর্মা।

জীবগুপ্ত একবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে নিলেন।

"চন্দ্রাংশু।"

"আমাকে বুদ্ধদত্ত বলে ডাকুন, শীলবান।"

"চন্দ্রাংশু নামে তোমার আপত্তি আছে?"

"আছে।"

"বেশ। শোন বুদ্ধদত্ত, আজ থেকে এক পক্ষ পরে তোমার বিবাহ হবে কুমারী পুষ্পবেণীর সঙ্গে।"

"তা কি করে হবে মহামন্ত্রী? আমি চীবর ধারণ করেছি।"

"চীবর? হুঁঃ। ওটা পরিবর্তন করে নিলেই হবে।"

"এত সহজ নয়।"

"একজন নারীকে প্রণয়মুগ্ধ করে তারপর তাকে ত্যাগ করা বোধহয় শীলবন্তদের পক্ষে খুব সহজ?"

"আমার তৃষ্ণা শেষ হয়ে গেছে।"

"কিন্তু তার তৃষ্ণা যদি শেষ না হয়ে থাকে?"

"আমি নিরুপায়।"

"কিন্তু শীলবান তোমরাই বল না, সর্বসত্ত্বা সুখী হোক?"

"নিশ্চয়।"

"তবে বল, এটাই কি সুখী করবার পথ?"

"মহামাত্য, তৃষ্ণা থাকলে সুখী হওয়া যায় না।"

"চমৎকার, চমৎকার। সুন্দর শিখেছ দেখছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি, চীন দেশে কি জন্যে যাচ্ছ? সেটা বুঝি তৃষ্ণাহীন রাজ্য?"

"সেখানে একটি বিহার স্থাপন করব।"

"এ দেশে নয় কেন?"

"এখানে তো অনেক আছে।"

"ও! তাই বুঝি বুদ্ধের রাজ্য বৃদ্ধি করতে চলেছ?"

"মহামন্ত্রী, যতই পরিহাস করুন একদিন দেখবেন সমগ্র পৃথিবী অমিতাভের রাজ্য হয়ে গেছে।"

"এটা বুঝি তৃষ্ণা নয়? এই বিহার স্থাপন করা—বৌদ্ধধর্ম প্রচার করা—অর্হৎ হওয়া—নির্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা করা?"

"না, মহামন্ত্রী, এইটেই শীলভদ্রদের পথ।" চন্দ্রাংশুর ঠোঁটে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

জীবগুপ্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন—আশা নেই। লোকটা ধর্মান্ধ হয়ে গেছে। ধর্মের জন্য প্রাণ দিতেও এখন কুণ্ঠিত হবে না। অথচ উজ্জয়িনীতে এর পিতা শ্রেষ্ঠী ধনসেন প্রায় উন্মত্ত হয়ে গেছেন একমাত্র পুত্রের প্রব্রজ্যা গ্রহণে। জননী ধীরাদেবী মুহু মুহু চেতনা হারাচ্ছেন। সমস্ত মানবিক সম্বন্ধগুলি ছিন্ন করে বৌদ্ধরা যে কি ভুল করছে! ভাবছেও না এর প্রতিক্রিয়া কত বিষ উদ্গীরণ করবে! এই কি শাস্তার মজ্ঝিম নিকায়? ভ্রান্ত। বুদ্ধের বচনগুলি পর্যন্ত মন দিয়ে পড়বার ধৈর্য্য নেই।

বুদ্ধদত্ত বলল—"এবার আমাকে বিদায় দিন।"

মহামন্ত্রীর দিকে কালিদাস উৎকণ্ঠ দৃষ্টিতে তাকালেন।

এক মুহূর্ত মাত্র।

জীবগুপ্ত জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন,—"না। তোমার বিরুদ্ধে দ্রোহিতার অভিযোগ আছে। ভাস্করবর্মা একে অবরোধে রাখ। ফা-হিয়েনের পোতশ্রেণী ছেড়ে দাও।"

"ফা হিয়েনের পোতশ্রেণী আমরা আটক করি নি মহামাত্য। এঁকে আমরা স্থলভাগেই পেয়েছিলাম।"

"বেশ। এখন এঁকে অবরোধে রাখ।"

প্রহরীদ্বয়ের সঙ্গে বুদ্ধদত্ত চলে গেল। উৎকণ্ঠ কালিদাসের দিকে তাকালেন জীবগুপ্ত। একটু শুষ্ক হাসি হাসলেন,—"সন্তান যখন বিদ্রোহ করে তার চেয়ে জীবনে কঠিন সমস্যা আর কিছু নেই, কবি। এটা তো মানবিকতার ক্ষেত্র। এখন কি করা উচিত বলে তুমি মনে কর?"

"কালের প্রতীক্ষা করা।"

"অশুভস্য কালহরণম? বেশ, দেখি চন্দ্রাংশুর মনের গতি আপনা থেকেই পরিবর্তিত হয় কিনা।" জীবগুপ্ত প্রস্থান করলেন।

কালিদাস নিজেকে বললেন—না, এ ধর্ম আমার নয়। নির্বাণ-মুক্তি আমার প্রয়োজন নেই। এ যেন সৈন্যদের মত নিয়মবদ্ধ হয়ে সমরচালনার মত ধর্মপ্রচার করা। শৈশবে বিদ্যা, যৌবনে বিষয়, বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি, অন্তে যোগদ্বারা তনু ত্যাগ এই মানুষের অভীপ্সা। এত বিরাট সৃষ্টি ঈশ্বর করেছেন—এত অফুরন্ত রস—কিছুই তার পান করবে না? তাঁর আদর্শ পদ্মপাণি বুদ্ধ নয়। তাঁর আদর্শ অর্দ্ধ-নারীশ্বর। তার একার্দ্ধ পুরুষ—অপরার্দ্ধ নারী। তার এক হাতে পাশ, অন্য হাতে রক্তপদ্ম, তৃতীয় হাতে নরকপাল, চতুর্থ হাতে শূল। ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র এবং নীলমণি। এ বড় সৃষ্টিতে মহাপ্রকৃতিকে বৌদ্ধরা কি করে বাদ দিলেন?

তালপত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে তিনি তাঁর আদর্শ পুরুষকে বর্ণনা করে লিখলেন,—আসমুদ্র ক্ষিতীশানা-মানাক রথ-বর্ত্মনাম। তিনিই রঘু—তিনিই সমুদ্রগুপ্ত।

"কবি।"

"মহারাজ!"

"শোন, গূঢ় মন্ত্রণা আছে।"

কালিদাস তাকালেন।

বিক্রম বললেন,—"নাগরাজকন্যা কুবেরনাগার সঙ্গে আমার পরিণয় সম্বন্ধ এসেছে। মহামন্ত্রী বলছেন, এ সম্বন্ধ স্থাপিত হলে দক্ষিণ দেশের অনেকটা আমাদের বশীভূত হয়। কারণ নাগ ও ভাকাটক রাজ্য আমাদের পক্ষে না থাকলে শক ও কুষাণদের বিরুদ্ধে অভিযান করা যাবে না। কদম্বরাজ কাকুস্থবর্মণও কন্যাদান করতে প্রস্তুত।"

কালিদাসের চোখে ভেসে উঠলো কয়েকটি ছবি—মৃগচর্মে আসীনা নীহারশুভ্র উত্তরীয়ে আবৃতা গৈরিকাভা উমার মত নববধূ ধ্রুবস্বামিনী,—পুত্রক্রোড়ে পরিণতশ্রী গণেশজননীর মত ধ্রুবাদেবী। তাকে ছেড়ে···

বিক্রম বুঝলেন। "কি ভাবছ? ধ্রুবার কথা?

এই দেখ মহামন্ত্রী জীবগুপ্তের কাছে লেখা তাঁর পত্র। ধ্রুবার সম্মতি আছে।"

কালিদাস হাসলেন।

মনে পড়লো তাঁর সৃষ্ট চরিত্র রাণী ঊশীনরীর প্রিয়-প্রসাদন ব্রত। প্রিয়তমের জন্য রমণী তার হৃদয়ও ছিন্ন করে দিতে পারে। মনে পড়লো আর এক ছিন্নমস্তার কথা। কিন্তু দেয় বলেই কি তা কাম্য?

মৃদু কণ্ঠে বললেন,—

"রাজনীতির প্রয়োজন?"

"নিশ্চয়। রাজনীতির জন্যই।"

"তবে আর কথার আবশ্যক কি?"

বিক্রম ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। কালিদাসের কথাটা তাঁর ভাল লাগল না। কবি মন্ত্রী হলে যা হয়। হৃদয়ের সঙ্গে রাজনীতি সব সময় একাকার করে ফেলে। গম্ভীর মুখে তাই রাজকর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন—"এবার থেকে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রার ব্যবহার করা হবে। খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন কিছুদিন বন্ধ

রাখতে হয়েছে। বনকর এবং বণিক পথের শুল্ক আদায়ও এবার কম হয়েছে। আর আমি চাই চৈত্যচিহ্নাঙ্কিত মুদ্রার পরিবর্তে গরুড় চিহ্ন-মুদ্রার প্রচলন।"

"তাই হবে।"

"আমি চাই সম্রাটের মুখ যেখানে থাকে সেখানে ব্যাঘ্রের বদলে থাকবে সিংহদমন রূপ।"

"সিংহ-বিক্রম?" কালিদাস স্মিত হাসলেন।

বিক্রমও হাসলেন—"হ্যাঁ, লাটদেশ জয় করলাম। একটা চিহ্ন থেকে যাক। কি বল?"

"উত্তম প্রস্তাব।"

মধ্যাহ্নের প্রহর বাজছে ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং…কালিদাস আপন কক্ষে প্রবেশ করলেন।

বাতায়ন দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া হু হু করে ঢুকে উতরোল করে দিচ্ছে সব কিছু। যেন কোন নর্তিনী হল্লীষক নৃত্যের ঘূর্ণাবর্ত রচনা করে চলেছে। কিছুক্ষণ তিনি তাকিয়ে রইলেন সেই অবাধ-অগাধ —অতল জলরাশির দিকে। প্রতিহারিণী পত্র দিয়ে গেল। পাটলীপুত্র থেকে বররুচি পত্রে জানিয়েছে, চন্দ্রাংশুর মতের পরিবর্তন হয়েছে। পুষ্পবেণীকে বিবাহ করে পাটলীপুত্রে সে ব্যবসা শুরু করেছে। মালবী মাগধী হয়েছে। তার মুণ্ডিত মস্তক থেকে দ্রুত কেশ উদ্গত হয়ে স্কন্ধ পর্যন্ত নেমেছে ধন্বন্তরীর কৃতিত্বে। কালিদাসের চোখে কৌতুক ফুটে উঠল। না, তিনি বলবেন না বুদ্ধের মত, সবাই সুখী হোক। তিনি বলবেন, আনন্দিত হোক—সবাই নন্দিত হোক।

রঘুবংশের খসড়া খুলে ধরলেন। রাজা দিলীপকে আঁকছেন প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মত করে আর রাণী সুদক্ষিণার মত করে কুমারদেবীকে। আকাশ যেমন অত্রিমুনির নয়নোত্থিত তেজচন্দ্রমাকে গ্রহণ করেছিলেন —সুরধুনী যেমন রুদ্রতেজ ষড়াননকে গ্রহণ করেন—কুমারদেবী তেমনি

চন্দ্রগুপ্তের তেজস্বরূপ কুমার সমুদ্রগুপ্তকে গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় সর্গে রাণী সুদক্ষিণার দৌহৃদলক্ষণ লিখতে গিয়ে কিন্তু মাগধীধ্রুব-স্বামিনীর ছবিই বার বার ছায়া ফেলতে লাগল। কালিদাস নিজেকেই শাসন করলেন,—মা চাপলায়েতি। চপল হোয়ো না। চতুর্থ সর্গ, রঘুর দিগ্বিজয়। অর্থাৎ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়।

মনে হোল সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্ণনা তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রে করেছিলেন। রাজঅন্তঃপুরকে কিছুটা পরিহাস করেছিলেন যৌবন-চাপল্যে। প্রেম যেখানে খেলা—নায়ক যেখানে দক্ষিণ অর্থাৎ ভদ্র কিন্তু দায়িত্বহীন—আর নায়িকা মাত্র মধুরা। না, বিক্রমাদিত্যের চরিত্রের পূর্ণতা সেখানে হয় নি। বরং কতকটা ফুটেছে পুরুরবার বিরহে। কিন্তু উর্বশী কে? সেই স্বৈরিণী মাধবী?

একটা তীক্ষ্ণ কশাঘাত যেন পড়লো কালিদাসের মনের পৃষ্ঠে। না, না, না।

ঠিক করলেন একটি নতুন চরিত্রের জন্ম দেবেন তিনি অজ চরিত্রে। অজ ও ইন্দুমতী। আহা, যেন কপোত-কপোতী। বিদর্ভকন্যা, ভোজরাজভগিনী মহিষী ইন্দুমতী যেন ধ্রুবস্বামিনী। ধ্রুবার মতই তিনি গৃহিণী-সচিব-সখী-প্রিয়শিষ্যা-ললিতকলাভিজ্ঞা। ইন্দুমতীর স্বয়ংবর চিত্রটি কালিদাস আঁকলেন তনুমনপ্রাণ দিয়ে।

সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ
যং যং ব্যতিয়ায় পতিম্বরাসা
নরেন্দ্র মার্গ ট্ট ইবং প্রপেদে
বিবর্ণভাবং স স ভূমিপালঃ।

ইন্দুমতী সঞ্চারিণী দীপশিখার মত এক এক রাজার কাছে যাচ্ছেন। তাঁদের মুখ আলোকিত হয়ে উঠছে। তিনি যখন তাঁদের ত্যাগ করে অন্য রাজার দিকে চলে যাচ্ছেন, সেই সেই নরেন্দ্রের মুখ অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।

দীপশিখার দৃশ্যটি আঁকতে আঁকতে প্রসন্ন হয়ে উঠলেন কালিদাস।

সহসা দূর স্মৃতির মত কে এসে করাঘাত করলো তাঁর হৃদয়ে? এই সুন্দর উপমাটি তিনি কোথা থেকে চয়ন করলেন? বাল্মীকি? না, তা তো নয়। ঠিক মনে পড়ছে না।

ভুলে যাওয়া স্বপ্নের মত টুকরো টুকরো ছবি ভেসে এল। তারপব জুড়ে এক হয়ে গেল। মনে পড়েছে। সঞ্চারিণী দীপশিখার মত মাধবী জ্বালিয়ে তুলেছিল যেদিন শত দীপ—সহস্র দীপ—লক্ষ দীপ। অন্ধকার আর আলো। নাকি আলোই অন্ধকার?

দিনের পর দিন কাটছে এখানে বিশ্রামে। বর্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে। লিখে ফেললেন সপ্তম সর্গে বিবাহ—অষ্টম সর্গে দশরথরূপী কুমারগুপ্তের জন্ম কথা। অনেকখানি স্নেহ ধারায় ডুবিয়ে সেটি লিখলেন।

নৃসিংহগুপ্তের কাছে খবর পেল মাধবী মহারাজচন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেছেন নাগকন্যা কুবের-নাগাকে। মাধবী চমকালো। কেন? ধ্রুবস্বামিনীর কি ত্রুটি পেলেন? পুত্রবতী রমণীরও স্থান নেই রাজার হৃদয়ে?

নৃসিংহগুপ্ত বললেন,—"রাজকার্য বড় কঠিন ধর্ম, প্রিয়ে। স্বয়ং রামচন্দ্র কি করেছিলেন মনে নেই?"

মাধবী তার ধনুকের মত ভুরু বাঁকিয়ে বললে—"নিষ্ঠুর পুরুষ। কিছুতেই তার হৃদয় পাওয়া যায় না।'

কিন্তু সারা অপরাহ্ণই তার গেল ভাবনা ভেবে। কালিদাস কী করলেন? তিনি কেন বাধা দিলেন না? তিনি তো ধ্রুবা দেবীর প্রিয়তম অনুচর। মনে মনে একথা বলতে বলতে সকোপে ওষ্ঠাধর চেপে ধরলো দাঁত দিয়ে। ওষ্ঠ কেটে রক্ত ঝরে পড়লো।

কিন্তু মনে মনে সে যেন একটু প্রফুল্লই হোল। তাহলে তার যৌবন-লালিত্য ব্যর্থ নয়? পুরুষেরই এই রীতি! নব নব পুষ্পে মধুকরবৃত্তি!

কিন্তু মাধবী তখন জানতো না—নেপথ্যে বিধাতাও বুনছেন তার অদৃষ্ট। বেশীক্ষণ সে ভাবনায় মন দিতে পারল না। আছে বিদুষী কামাক্ষীর গৃহে·সোমপানক উৎসব। মন্ত্রী-পরিষদের অনেকেই সেখানে যাবেন। মাধবী খুব মন দিয়ে নির্বাচন করল সে দিনের বসন ভূষণ। প্রথম হেমন্তের কুহেলীর রঙে মিলিয়ে নিল অঙ্গপট্ট; গায়ের ওড়না রাত্রি-নীল। তাতে ছোট ছোট তারার মত রূপোর ফুল। আপাত আমন্ত্রণের ভেতরে ছিল রাজপুরুষদের গূঢ় মন্ত্রণা। তাই নৃসিংহগুপ্ত মন দিতে পারছিলেন না মাধবীর দিকে। তাঁর মন পড়েছিল দক্ষিণাপথের রাজদূতের কাছে। বুঝে মাধবী এক সময় চলে এল অলিন্দে। আর সেখানেই প্রথম দেখা······

উদ্যানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন পুরগুপ্ত। চন্দ্রগুপ্তের খুল্লতাত-পুত্র। সম্প্রতি এসেছেন পাটলীপুত্র থেকে। অপূর্ব সুন্দর চেহারা। যেন ধরায় আবির্ভূত দ্বিতীয় মদন। মাধবীর মনে হোল যেন তরুণ বিক্রম দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু বড় লাজুক পুরগুপ্ত। মাধবীকে দেখে অভিবাদন করতে গিয়ে সহসা ফেলে দিলেন কাশ্মীরি সুরা তাঁর অঙ্গপট্টে। কুয়াশার উপর লালমেঘের মত চিহ্ন জেগে উঠল। নৃসিংহগুপ্ত আসছিলেন। তিনি বিলাপ করে উঠলেন—"আহা, করলে কি? এমন মহার্ঘ অংশুক নষ্ট হোল?"

মাধবীর কিন্তু মনে হোল এটি সুলক্ষণ। হঠাৎ যেন মনের কলস পূর্ণ হয়ে উঠলো সুধায়। কত কাল পরে? কত যুগের ওপার থেকে বয়ে এল সেই পুণ্য প্রণয়ের ধারা?

বসন্তমঞ্জরীর নাচ শেষ হবার পর পুরগুপ্ত সহসা এসে বললেন,—"ভদ্রে, আপনার হল্লীষক নৃত্যটি দেখবার ইচ্ছে করি।"

মাধবী হাসলেন। বুঝলেন এই লাজুক মানুষটি অন্যের অনুরোধে পড়ে এ কথা বলছে। তিনি তাঁকে আহ্বান জানালেন সন্ধ্যার আরতি নৃত্য দেখবার জন্য। মগধ থেকে সবে এসেছেন তিনি উজ্জয়িনীতে। এখানের অনেক রীতিই তাঁর জানা নেই। নইলে এমন অনুরোধ

করতেন না। গৃহকর্ত্রী অনুরোধ না জানালে অতিথি কি সহসা নৃত্যগীত দেখাতে বা শোনাতে পারে ?

মাধবীর জীবনে ফিরে এল যেন সেই প্রথম যৌবনের দিনগুলি। সেই চুপে চুপে এসে শুধু চোখে চোখে চাওয়া। বহুজনতার মাঝে একলা হবার উদগ্রতা। ফিরে এল জীবনে জ্যোৎস্না রাত্রের মাধুর্য—কুঞ্জবনে অলস প্রহর কাটানো। কত হাসি—কত কথা—কত গান। নিরর্থক আলাপ শুধু কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য। পুরগুপ্ত আর মাধবী। মাধবী আর পুরগুপ্ত।

নৃসিংহগুপ্ত পরিহাস করলেন মাধবীকে,—"শেষে বালক নিয়ে খেলছ মাধবী ?"

বাস্তবিকই তাই। পুরুগুপ্তের তরুণ বয়স। মাধবী অভিজ্ঞা যুবতী। কিন্তু মীনকেতন কবে কার দিকে শর নিক্ষেপ করেন তার কি ঠিক আছে ?

সহসা একদিন অসুস্থা বোধ করল মাধবী। রাজবৈদ্য ধন্বন্তরীর শিষ্যা পরিব্রাজিকা বুদ্ধরক্ষিতা এসে পরীক্ষা করে যে কথা জানালেন তাতে মাধবীর অন্তর সুখে পূর্ণ হয়ে গেল। মাধবী সসত্ত্বা। রক্ত-অশ্রু-ভালোবাসা ছাড়া কি নতুন জন্ম হয় ?

বসন্তের প্রারম্ভ পর্যন্ত তবু মাধবী সন্ধ্যারতির সময়ে নাচল। কিন্তু তারপর আর নয়। বস ্মঞ্জরীকে খবর পাঠাল সে নৃসিংহগুপ্তকে দিয়ে। বসন্তমঞ্জরীকে নৃসিংহগুপ্ত সোহাগ করে করে ডাকতেন—'পিয়সহি।'

তাই মাধবীও ডাকতো।

দুজনের মধ্যে একদা যে তিক্ততা জেগেছিল তা ঝরে গিয়েছিল কবে। বসন্তমঞ্জরীর স্বভাবে ছিল একটা মাধুর্য যা তার মায়ের মধ্যে ছিল না। কিন্তু কামাক্ষী সং সময় প্রভাবিত করে রাখতো তাকে। তারি একটি ফল ফলেছিল। রাজদূতেরা এই মা ও মেয়েকে ঠিক বিশ্বাস করতে চাইতেন না। কামাক্ষীর সঙ্গে ক্ষপণকের

অন্তরঙ্গতাকেও সন্দেহের চোখে দেখতেন অনেকে। কেউ কেউ বলতেন কামাক্ষী মন্ত্রী জীবগুপ্তের চর। মোটের উপর একটা সন্দেহের কালোছায়া লেগেই ছিল সকলের মনে। তাই শেষ পর্যন্ত বসন্তমঞ্জরী নটিমুখ্যা হতে চাইল না।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর আর চৈত্র উৎসব হয় নি।

আর হয় নি নৃত্য প্রতিযোগিতা।

শেষ পর্যন্ত আচার্য্য কামরাজ নিয়ে এলেন তাঁর একটি শিষ্যাকে। নাম রূপপালী। নৃসিংহগুপ্ত বললেন মাধবীকে,—"একে তৈরী করে দাও। যাতে তোমার মত উজ্জয়িনীর ভূষণ হয়ে ওঠে।"

মাধবী হাসলো।

"তাই হবে।"

অম্বুজার মত এই কন্যাটিকে মাধবী প্রথমেই ভালবেসে ফেলল। প্রথম সন্ধ্যারতির দিনে নিজে হাতে প্রসাধন করে দিল তাকে। পরিয়ে দিল চীনাংশুক। চন্দনের অলকা তিলকা এঁকে দিল ললাটে। গুরু ঈশানেশ্বরের মতই মাধবী তাকে শেখাত বিচিত্র নৃত্যছন্দ। মাধবীর সম্পুটিকাগুলিতে ছিল কত না বর্ণের অঙ্গপট্ট, কঞ্চুলিকা, উত্তরীয়। রক্ত, নীল, হরিৎ, কপিশা, পাটল। মাধবী সেগুলি দিয়ে এক এক দিন অপূর্ব এক এক ভূষায় সাজাতো তাকে! রূপপালী সত্যই অপূর্ব নর্তকী। ধীরে ধীরে শিখে নিতে লাগলো সেই ষোড়শীবিদ্যা।

এদিকে প্রসবের দিন ঘনিয়ে এল। মাধবীর মনে অমিত সুখ। সে নানা রংয়ের রেশমী সূতোয় সাজিয়েছে একটি দোলনা। একটি কক্ষে ওষধি। পরিব্রাজিকা বুদ্ধরক্ষিতা কয়েক দিন আগেই এলেন। তিনদিন তিন রাত্রি অসীম যন্ত্রণার সমুদ্র সন্তরণ করে মাধবী পুত্র পেল।

পুত্র!

অর্দ্ধচেতনার মধ্যেও মাধবীর মন আনন্দে দুলে উঠলো।

পুত্র।

পুরগুপ্ত এসে সিংহলী মুক্তার একছড়া হার পরিয়ে দিলেন মাধবীকে। বড় সুখে কাটলো কয়েকটা দিন। তারপর? খবর এল মহাসান্ধিবিগ্রহিক এবং পুরগুপ্তকে যেতে হবে নৌবাহিনী নিয়ে সমতটে। হূণ আক্রমণের উদ্যোগ পর্ব শুরু হবে। যাত্রার আগের দিন নৃসিংহগুপ্ত এলেন।

মাধবী একটু লজ্জা বোধ করলেন। সকাল বেলাকার চাঁদের মতো তখনো তাঁর শীর্ণ জ্যোতি।

নৃসিংহগুপ্ত সস্নেহে মাধবীর কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন,—

"পৌণ্ড্রবর্দ্ধিনী, তোমার কোন অপরাধই আমার কাছে অপরাধ নয়। আমি যতক্ষণ জীবিত থাকব, তোমার বন্ধু থাকব, এটা জেনো।" মাধবীর নিদ্রিত পুত্রের দোলনার কাছে গিয়ে তিনি কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। তারপর অঙ্গবস্ত্র থেকে বাঁশী বার করে বাজালেন কিছুক্ষণ। মাধবী বিস্মিত। এই কূটনীতিকের শিল্পকলায় আগ্রহ তিনিও দেখেন নি। মাধবীর হাত থেকে মাধ্বী-পূর্ণ পানপাত্র তুলে নিয়ে বললেন,— "প্রিয়ে, তোমার পুত্র যখন বড় হবে তাকে জানিও আমি তাকে বাঁশী শুনিয়েছিলাম।"

মাধবীর বিস্ময় শেষ হয় নি,—"কেন? আপনি নিজেই তো সে কথা বলতে পারেন।"

নৃসিংহগুপ্ত হাসলেন। তারপর মাধ্বীটুকু পান শেষ করে বললেন— "যদি মহাকাল করেন।"

ঠিক একমাস পরে খবর এল হূণযুদ্ধে জয়লাভ করেছেন বিক্রমাদিত্য। কিন্তু একটি মহার্ঘ্যরত্ন খসে পড়েছে তাঁর মুকুট থেকে। যুদ্ধক্ষেত্রে অপূর্ব বীরত্ব দেখিয়ে প্রাণ দিয়েছেন নৃসিংহগুপ্ত।

কিন্তু মাধবীর জীবনে প্রেমের আসন শূন্য হয়ে যায় নি। সে জননী হয়েছে আর লাভ করেছে পুরগুপ্তকে। পুরগুপ্ত তাকে স্ত্রী না

করেও দিয়েছে স্ত্রীর সম্মান। তার পুত্রকে গ্রহণ করেছে স্বীয় পুত্র বলে। দিয়েছে বংশের নামে নাম—কুমার মঘবাগুপ্ত। হ্যাঁ, ইন্দ্রের মত তেজস্বী হবে এই পুত্র। মাধবীরও তাই আশা। সে বৎসরটি যেন সুখে দুঃখে মেশা। যত সুখ তত দুঃখ। রাজা বিক্রমের এক বিশেষ দূত বহন করে এনেছে মাধবীর জন্য একটি নবরত্নখচিত পদ্মকোরক। তাহলে মহারাজ মাধবীকে ভোলেন নি?

সেইদিনই সন্ধ্যায় সারস্বত-ভবনের এক নৃত্যপ্রদর্শনীতে ঘটল উপদ্রব। মাধবীর নাচের সময় ধিক্কার দিয়ে উঠল একদল পীঠমর্দ্দ—"প্রাচীনা, প্রাচীনা।"

দেবরাত হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—"রে অর্বাচীনের দল।"

একটা সোরগোল বেধে উঠল। মাধবী থামাতে চাইল দেবরাতকে। চুপ, চুপ, চুপ। বোঝাই তো যাচ্ছে কোথাও একটা চাপা ষড়যন্ত্র চলেছে। কারা এর মূলে তাও আন্দাজ করা যায় বৈকি। এই তো, রূপপালীর অঙ্গে চীনাংশুক দেখে কামাক্ষী নাকি জানিয়েছিল মহামন্ত্রীকে মাধবী ও কালিদাস চীনসম্রাটের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করছে।

পরের দিন প্রভাতে অমরসিংহ ও ধন্বন্তরী এলেন মাধবীর ভবনে। দুজনেই জানালেন আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হচ্ছে। মহারাজ এখন প্রত্যন্ত প্রদেশ পরিক্রমা করছেন। বৃদ্ধ জীবগুপ্তের দক্ষিণ হস্ত নৃসিংহগুপ্ত অকালে প্রাণ হারিয়েছেন। রাণী ধ্রুবস্বামিনী মুমূর্ষু। আবার রাণী কুবেরনাগা আসন্নপ্রসবা। অতএব ষড়যন্ত্রীদের অমোঘ সুযোগ।

"মুমূর্ষু?" চমকে উঠলো মাধবী।

"হ্যাঁ। তিনি আর কয়েক দণ্ড মাত্র আছেন।" ধন্বন্তরী জানালেন ম্লান মুখে।

"মহারাজকে সংবাদ পাঠান হয় নি?"

"প্রায় একমাস আগে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তাঁকে ঠিক

ধরা যাচ্ছে না। মানে এই লাট দেশে আছেন, তার পরদিনই চলে গেলেন হয়তো পাটলীপুত্রে। সেখানে দু-দিন থাকতে না থাকতেই চলে গেলেন সমতটে। দূত কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছে না।" ধন্বন্তরী বিষণ্ণ কণ্ঠে বললেন।

অমরসিংহ বললেন,—"দুঃখের বিষয় ঘটকর্পরও কিছু না বুঝে ষড়যন্ত্রীদের খপ্পরে পড়ে গেছে। শুনেছ তো সেদিন স্বারস্বত-ভবনে কালিদাসের নতুন কাব্য রঘুবংশ পড়া হোল, সমবেত সবাই বললেন সাধু, সাধু। বররুচির বন্ধু পাণিনির শিষ্য মল্লিনাথ তো শুনে মুগ্ধ। তিনি বললেন,—কালিদাসের কাব্য সবাই বোঝে না, তা বোঝে এক কালিদাস ও তাঁর সরস্বতী। আর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। তিনি আরো বললেন—কালিদাসের কাব্যের দুর্ব্যাখ্যায় বিষমূর্ছিতা ভারতীকে সঞ্জীবিত করবার জন্য তিনি একটি সঞ্জীবনী টীকা লিখবেন। তা শুনে ঘটকর্পর ও শঙ্কু মুখ বেঁকালেন। ঘটকর্পর বলে উঠলেন,—

রঘুরপি কাব্যং তদপি চ পাঠ্যম
তস্য চ টীকা, সাপি চ পাঠ্যা।

বেচারী মল্লিনাথ—অপ্রস্তুত। নতুন এসেছে সবে পাটলীপুত্র থেকে। এখানের গোষ্ঠীবিবাদ তার জানা নেই।"

ধন্বন্তরী হাসলেন—"কি জান বন্ধু, বৈদর্ভীরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কালিদাস। অলঙ্কারকে যারা রসের উপরে স্থান দেয়—বক্রতাকেই যারা কাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপ মনে করে, কালিদাসকে তারা বুঝবে কি করে?"

অমরসিংহ বললেন—"তা বটে। ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা বিশ্লেষণের উপরে। কালিদাসের কাব্যে গ্রামীণ সারল্য বা নাগরিক অতিমার্জনা কোনটাই নেই। নেই কোন আতিশয্য। শিপ্রা নদীর স্রোতের মত স্বচ্ছন্দ তার গতি। অথচ যদি লক্ষ্য কর তবে দেখবে রঘুবংশ তাঁকে মহাকবি করে তুলেছে। বিশ রকমের ছন্দ আছে সেখানে—অনুষ্টুপ, ইন্দ্রবজ্রা, বৈতালীয়, রথোদ্ধতা, মত্তময়ূর, বসন্ততিলক, মালিনী……"

"মালিনী ?" মাধবী চমকিয়ে উঠলো।

"হ্যাঁ মালিনী! কত আর নাম করব ?"

মালিনী—মালিনী—মালিনী মাধবী। নিশান্তের সুখস্বপ্নের মত সে সব দিন! আর কি ফিরে আসবে? মাধবী তো ভেবেছিল কালিদাস তাকে বিস্মৃত হয়েছেন। কুমারসম্ভব লিখে লিখে প্রত্যহ কবি যেতেন ধ্রুবস্বামিনীকে শোনাতে। মাধবী শুনে বিদীর্ণ হয়ে যেত। শুনেছিল সে 'কুমারসম্ভব' পট্টমহাদেবীর জন্য বিশেষ করে লেখা হচ্ছে। মাধবীর তাতে কোন স্থানই নেই।

নিজেকেই নিজে তিরস্কার করল মাধবী, 'ওরে রমণীর মন, কেন মিথ্যে গর্ব করিস ? মালিনী যে সংস্কৃত ছন্দও।'

রাত্রির মধ্যযামে দুটি সংবাদ একত্রে এসে তাম্রলিপ্তে পৌঁছল। রাণী কুবেরনাগার একটি কন্যাসন্তান হয়েছে।

রাণী ধ্রুবস্বামিনী ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

একটি জন্ম, অপরটি মৃত্যু। একটি সুখ, অপরটি শোক। কালিদাস বিচলিত হলেন। কোন খবরটি আগে দেবেন ? কোনটির কি প্রতিক্রিয়া হবে? যোগাভ্যাসে বিশ্বাসী হয়েও আজো মানুষের আনন্দ বেদনা তাঁকে আন্দোলিত করে কেন? রাজসমক্ষে গিয়ে যখন তিনি পৌঁছলেন, দেখলেন বিক্রম সন্নিধানে ভাকাটক রাজদূত। কালিদাস সূত্র পেয়ে গেলেন।

"মহারাজের জয় হোক। এই মাত্র নাগরাজ্য থেকে সংবাদ এসেছে মহারাণী কুবেরনাগা একটি সর্বসুলক্ষণা কন্যার জননী হয়েছেন।"

"তাই নাকি ?" হর্ষযুক্ত হলেন বিক্রমাদিত্য। চিন্তার রেখা ঘুচে গেল তাঁর কপাল থেকে। তবে আর ভাবনা নেই।

"দূত, তুমি রাজাকে গিয়ে বোল মহাভৈরবের কৃপায় রাজকুমার রুদ্রসেনের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ স্থির করলাম। ঈশ্বর করুন, উভয়

রাজ্যের মধ্যে মৈত্রীসম্বন্ধ স্থাপিত হোক। তিনি সম্মতি দান করলেই আমরা বিবাহ-পত্র স্থির করব।"

"যথা আজ্ঞা রাজন। কন্যার কি নাম?"

"কন্যার নাম কি হবে কালিদাস?"

"এই কন্যা হতে গুপ্তবংশের যশোপ্রভা বৃদ্ধি হবে লিখেছেন বরাহ। মহারাজ, এই কন্যার নাম রাখুন প্রভাবতী।"

দূতের দিকে তাকিয়ে বিক্রম বললেন,—"লিখে নিন, কুমারী প্রভাবতী গুপ্তা।"

দূত অভিবাদন শেষ করে বিদায় নিলেন।

বিক্রম প্রফুল্লমুখে কালিদাসের দিকে তাকিয়ে বললেন,—

"শুভ সংবাদের জন্য তোমাকে কি দেব মন্ত্রী?',

কালিদাস চুপ করে রইলেন। তাঁর শোকাতুর ভাব বিক্রমের দৃষ্টি এড়াল না।

"কি হয়েছে কালিদাস?"

গূঢ়বাষ্পাকুল কণ্ঠে কালিদাস বললেন,—"একটি অশুভ সংবাদ আছে, সখা।"

"অশুভ?"

"পট্টমহাদেবী ধ্রুবস্বামিনী ইহলোক ত্যাগ করেছেন।"

"ধ্রু-বা-নেই?" কেটে কেটে কথাগুলি বললেন চন্দ্রগুপ্ত।

কিন্তু তার অন্তর্গূঢ় ক্রন্দনের সুর কালিদাসের শ্রুতি শুনতে পেল। "মহারাজ, বিক্রম"—কালিদাস জড়িয়ে ধরলেন শোকাতুর চন্দ্রগুপ্তকে। কতক্ষণ পরে শোকাবেগ মন্দীভূত হলে চন্দ্রগুপ্ত বললেন,—"আমাকে নিয়ে চল কালিদাস।"

উজ্জয়িনীতে ফিরে এলেন তাঁরা।

কিন্তু গভীর চিন্তার কুটিল রেখা চন্দ্রগুপ্তের ললাট পরিত্যাগ করল না। কালিদাস জিজ্ঞাসা করতেন,—"সখা, কি হোল"?

তখনি একটি ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠতো চন্দ্রগুপ্তের অধরে। মুখে বলতেন, "কিছু না।"

কিন্তু সে কথার সঙ্গে যে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস চন্দ্রগুপ্তের হৃদয়ের গহনতম কোণ থেকে প্রবাহিত হোত তাতে ঈষৎ হাসির ক্ষীণ রেখা সমুদ্রতরঙ্গাঘাতে বালির বাঁধের মতই ভেঙ্গে পড়তো।

বৈদ্য, সন্ন্যাসী, গ্রহবিপ্র, নর্তকী সবাই যখন ব্যর্থ হোল রাজার মন পরিবর্তন করতে তখন একদিন বেতাল এসে বললেন,—"কারণ পান কর। তাতে সব ভুলবে।"

শুনে শিহরিত হলেন কালিদাস।

কিন্তু রাজা আনন্দিত হলেন—"সত্য বলছ বেতাল? শপথ করে বলছ? বল ভোলা যায়? ভোলা যায়? কি অসহ্য যাতনা। মুছে দাও, ধুয়ে দাও ধ্রুবার স্মৃতি। সুরা খাব? ক্ষতি কি? এ তীব্র বেদনার কাছে হলাহলও মধু।"

বিপদ একলা আসে না। শঙ্কু ক্ষপণকের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘটকর্পর কালিদাসের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছে। কারণ? বরাহ, বররুচি ও অমরসিংহের মত ঘটকর্পরের জন্য ব্রহ্মদেয় ভূমির ব্যবস্থা কালিদাস করেন নি। কিন্তু এই কি তার ক্ষণ? শোককেও সে সময় দেবে না?

কালিদাস স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

রাজসভায় ষড়যন্ত্র ঘনিয়ে উঠতে লাগল।

গোপন আঘাত, অপমান, অনাদর, অবিশ্বাসে ভরে উঠলো কালিদাসের জীবনের পাত্র। ঘরে ভট্টিনী দুরারোগ্য রোগে অসুস্থ। আচার্য্য কাশ্যপের কাছ থেকে ফিরে এসেছে অবাধ্য দুঃশীল পুত্র দেবীদাস। সব ভুলে যেতেন তিনি যদি বিক্রমের প্রণয় ঠিক থাকত।

কিন্তু তিনিও কি দ্রুত বদলে যাচ্ছেন। সর্বক্ষণ সুরাপানে মত্ত থাকেন। সঙ্গীও জুটেছে তেমনি। বেতালভট্ট, ক্ষপণক, শঙ্কু। শোনা যাচ্ছে বেতালের সঙ্গে শ্মশানে গিয়ে তিনি তান্ত্রিক সাধনাও

নাকি করছেন। বেতাল নাকি বলেছে মৃত্যুলোক থেকে ধ্রুবস্বামিনী তাঁর সামনে আবির্ভূতা হবেন। কালিদাসকে দেখলে আজকাল স্পষ্টতঃই বিরক্ত হন। সব থেকে কঠিন আঘাত লাগল সেইদিন যেদিন ঘটকর্পর তাঁর বৈদর্ভী রীতি নিয়ে বিদ্রূপ করল এবং স্বয়ং বিক্রম সেই হাস্য পরিহাসে যোগ দিলেন। তাঁর ব্যঙ্গ কালিদাসের বুক বিদীর্ণ করে দিল। বিবর্ণ পাংশু মুখে তিনি বেরিয়ে এলেন রাজসভা থেকে। অনেক হয়েছে। আর নয়। প্রভু, রাজা, বন্ধু, অনেক দিয়েছ। যথেষ্ট।

সেই রাত্রিরই মধ্যযামে ভট্টিনীর মৃত্যু হোল। শেষ সময়ে তিনি বৈদ্যের ঔষধ প্রত্যাখ্যান করলেন। ধন্বন্তরী ঔষধ নিয়ে বালুকা-ঘড়ির দিকে চেয়ে বসেছিল। ভট্টিনী বললেন,—"আর কেন? তোমার বন্ধুকে বোলো যমের শক্তির কাছে হার মানতে লজ্জা নেই। এবার আমাকে মহাকালের বিল্বপত্র দাও। প্রভু, স্বামী, তোমার কাছে বহু অপরাধ করে গেলাম। অনেক তুচ্ছ বস্তুর জন্য বিরক্ত করেছি। কি করব, তোমার বুদ্ধি ও মহত্ত্বকে বোঝবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেন নি। দেবীদাসকে দেখো। নাথশর্মার কন্যা বৎসলার সঙ্গে ওর বিবাহ দিও। বড় লক্ষ্মী মেয়ে।"

কালিদাস সলতে করে বিন্দু বিন্দু তীর্থজল দিতে লাগলেন ভট্টিনীর মুখে। উষাক্ষণে ভোরের পাখী ডেকে উঠল। রাত্রির কুয়াশা তখনো জড়ানো—আকাশের গায়ে তখনো শুকতারা। ভট্টিনী অনন্ত পথে যাত্রা করলেন।

দিন কাটে।

সুখেও কাটে, দুঃখেও কাটে।

কিন্তু কালিদাসের দিন কাটে নির্বেদভাবে।

তাতে সুখও নেই, দুঃখও নেই। এই কি বৌদ্ধদের নির্বাণমুক্তি অবস্থা? কালিদাস ভাবেন, একদিন অমরসিংহকে জিজ্ঞেস করব।

ছন্দোমঞ্জরী রচনা করে দিন কাটাচ্ছেন। রোগশয্যায় শুয়ে ভট্টিনী বলেছিলেন,—

"তুমি তো সবাইকে অমর করে গেলে, নটী থেকে রাণী পর্যন্ত। কই আমাকে তো স্মরণীয় করলে না।"

কালিদাস বলেছিলেন,—"কল্যাণী, তুমি আরোগ্য হও। আমি তোমার জন্য নিশ্চয় গ্রন্থ রচনা করব।"

হায়, আজ যদি তিনি থাকতেন, কত না খুশী হতেন।

বৎসলা যবশক্তু আর দুগ্ধতণ্ডুল নিয়ে এল শ্বশুরের জন্য। হ্যাঁ, ভট্টিনীর কথামতই পুত্রের বিবাহ দিয়েছিলেন কালিদাস। বড় শান্ত-স্বভাবা কন্যাটি। কালিদাস তাকে প্রশ্ন করলেন,—

"দেবীদাস কাল রাত্রে গৃহে এসেছিল?"

বৎসলা স্তব্ধ হয়ে রইল।

"হুঁ।" বলে কালিদাস একটুখানি শক্তু খেলেন।

এই এক জ্বালা। পুত্রবধূর বেদনাকাতর মুখটির দিকে তাকানো যায় না। কালিদাস ভাবেন জীবনে কি তিনি এত পাপ করেছেন? তবে কেন মহেন্দ্রের প্রহরণ তাঁর উপর বর্ষিত হয় না? এ পাপ জীবন শেষ হয় না কেন?

সংবাদ বহন করে আনল বরাহ। কালিদাসকে ডেকে পাঠিয়েছেন রানী কুবের-নাগা। অনেকদিন পরে কালিদাস মাথায় উষ্ণীষ বাঁধলেন। অঙ্গে জড়ালেন শুভ্র উত্তরীয়। হাতে নিলেন একটি চিত্রিত মৃত্তিকা-ময়ূর রাজকন্যা প্রভাবতীর জন্য।

মহারানী কুবের-নাগা কবির কুশল প্রশ্নের পর হঠাৎ বললেন,—

"রাজা না আপনার বন্ধু? তাঁর সর্বনাশ আপনি কি করে হতে দিচ্ছেন?"

কালিদাস মাথা নীচু করে রইলেন। তারপর বললেন,—

"আমার অধিকার কোথায়?"

"আপনার অধিকার সর্বাগ্রে

"না, মহারানী, এ অধিকার আপনার। আপনি জনপদকল্যাণী, আপনি সবাইকে অভয় দান করুন।"

"আমি যদি আমার অধিকার আপনাকে দেই ?"

"মাথা পেতে নেব।"

"বেশ। মন্ত্রী মাতৃগুপ্ত, আমি বলছি আপনাকে একবার ভাকাটকরাজ্যে যেতে হবে। আপনি জানেন কুমার রুদ্রসেনের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহপত্র হয়ে আছে। তাঁদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বর্ধিত করবার জন্য এখন আপনাকে প্রয়োজন।"

কালিদাস স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

"পট্টমহাদেবী, আপনি কি বলছেন ? ঘটকর্পর এখন রাজমন্ত্রী। আপনি তাকেই পাঠান।"

কুবের-নাগা বিদ্রূপ করে উঠলেন,—

"মন্ত্রী মাতৃগুপ্ত কি তবে গুপ্তবংশের নিয়োগপত্র প্রত্যাখ্যান করবেন ?"

"সে কি কথা ?"

"তবে ? তাঁকে এই কূটনৈতিক দৌত্যকার্যে নিয়োগ করা হোল। ভাকাটক ও উজ্জয়িনীর সম্বন্ধটি যেন নিবিড় হয়। এক পক্ষের মধ্যেই তাঁকে যাত্রা কবতে হবে।"

কালিদাস সম্মত হলেন।

গুপ্তবংশপ্রভা প্রভাবতী। বড় সুলক্ষণা কন্যাটি।

অনেকদিন পরে কালিদাস হাল্কা মনে মহাকালের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। রূপপালী নাচছিল উদ্‌ভ্রান্তক নৃত্য। কালিদাসের রূপ-লিপ্সু মন বলল—সুন্দর।

কিন্তু মন তখনি প্রশ্ন করল—আরো সুন্দর কি দেখ নি কবি ?

যখন তোমার তরুণ বয়স—যখন চাঁদ ছিল উত্তরফল্গুনীতে তখন এই মন্দিরে—এই বেদীতে—

কে ?

স্মরণাতীত কাল থেকে কে উঠে এল ?

ও কে ? একবেণীধরা, সিতাংশুকপরিবৃতা !

"মাধবী ?"

"কবি ?"

মাধবী হাসল কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদের মত এক টুকরো হাসি। মুখে বলল—"কতকাল পরে।"

"কতকাল !"

"আমি তো প্রতি সন্ধ্যায় এসেছি। তুমিই আস নি কবি।"

"তা বটে।"

"মহারাজের সংবাদ ভাল তো, কবি ?"

"ভাল।"

কালিদাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করল মাধবী—"কি হোল ? বলছ না কেন ?"

"বলবার নয়।"

মাধবী মুখ ঘুরিয়ে নিল—"তাই বটে। পুরুষের মন ! আর কারুর রূপ-যৌবনে বাঁধা পড়েছে বোধহয়।"

"ধরে নাও তাই।"

মাধবী অভিমান ভরে মুখ ঘোরাল। তারপর রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—

"তোমারও তবে তাই, কবি। তাই নয় ? ছয় সেবাদাসীর মত ছয় ঋতু তোমার ঋতুসংহারে নৃত্য করেছে—নব নব পাত্রে ভরে তুলেছে নব নব মদিরা। তোমার তৃষিত যৌবন কি বাঁধা পড়ে নি সেখানে ?"

"মিলনের সে মরীচিকাই কি সত্য দেখলে, মাধবী ? ছয় ঋতু-সহচরীই শুধু দেখলে ? পড়নি আমার মেঘদূত ? ষড়ঙ্গ যবনিকার অন্তরালে দেখনি কি বিরহের অশ্রুতে প্রেমের পূর্ণতা ?"

"মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে।"

"সত্য।"

"তবে কেন তপোভঙ্গভয়ভীত তপোবনের মত হয়ে রইল আমার মিলনক্ষণ? বসন্তকুসুমমালা কেন বৃথা পরলাম? অঞ্চল ভরে রেখেছিলাম কত পুষ্পগন্ধঘনজ্যোৎস্না—কত বাদলঘন অন্ধকার অভিসার। সব গানই কেন স্তব্ধ হোল?"

"তুমি অসময়ে গেছ, মাধবী। অকালে কি মুকুল ফোটে?"

"অসময়? কবি, যৌবনের কাল কি অকাল? চেয়ে দেখ আজ প্রান্তযৌবনা আমাকে।"

"এখনই তো সময় এসেছে।"

"কি বলছ? আজ আমার দেহ হয়েছে শীর্ণ—বর্ণজ্যোতি ম্লান। পুরোন পুতুলের মত সময় আমার গেছে।"

"না, না মাধবী, একমাত্র তুমিই পার। গুপ্তবংশের এ দুর্যোগে একমাত্র তুমিই পার কল্যাণী লক্ষ্মীর মত সুধাপাত্র বয়ে আনতে।"

কালিদাস এগিয়ে এলেন।

"মাধবী, সে সব দিনের কথা মনে পড়ে?"

"পড়ে।"

"তবে আর একবার তোমার প্রসন্ন হস্ত দাও।"

"বেশ।"

"আজ রাত্রে।"

মাধবী শিহরিত হোল।

"কোথায়?"

"শ্মশানে।"

"সেখানে কি?" মাধবীব দুটি ভুরু ধনুর মত হয়ে গেল।

"সেখানেই মহারাজ নিশীথে তন্ত্রসাধনা করছেন। ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতালভট্ট তাঁকে ঘিরে রেখেছে। বেতাল তাঁকে মিথ্যে মায়ায় ভুলিয়ে রেখেছে যে শব-সাধনায় সিদ্ধ হলেই রাণী ধ্রুবস্বামিনী তাঁকে দেখা দেবে।

রাজাকে অন্ধ করে রেখে ক্ষপণক দল বাঁধছে। কাশ্মীর থেকে সিংহল পর্যন্ত সঙ্ঘে সঙ্ঘে হীনযান ও মহাযানদের দুটো দল তৈরী হয়েছে। আরো কতকটা অন্ধি সন্ধি বেঁধে সমগ্র দেশে একটা প্রবল মহাযান বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে। যারা অসন্তুষ্ট, ক্ষমাহীন, শক্তিহীন অথচ উচ্চাভিলাষী সেই সব ব্যক্তিরা এই দলে যোগ দেবে। এদিকে মহারাজকে কারণ পানে মত্ত করে রেখে সুযোগ বুঝে হত্যা করবে। স্থানটিও সুন্দর। চামুণ্ডার মন্দির—শ্মশানস্থল—নিবিড় নিশীথ। বিদ্রোহের সমকালে যদি মহারাজের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয় কে যাবে প্রশ্ন করতে? আর তান্ত্রিক বেতাল এত সহজে এত সুলক্ষণযুক্ত নরদেহই বা পাবে কোথায় পঞ্চমুণ্ডির আসনের জন্য?"

কালিদাসের নাসিকার বাঁশী ফুলে উঠলো—কপালের শিরা দপদপ করতে লাগলো। মাধবী ঠোঁটে ঠোঁট চাপল। অনেকক্ষণ দুজনে চুপ। তারপর মাধবী বলল,—

"তুমি যা বলবে আমি তাই করব।"

এগার

বুদ্ধরক্ষিতাই সংবাদ এনে দিল।

ঠিক দুই প্রহরে—গম্ভীরা নদী-তীরস্থ মহাশ্মশানে—ভীমা চামুণ্ডার মন্দিরে আজ ভৈরবী চক্র বসবে।

কালিদাস ও মাধবী কৃষ্ণনীল বস্ত্রে অঙ্গ আবৃত করে নিলেন। নগর বাহিরে এসে পৌঁছলেন। দূর অরণ্যানী পর্যন্ত এই শ্মশান। দূর, দূর, যতদূর দেখা যায় চিতা জ্বলছে। দগ্ধ বসার দুর্গন্ধ বয়ে কৃষ্ণধূম-শিখা গগন ভরে দিচ্ছে। চতুর্দিকে নরকপাল। ওরা দুজনে এসে এক গুল্মের পেছনে দাঁড়ালেন। দেখলেন, মহাযানী ক্ষপণক এখন কাপালিক হয়ে গেছেন। তার গলায় হাড়ের কণ্ঠমাল—কটিতে

নরপঞ্জরের কিঙ্কিনী—ভস্মে ধূসর গৌরতনু। বাম হাতে উগ্রসুরাপূর্ণ পাত্র—দক্ষিণ হাতে মুক্ত কৃপাণ। কপাল সজ্ঝট্ট মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজাচ্ছে ঠনঠন্ করে। দন্তুর শঙ্কু ও মত্ত বেতালের অট্টহাসি ও বীভৎস চীৎকারে শ্মশানভূমি মুখরিত। অনস্ত্রছিন্ন মহামাংস প্রেতদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হচ্ছে। এক পাশে বিশুষ্কদেহা বৃদ্ধা ভৈরবী কামাক্ষী। তার মুখ, ভ্রূ, কেশ, নেত্র সম্মুখের অগ্নিকুণ্ডের আভায় যেন জ্বলছে।

এই রাত্রি যেন শোণিতরঞ্জিতা হত্যাকারিনী কোন নারী—তারাগুলি যেন মহাকাশেব শ্মশানের নরঅস্থি—চন্দ্রমা যেন শুভ্র করোটি—অখিল জগৎ যেন মহাকাল কাপালিকের ভৈরবীচক্র। কালিদাস মনে মনে ভীত হলেন। একবার মনে হোল হঠকারিতা হয়েছে। কেন মাধবীকে আনলাম? কিন্তু মাধবী দৃঢ়সঙ্কল্পা। রাজাকে উদ্ধার করতেই হবে। ওরা এগিয়ে এল গুল্মেব অন্তরাল দিয়ে। শোনা গেল বিক্রমের উত্তেজিত কণ্ঠ,—

"ভোলা যায় না বেতাল, কিছুই ভোলা যায় না। তুমি যে বলেছিলে কারণবারি সব যন্ত্রণা ধুইয়ে দেবে? তবে কেন তার কবরীব শতকদম্বঘেরা প্রফুল্ল মুখখানি আজো দেখতে পেলাম না?"

মদজড়িত স্বরে বেতালভট্ট উত্তব দিলেন,—

"চন্দ্রগুপ্ত, তোমাকে বিশেষ কারণে চামুণ্ডা এই কষ্ট দিচ্ছেন।"

কালিদাস দেখল ঘূর্ণিতানয়না কামাক্ষী মদ্যপান করছে। ক্ষপণক সেখানে বসে আছে স্থির নেত্রে। শঙ্কু অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে একপাশে পড়ে আছে। রাজার সম্মুখে মৎস, মাংস. মদ্য প্রভৃতি বিবিধ তান্ত্রিক উপাচাব।

মদ্যপান করতে করতে লোহিত লোচনে বিক্রমাদিত্য বললেন,—"সুরা মিথ্যাবাদী। এর দ্বারা কিছুই ভোলা যায় না। এ কেবল পারে মত্ততায় নয়ন মুদ্রিত করে দিয়ে অন্তরের কোন গভীর প্রচ্ছন্ন প্রদেশ থেকে অতীত বিষাদের ছবি মনে ফুটিয়ে তুলতে। জাগরণে যে ছায়া অস্পষ্ট—অর্দ্ধসুষুপ্তিতে তাই উদ্ভাসিত।

"প্রাণরস শুকিয়ে গেল বলে মরণরসে ভরে নিই জীবনপাত্র। এ যে চিতার আগুন-গলান রস—সব শূন্যকে অট্ট হেসে রঙীন করে দেয়। ও কে? কে তুমি ছায়াময়ী? না কায়াময়ী? তুমি? ধ্রুবস্বামিনী?"

কালিদাসের হাত জোর করে ছাড়িয়ে মাধবী বিক্রমের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

বিক্রম উদ্‌ভ্রান্ত নয়নে তাকিয়ে আছেন তার দিকে। দক্ষিণ হাতে তাঁর পানপাত্র,—

"তুমি কি স্বর্গের মরীচিকা? না ভাগ্যের অট্টহাসি? কে তুমি?"

মাধবী ওড়নার অন্তরালে দাঁড়িয়ে ইশারা করল। মন্ত্রমুগ্ধের মত রাজা তার দিকে ধাবিত হলেন। মদোন্মত্ত হলেও বেতালের সম্বিত ছিল। আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো—"যাবেন না রাজন্, যাবেন না,— এ শ্মশানভূমিতে কত কত কামরূপিণী ঘুরে বেড়ায়।"

বেতালকে অমানুষী শক্তিতে রাজা ঠেলে ফেলে দিয়ে বললেন,— "মূর্খ, তোমারি মন্ত্রে ষোড়শী আবির্ভূত হয়েছে। এখন দেবীকে ছেড়ে তোমার ভজনা করব?"

মুহূর্তে মত্ত রাজাকে নিয়ে মাধবী সেখান থেকে প্রস্থান করল। সেদিক লক্ষ্য করে বেতাল একটা জ্বলন্ত কাষ্ঠ ছুঁড়তেই কালিদাস একটি ভল্লের সাহায্যে তা দূরে ফেলে দিলেন।

বেতাল দাঁতে দাঁত টিপে বলল,—"ও, তুমি? এ তবে তোমারই কাজ?"

"হ্যাঁ, আমারি কাজ। রাজ-সিংহাসন নিয়ে আমি জুয়ো খেলা পছন্দ করি না বেতাল।"

"আমি তান্ত্রিক। আমিও ধর্ম নিয়ে খেলা করা পছন্দ করি না, কালিদাস। তুমি না শৈব? ছি, ছি, ছি, তোমার এই আচরণ?"

"বেতাল ভট্ট, ধর্ম যদি ধর্ম থাকতো তবে আমারো তাতে হস্তক্ষেপের স্পর্দ্ধা থাকতো না। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, বৌদ্ধ ক্ষপণক তোমার চক্রে কোন কারণে এসেছেন? তুমি না শৈব তান্ত্রিক?

তোমার চক্রে মহাযানী বৌদ্ধের প্রয়োজন হয় কেন? উত্তর দাও।—”

বেতাল ক্রোধে কম্পিত হতে লাগলেন।

কালিদাস বললেন—“আবার বলি, বেতাল ভট্ট, তুমি আমার সহাধ্যায়ী। সে কারণে মহামন্ত্রী তোমাকে কারারুদ্ধ করেন নি। তুমি এদের সাহচর্য ছেড়ে দাও। তোমার জীবনের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা-গুলি লিখে রেখে যাও ভবিষ্যৎ পুরুষের জন্য। এ বীরাচারী ধর্ম সকলের জন্য নয়।”

কালিদাসের চারিদিকে ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে ক্ষপণক, শঙ্কু ও কামাক্ষী। মত্ত কামাক্ষীব মুখে ফেনার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে অশ্লীল তিরস্কাব—“কি গো রাজকবি, তোমার বসন্তমঞ্জবীকে হারিয়ে মাধবীকে নটিমুখ্যা করে ভেবেছিলে পবমপদ পাবে। কি হোল তাতে? অর্দ্ধচন্দ্রমুদ্রায় তো বাজা তোমাকে সাজিয়ে দিয়েছেন। আবার এসেছ কেন?”

ক্ষপণক ব্রজগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—“থামো ভৈববী।”

অমনি কামাক্ষী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে সে বিলাপ করতে লাগল,—“ওগো, আমারও গণ্ডে কোকনদ ফুটতো; নয়ন ছুটিকে মনে হোত ইন্দীবরিকা।”

কালিদাসের কণ্ঠ দিয়ে ধিক্কার ফুটে উঠল—“প্রমত্তা নারী।”

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষপণক ব্রজমুষ্টিতে কালিদাসের হাত ধরলো, তারপর বলল,—“কিসের জন্য তুমি এখানে এসেছ?”

“এ ভূমিতে ঠিক তোমার যতখানি অধিকার, আমারও ততখানি। ক্ষপণক, তুমি দশবলের শিষ্য—আমি সপ্তাঙ্গের দাস। কিন্তু বন্ধু, শান্তি, মুক্তি, নির্বাণ কোনটাই না চেয়ে কেন তুমি অভিচার ও চক্রান্তেব পন্থী? এটাই কি নির্বাণের পথ?”

“সে উত্তর আমি তোমাকে দেব না, মূঢ়। কিন্তু কি কারণে তুমি এসেছ এখানে?”

দন্তুর শঙ্কু বীভৎস হেসে বলল—"এটাও বুঝছ না, ক্ষপণক? রাজাকে নিয়ে যেতে এসেছে।"

ক্ষপণকও হাসল খর বক্র হাসি। বলল,—

"তাতেও লব্ধকাম হবে না।"

কালিদাসও হাসলেন,—"তবু বরণীয়ের কাছে যাচ্ঞা করাই ভাল। অধমের কাছে নয়।"

ক্ষপণকের চোখ চিতার অঙ্গারের মত ধক্ ধক্ করে উঠলো, "এতদূর?"

কালিদাস আবার হাসলেন—"হাতটা ছাড়। এখনো এ হাত লেখনী ধরে। সেই লেখনী থেকে যা বেরোয় তা দিয়ে এখনো পররাষ্ট্রনীতিতে তোমরা সন্ধি বা সংশ্রয় করো। তোমারও আসমুদ্রব্যাপী মহাযান দলের গঠন এখনি তো শেষ হয় নি। অবশ্য আমাকে হত্যা করতে চাও তো কর।"

"না, তোমার মত কীটকে আমি হত্যা করি না।" ক্ষপণক সক্রোধে কালিদাসের হাত ছেড়ে দিল।

"কেন? কীটকেই বা ছেড়ে দেব কেন? তৃণেরও খোঁচা দেবার শক্তি আছে। কৌটিল্য বলেছেন······"

"তুমি চাণক্য নাকি?"

"না, আমি স্তাবক কালিদাস মাত্র। কিন্তু ক্ষপণক, অকৃতজ্ঞতার বিষক্ষরণ আর কতকাল করবে?" তারপর কামাক্ষীর দিকে তাকিয়ে বললেন,—

"কলাবতী, সদ্যছিন্ন নন্দনের মন্দারমঞ্জরী তুমি, কেন পুষ্পে কীটের মত তৃষ্ণা জাগিয়ে রেখেছ মর্মের মধ্যে? কোথায় রক্তচন্দনপঙ্কে আঁকবে তিলক, তা নয় নররক্তে রঞ্জিত করেছ তোমার পুণ্ড্র,—কোথায় অগুরু গন্ধে, লোধ্ররেণুতে সাজাবে বরতনু, পরিবর্তে ভস্ম ও কর্দমে আচ্ছাদিত করেছ তোমার গৌর-অঙ্গ। এখনো সময় আছে। তুমি চল আমার সঙ্গে।

প্রয়াগ, সাকেত, মগধ যেখানে তুমি চাও সেখানেই হবে নাট্যাচার্য্যা।”

অপগত মদরাগা কামাক্ষী তাকালেন কালিদাসের দিকে,—

“দেবে আমাকে সেই সম্মান?”

“দেব।”

বেতাল এগিয়ে এল। মত্ত ভগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করল,—“আর আমাকে?”

“তোমাব জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দেব। তুমি তোমার অভিজ্ঞতা লিখবে গ্রন্থাকারে।”

“আর ক্ষপণক···” কালিদাস তাকালেন,—

“যথেষ্ট হয়েছে, কালিদাস। আমার জন্য কোন বিহারের বা মঠাধ্যক্ষপদেব দরকার নেই। তুমি আমাকে পরাভূত করেছ। আমার দক্ষিণ ও বাম হস্তকে ভেঙে নিয়ে যাচ্ছ, এই যথেষ্ট।”

কালিদাস হাসলেন। “তবে থাক।”

তাঁর পেছনে বেতালভট্ট ও কামাক্ষী মত্ত চরণে অনুসরণ করল। আর সেই ঘোর অমা-নিশায় মহাশ্মশানের নির্বাপিত অগ্নির দিকে তাকিয়ে ক্ষপণক আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—“চ'লে গেল? সবাই চলে গেল? বেশ, আমি একাই সংগ্রাম করব।”

পেছন থেকে শঙ্কু বলল—“আমি আছি তোমার সঙ্গে।”

ক্ষপণক চমকিত হোল। চিতা· আগুনে দন্তব শঙ্কুর মুখ মনে হোল কোন আদিমকালের পাতালবাসী পশু। সেই মূর্তিমান্ ভয়ানকের দিকে তাকিয়ে ক্ষপণক বলল—“বেশ, এস উভয়ে প্রতিজ্ঞা করি।”

চিতাগ্নিকে স্পর্শ করে উভয়ে [illegible]পবদ্ধ হলেন,—“কালিদাসকে উচ্ছেদ করতে হবে।”

বার

শরৎকাল।

ভাকাটক রাজ্যের রাজবধূ হয়ে কুমারী প্রভাবতী যাত্রা করলেন। সঙ্গী অভিভাবক কালিদাস।

কথা আছে রাজকুমার রুদ্রসেনের কাব্যটিকে পরিমার্জনা করে দেবার জন্য তিনিও কিছুদিন ভাকাটকে থাকবেন। তাতে দুই রাজ্যের মৈত্রী বন্ধনও দৃঢ়তর হবে। অনেকদিন পরে পথে বেরিয়ে কবির ভাল লাগছিল। পথে দেখছেন যব, গোধূম, নীবার ধান্যের ক্ষেত্র। কোথাও বা বন্য ময়ূরের দল। আকাশে শুভ্র মাল্যের মত উড়ে চলেছে বলাকা শ্রেণী। মনের মধ্যে একটা সুর গুণগুণিয়ে উঠছে।

মাধবীকে বলে এসেছেন,—"এবার তোমার জন্য আর একটি গ্রন্থ রচনা করব। তারপর বাণপ্রস্থে যাব।"

মাধবী অভিমান করে বলেছিল—"আবার আমায় কেন? কত নতুন দেশে যাবে—সেখানে দেখা পাবে কত নতুন নায়িকার।"

"কেন মালিনী সখী, তুমি তো আমার সব কাব্যের মধ্যেই আছ। এমন কি রঘুবংশেও তোমারি নামে নাম সেই মালিনী ছন্দটি যুক্ত করেছি।"

মাধবী কি আর তা জানে না? জানে। কিন্তু কবির স্বীকারোক্তি শুনে আরো ভাল লাগল। এবার সে একটা খোঁচা দিল,—

"কিন্তু কুমার-সম্ভবে কোথাও আমার ছায়াটি নেই। রাণী ধ্রুব-স্বামিনীর মত পার্বতীরই সেখানে জয় গান।"

কালিদাস শুনে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন।

সত্যি, কুমারসম্ভব রচনার সময় মাধবীর ওপর তাঁর ক্রোধ হয়েছিল বটে। তবু তো একটি সম্পূর্ণ সর্গ মাধবীকে নিয়ে লিখেছিলেন।

গদগদ কণ্ঠে কালিদাস বললেন,—"মালিনী, তা সত্য নয়। তুমি নেই। তোমার ছায়া আছে। রতিবিলাপে আঁকা আছে তোমার বিরহদুঃখ। কাশ্মীরে যখন ছিলাম বিক্রমের বেগবান দুঃখকে রূপ দিয়েছিলাম মেঘদূতের যক্ষের বিরহে। তোমার বেদনা নিয়ে তাই লিখলাম রতিবিলাপ। এ সর্গ যেদিন পাঠ করি রাজপ্রাসাদের সকলেরই চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। রাণী ধ্রুবস্বামিনী বড় একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন।"

উদ্গত ক্রন্দন রোধ করে মাধবী প্রশ্ন করেছিল—"কি সেই কথা?"

রাণী বলেছিলেন,—"পুরুবার বেদনা বিরহদগ্ধ পুরুষের উক্তি, রতিবিলাপে তেমনি অক্ষয় হয়ে থাকলো বিরহবিদীর্ণা নারীর উক্তি।"

কালিদাস তারপর সস্নেহে মাধবীর উড়ন্ত অলকগুলি ঠিক করে দিলেন,—"তুমি তো জান আমি ভাকাটকে যাচ্ছি। হয় তো বৎসরাধিক থাকতে হবে। মহারাজের ভার তোমার উপর। আর সেজন্য একটি পুরস্কার তোমার প্রাপ্য।"

"একটি কাব্য লিখবে আমাকে নিয়ে?"

"না, একটি নাটক। তুমি যে আমার দ্বন্দ্ব।"

দ্বিতীয়া পার্বতীর মত শুক্লাম্বরা মাধবী হেসেছিল।

সেই নাটকের কাহিনীই ক্ষণে ক্ষণে মনে ঢেউ তুলছে। আকাশে শরৎকালের লঘু মেঘখণ্ড যেন সদ্যোজাত গোবৎস। কেবলি মনে ভাসছে মহাকালমন্দিরে একবেণীধরা সিতাম্বরা মাধবী—তার ক্রোড়ে একটি নিদ্রিত গৌরবর্ণ শিশু। মধুবা নায়িকা নয়, অপ্সরী নায়িকা নয়, এবার জননী নায়িকা। অপ্সরা জননী হয়েছে। তেমনতর কাহিনীর তো অভাব নেই পরাণে। ঘৃতাচীর পুত্র দ্রোণ, উর্বশীর পুত্র আয়ু, মেনকার কন্যা শকুন্তলা। হ্যাঁ, এই শকুন্তলাকে নিয়েই লিখব আমার নাটক।

ভাকাটক রাজ্যের অধীশ্বরদেবতা মহাভৈরব। কালিদাসও

শৈব। রাজপরিবারের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে তাই তাঁর বিলম্ব হোল না। তার উপরে তিনি এনেছিলেন এক অতুলনীয় উপহার, রাজকন্যা প্রভাবতী গুপ্তাকে, বিনয়ে শীলনে বিদ্যায় ব্যবহারে যিনি গুপ্তবংশের যশোপ্রভা।

রাজকুমার রুদ্রসেনও বড় গুণবান পুরুষ। যুদ্ধে, রাজনীতিতে, ললিত শিল্পে তাঁর সমান দক্ষতা। এ যেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। চন্দ্রগুপ্তই যেন নবযৌবনে ফিরে এসেছেন। রুদ্রসেনের মহা উৎসাহ কাব্যরচনায়। সেতুবন্ধ কাব্য লিখছেন। কালিদাসের মনে ফিরে ফিরে আসে কাশ্মীরের কথা। কাশ্মীর-রাজ প্রবরসেনও লিখেছিলেন 'সেতুবন্ধ কাব্য'।

রুদ্রসেনকে বললেন সে কথা। রুদ্রসেন মস্তকে হাত দিলেন,—

"সর্বনাশ, তবে উপায় কি?"

"উপায় আর একটি কাব্য রচনা করা, যার বিষয়বস্তু হবে পৃথক।"

"কি লিখব ভেবেই তো পাচ্ছি না।"

"কেন, লেখ না, ভরত-চরিত কাব্য। সবাই রামকে নিয়ে লেখেন। তোমার নায়ক হোক ভরত। তিনিও কম পুণ্যবান ছিলেন না।"

রুদ্রসেন হাসলেন,—"যেমন মহাভৈরবকে ছেড়ে চক্রপাণির স্মরণ নিয়েছি?"

কালিদাসও হাসলেন,—"আহা, তেমনি প্রভাবতীও তো মাল্য ও গন্ধ পাঠায় ভৈরবমন্দিরে।"

রুদ্রসেন বললেন—"বেশ। কিন্তু ততদিন আপনাকে থাকতে হবে এখানে।"

কালিদাস রাজী ছিলেন না। কিন্তু জামাতার উপরোধ। অতএব থাকবারই সিদ্ধান্ত করলেন। বিক্রমও সব শুনে নিশ্চিন্ত হলেন। রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তে শান্তি বজায় থাকুক এটা তিনিও চান। রাণী কুবের-নাগাও শুনে হৃষ্টা হলেন।

এক বছরের স্থানে চার বছর হয়ে গেল।

প্রভাবতী ইতিমধ্যে তিন পুত্রের জননী হলেন।

মাধবীর পত্র উজ্জয়িনীর বাতাস বয়ে আনে।

"শকুন্তলার কতদূর?"

"হয়ে এসেছে, মালিনী, হয়ে এসেছে। বয়স বাড়ছে; এখন আর দ্রুত কাজ করে উঠতে পারি না।"

চারিদিকে অখণ্ড শান্তির মধ্যে একটি কাঁটা—উচ্ছৃঙ্খল পুত্র দেবীদাস।

মাধবী লেখে—"চেষ্টা করছি তাকে কতকটা সংযত করতে। এখন রাত্রে গৃহে ফিরে আসে। বৎসলার মুখে হাসি দেখা গেছে।"

অবশেষে উজ্জয়িনী যাত্রার দিন স্থির হোল।

কালিদাসের মন লঘু হয়ে গেছে। জাতিফুলের গন্ধে মাখা উত্তরীয়টি ঠিক করে রাখলেন। গুছিয়ে নিলেন আরো দু একটি সৌখীন সংগ্রহ। শকুন্তলা নাটকের ভূর্জপত্রগুলি রেশমী কাপড়ে সুন্দর করে বাঁধলেন। এমন সময় বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত রুদ্রসেন পরলোক গমন করলেন। কেউই এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। অন্তঃপুরে ক্রন্দনের রোল উঠল। সাতদিন সাতরাত কুন্তল-রাজ্যের লোকেরা শোকে অভিভূত হয়ে রইল। সাতদিন সাতরাত প্রভাবতী ঘন ঘন মূর্ছিতা হতে লাগলেন। তারপর তিনি শক্ত হয়ে উঠে বসলেন। কালিদাসকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন,—

"তাত, আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আপনি মাতৃগুপ্তরূপে পিতাকে একদিন রক্ষা করেছিলেন। আজ এই ঘোর দুর্দিনে আমার এই অনাথ শিশুদের দিকে তাকিয়ে আপনি আমাকে রক্ষা করুন।"

কালিদাস বললেন,—"বৎসে, নিশ্চিন্ত থাক। রাজকার্য ঠিক চলবে। আমি তোমাদের নিশ্চিন্ত না করে যাব না।"

"রাজকার্য কে চালাবে?"

"কেন, তুমি? বরাহ বলেছিলেন তুমি হবে গুপ্তবংশের যশো-

প্রভা। তাই তোমার নাম দিয়েছিলাম প্রভাবতী। এখন থেকে প্রভাবতীগুপ্তার নামেই রাজ্য চলবে।"

প্রভাবতীর চোখ দুটি জ্বলে উঠলো। তার শিরায় শিরায় প্রপিতামহী কুমারদেবীর রক্ত ঝলকিত হলো। তিনিও তো এমনি অনাথা হয়ে সূর্য্যসম সমুদ্রগুপ্তকে পালন করেছিলেন। প্রভাবতীর ঠোঁটে দৃঢ় সঙ্কল্প। দিবাকর ও দামোদরকেও এমনি ভাবে মানুষ করতে হবে। তিনি বললেন,—

"তাই হোক। আজ থেকে প্রভাবতীগুপ্তার নামে ভাকাটকের রাজ্যশাসন চলবে। শাসন কার্যের দুই ভেদ—সুশাসন ও দুঃশাসন। নারী ও পুরুষে কোন ভেদ নেই।"

পরদিন ভাকাটকের প্রজাবর্গ সবিস্ময়ে শুনল রাজসভার তূর্য ধ্বনি।—পরমভাগবতী, পরমভৈরবী, পরমভট্টারিকা মহারাণী প্রভাবতী গুপ্তা সিংহাসনে উপবেশন করলেন। অর্থী, প্রার্থী, ব্রাহ্মণ, মন্ত্রণাদাতা সকলেরই কথা বিবেচিত হোল। সপ্তাঙ্গের সকল কিছুই, যেমন দুর্গ, রাষ্ট্র, খনি, সেতু, বন, ব্রজ, বণিকপথ সম্বন্ধে সর্ববিধ আলোচনা চলল। সাতদিনের ছেদের পর সকলে সবিস্ময়ে দেখল রুদ্রসেনের রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট আছে।

রাণী কুবেরনাগা পত্র লিখলেন কালিদাসকে,

স্বস্তি নিবেদন এই,—

আপনি যে আমার কন্যা প্রভাবতীকে সববিধ সাহায্য করছেন এজন্য আমার হৃদয়ের শেষ কৃতজ্ঞতাটুকু নিন। আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে আশীর্বাদ করবার অধিকার আমার নেই। কিন্তু আপনাকে দান করবার অধিকার বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। ভাটভুক্তির অন্তর্গত শতগ্রাম আমি আপনাকে দিলাম।

কালিদাস হাসলেন।

সিংহল থেকে সংবাদ এল। রত্নধরের পোতশ্রেণীতে যেমন এল

সিংহলী মুক্তার রাশি তেমনি এল উদ্যত চক্রান্তের খবর। রত্নধর নিজেই দিয়ে এল পত্র মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের হাতে। চন্দ্রগুপ্ত চিন্তিত হলেন। এখন এই চক্রান্ত জাল ছিন্ন করে কে?

অমরসিংহ সৎ কিন্তু পণ্ডিত মানুষ। কৌশল তাঁর আসে না। যা ভাবেন স্পষ্ট করে বলেন। তবে? ধন্বন্তরী? তিনি পারেন। মানুষের মনস্তত্ব জানেন তিনি। কিন্তু তিনি গেলে উজ্জয়িনীর জনপদবাসীর কি প্রচণ্ড অসুবিধা হবে না? আর কে আছে? বরাহ—ববরুচি—ঘটকর্পর? না, না, না। সমস্ত দিক বিবেচনা করার শক্তি তাঁদের নেই। বেতাল-শঙ্কু শুধু চক্রান্তে আরো ইন্ধন দেবে মাত্র। রোধ কববার কিছুমাত্র শক্তি তাদের নেই। ক্ষপণক? হয়তো পারে। কিন্ম তার উচ্চাশা গগনস্পর্শী। পশ্চিম পয়োধি থেকে পূর্ব সাগর, দক্ষিণ জলনিধি থেকে উত্তরে হিমাদ্রি পর্যন্ত এক মহাযানী আন্দোলন গড়ে তুলে তার নেতৃত্ব করবার বাসনা অনেককালের। যে বৌদ্ধবাজ্যেব দেবতা হবেন, মঞ্জুশ্রী, নীলতাবা ও অবলোকিতেশ্বর। না বিষ্ণু নন—শিবও নন। মন্ত্রীপরিষদ থাকবে না। থাকলেও তা হবে চৈত্যের অধীন। চৈত্য থাকবে বিহারের অধীন। রাজা থাকবেন, তবে নামমাত্র হয়ে। তাহলে?

কালিদাস।

রাজা যেন নিজেব মনের সঙ্গেই গুপ্তমণি খেলতে লাগলেন। কালিদাস যে অনেক কাজে ব্যস্ত। তা ভিন্ন গত সাত বছর ধবেই তো সে গৃহছাড়া। এমন সময় মন্ত্রী জীবগুপ্ত এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর কাছে পৃথক ভাবে সংবাদ এসেছে। মহামন্ত্রীর মুখমণ্ডল দেখেই রাজা বুঝলেন।

জীবগুপ্ত বললেন,—"আমার একটি ক্তব্য আছে।"

"বলুন।"

"সিংহলের যা পরিস্থিতি… ‥"

"তাতে একজন রাষ্ট্রদূত পাঠানোর প্রয়োজন এবং কালিদাসকে না হলে চলবে না, এই তো ?" অসহিষ্ণু স্বরে বললেন বিক্রম।

জীবগুপ্ত একটু অপ্রতিভ হলেন। রাজা কি করে জানলেন তাঁর মনোভাব ? একি সমুদ্রগুপ্তের রক্ত ক্রিয়া করছে ? না তান্ত্রিক রাজা গুপ্তবিদ্যা জানেন ? কতকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন,—"তা ভিন্ন আর আশু সমাধান দেখি না। যুদ্ধ কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়। এবং আমি সংবাদ নিয়ে জেনেছি সিংহলরাজের কাব্যরচনার বিষয়ে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে। আমাদের কর্তব্য সেই অনলে আহুতি দেওয়া। যদি মাত্র দুটি মাস সময় পাই তাহলেই অন্য সব ব্যবস্থা আমি করে ফেলতে পারব। ভৃগুকচ্ছ থেকে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত চতুরঙ্গ বাহিনী সুসজ্জিত থাকবে।"

"বেশ, তাই হোক। আজই তবে দ্রুতগামী রথের ব্যবস্থা করুন। আমি পত্র লিখে দিচ্ছি। কালিদাস ওখান থেকেই যাত্রা করবে। ভাকাটক থেকে কাদম্ব, তারপর গঙ্গা পার হয়ে পল্লব রাজ্যের কাবেরীপত্তনম্ থেকে অর্ণবপোতে উঠবে। রংধরের পোতশ্রেণী সেখানে থাকবে। ইতিমধ্যে কুমার দাসের কাছে পত্র লিখুন,—আমরা রাষ্ট্রদূত পাঠাচ্ছি মহাকবি কালিদাসকে।"

শকুন্তলার শেষ পরিচ্ছেদটি লেখার পর কালিদাস অনেকক্ষণ তৃপ্ত হয়ে চেয়ে রইলেন নীলাকাশের দিকে। আবার শরৎ এসেছে। দ্বিতীয় পার্থিব শ্রীর মত পঙ্কজলক্ষণা শরৎ। বড় সুন্দর, বড় রুচি। বসন্তকে কেন লোকে বলে মধুর ? সে তো শিরায় শিরায় তপ্ত রক্তকে ফুটিয়ে তোলে এক উন্মাদনার রসে। সেনাপতির মত তার উদ্যত সাজ। উদ্যত আর দ্বন্দ্ব। কিন্তু কচিকলাপাতার মত নীবার ধান্যে—হংস মালায়—ভরা সরোবরে নবলাবণ্যময়া বধূর মত এই মাস। কালিদাস নতুন প্রেমিকের মত তাকিয়ে রইলেন প্রকৃতির দিকে। শকুন্তলা নাটকের পাতাগুলি ওল্টালেন একবার। সযত্নে ধীরে

ধীরে অনেকগুলি বৎসরের উত্তাপ দিয়ে লিখেছেন এই কাব্য। এ যে তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ধন। অপ্সরীর বাসনা কখন খসে পড়ে জননীর সাধনা হয়ে উঠলো।

"কে?"

"তাত, আমি প্রভাবতী।" প্রভাবতীর ঔজ্জ্বল্যহীন মুখের দিকে উৎসুক চোখে তাকালেন কালিদাস।

"উজ্জয়িনী থেকে পত্র এসেছে। আপনাকে দু মাসের জন্য একবার সিংহল যেতে হবে। সেখানে গভীর চক্রান্ত চলছে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণের। সিংহলরাজ কুমারদাস আপনাকে তাই ভিক্ষা চেয়েছেন রাষ্ট্রদূতের পদে। পিতা জানিয়েছেন,—কালিদাসকে এই শেষ কর্তব্য দেওয়া হোল। এর পর ফিরে এলে তাঁকে এমনতর প্রবাস জীবন আর যাপন করতে হবে না।"

কালিদাস হেসে বললেন,—"বৎসে, তোমার পিতা দিনে দিনে কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠছেন, তাতে আর সন্দেহ কি? কবে যেতে হবে?"

"যত শীঘ্র সম্ভব। আপনার রথ প্রস্তুত। কাবেরী-পত্তনমে রত্নধরের পোতও অপেক্ষা করে আছে।"

"বেশ, আমিও প্রস্তুত। আজই যাত্রা করব।"

"আজই? না, না। আজ ভরণী নক্ষত্র।"

"তাতে কি কন্যা? নক্ষত্র যমদৈবত? কিন্তু যমকেই আমার এখন প্রয়োজন।"

"না তাত, তা হয় না।"

"বৎসে, ভরণ যে করে সেই ভরণী। তুমি হাসিমুখে প্রসন্ন অন্তরে বিদায় দাও। রাজকার্যে বিলম্ব সয় না।"

প্রভাবতী প্রণতা হলেন।

কালিদাস তার মাথায় হাত রেখে মহাকালের আশীর্বাদ চাইলেন। তারপর প্রভাবতীর মুখখানি তুলে ধরে বললেন,—"গুপ্তবংশযশোপ্রভা

প্রভাবতী গুপ্তের রাজ্যশাসন খ্যাতি যাবৎ চন্দ্রার্ক তাবৎ অক্ষয় হোক।"
প্রভাবতী হেসে ফেললেন। হেসে বিদায় নিলেন।

কালিদাস তাঁর সামান্য তৈজসপত্রাদি গুছিয়ে নিলেন। উজ্জয়িনীর দূত দাঁড়িয়েছিল দ্বারে। তার হাতে তুলে দিলেন পট্টবস্ত্রে মোড়া শকুন্তলা। "ভদ্র, এটি বিদূষী মাধবীর গৃহে পৌঁছে দিও। আমার নতুন নাটক।"

আবার পথ। সরোবরে কুমুদলেখা। বাতাসে শালিধানের গন্ধ। কতবার দেখেছেন কালিদাস তবু প্রাণ ভরে নিলেন সেই আঘ্রাণে—সেই দৃশ্যে। উষ্ণমধুর রোদের তাপটিই বা কি মিষ্টি। বারে বারেই ধরিত্রী এক সাজ পরে—বারে বারেই হয়ে ওঠে নবীনা। ভাকাটকের পরেই কুন্তল বা কদম্ব দেশ। সেখানে থাকতে হোল দুটি রাত। দৌত্যেরও প্রয়োজন ছিল। তা ভিন্ন রাজসভায় আয়োজন হয়েছিল কুমারসম্ভব পাঠের। শৈব রাজসভায় এ কাব্য পুলকের বন্যা বইয়ে দিল। কুন্তলেশ্বর সাগ্রহে ঘোষণা করলেন,—"গুপ্ত সাম্রাজ্যের সঙ্গে আমাদের ঐক্য স্থাপিত হোক। আমাদেরও মন্ত্র হোক,—'অগ্নিরিতি ভস্ম বায়ুরিতি ভস্ম জলমিতি ভস্ম স্থলমিতি ভস্ম ব্যোম ইতি ভস্ম সর্বংহ বৈ ইদং ভস্ম মনঃ এতানি চক্ষুংষি ভস্মানি।'

কবি, তোমাদেব পঞ্চবক্ত্র মহাকালকে আমরাও নমস্কার করি। হে প্রথমমুখ সদ্যোজাত তোমাকে নমস্কার, হে দ্বিতীয় মুখ বামদেব তোমাকে নমস্কার, হে তৃতীয় মুখ অঘোর তোমাকে নমস্কার, হে চতুর্থ মুখ তৎপুরুষ তোমাকে নমস্কার, হে পঞ্চমমুখ ঈশান তোমাকে নমস্কার।"

সমুদ্র যাত্রাও সুগম হোল। শরতের সমুদ্র মধুরা নারীর মতই রঙ্গময়ী। চপলা কিন্তু ভীষণা নয়। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় ভরা রজতময়ী ফেনহাস্যমুখরাকে দেখে কালিদাস লুপ্তধৈর্য পুরুষের মতই

হাত বাড়িয়ে দিলেন জল ছুঁতে। মকর ছুটে এসে কবির হাত চেপে ধরল,—"করছেন কি কবি? জানেন জলে কত মায়াকন্যারা আছে? এখুনি আপনাকে টেনে নিয়ে যাবে কোন অগাধে।"

জলের অতলে মগ্ন মন নিয়ে কালিদাস উত্তর দিলেন—"মকর, যদি মরি তো এই ঊর্মিমুখরা মায়াকন্যাদের কোলেই যেন মরি।" মকর উত্তর দেয়, "আর মহারাজেব কি হবে?"

"তাই বটে। মহারাজের জন্যই মরতে পারি নে।" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন কালিদাস।

কিন্তু এই রূপবতী রজনী—এই অগাধ জলের গান—এই তো সুখের সৌন্দর্যের মৃত্যুর মুহূর্ত। কেন তবে? কোন বাসনা এখনো বাকি আছে? আছে নাকি? সভয়ে কালিদাস দেখলেন একটি অঙ্কুর ফুটছে। তাকে যদি একবার দেখে আসতাম। কাকে? স্তব্ধ হও। স্তব্ধ হও। চপল হোয়ো না।

চীৎকার করে উঠলেন তিনি নিজেরও অজান্তে।

মকর ছুটে এল—"কি হয়েছে কবি? কি হয়েছে?"

ততক্ষণে সম্বিৎ ফিরে এসেছে কালিদাসের। বললেন—"কিছু না, মনে হল কি যেন দেখলাম।"

"আপনি জলের কাছ থেকে সরে বসুন। আমি গবাক্ষদ্বার রুদ্ধ করে দিচ্ছি।" মকর বলল গম্ভীর মুখে।

"সেই ভাল।"

পরদিন পোতশ্রেণী সিংহল গিয়ে পৌঁছল। সিংহলে আজ বড় উৎসব। পরাক্রান্ত গুপ্তসাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদূত আসছেন। তিনিও আবার শুধু এক রাজনীতিবিদ রাজপুরুষ নন। তিনি এক অসাধারণ ব্যক্তি। মহাকবি কালিদাস। নগরীতে তোর [illegible] রণ সাজান হয়েছে। কোনটিতে আম্রপল্লব, কোনটি [illegible] কোথাও ফুল দিয়ে ঘিরেছে তোরণশীর্ষ, কোথাও

রাজা কুমারদাস এসেছেন গুরুবরণ করতে। সঙ্গে মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ, রাজনর্তকী অনঙ্গলেখা। মহোদধির সুনীল তরঙ্গ ধীরে ধীরে পৌঁছে দিল কালিদাসের তরণীকে ধরণীর কোলে।

কালিদাসের গায়ে শুভ্র পট্টবস্ত্র—শুভ্র উত্তরীয়। কপালে শ্বেতচন্দন তিলক। গলায় শুভ্র উপবীত। সহাস্য দুটি নয়নে করুণা ও মেধার দীধিতি। কুমারদাস এগিয়ে এসে তাঁর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন পুষ্পমাল্য। একশত কুমারী শঙ্খধ্বনি করল। সহচরেরা একে একে নিয়ে এল চন্দনসম্পুটে মহার্ঘ্য বস্ত্র, রত্ন। কালিদাস দিলেন কলিঙ্গের শত হস্তী—বনায়ুর শত অশ্ব—মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের উপহার। আর কুমারদাসের হাতে তুলে দিলেন রত্নখচিত কারুকার্যময় একটি হস্তীদন্তের লেখনী। শুভসংযোগ হোল। কুমারদাস আনন্দিত। ভারতের সঙ্গে তাঁর যোগ তো আজকের নয়। পিতা মুদ্গলায়ন এই ভারতবাসীদের সাহায্যেই তো কাশ্যপের পাপরাজ্য বিনষ্ট করে সিংহলে শান্তি ও ধর্মের রাজ্য স্থাপন করেন। আজকের এই বিরোধের পেছনেও বোধ হয় মৃত কাশ্যপের বন্ধুবর্গেরই চক্রান্ত চলেছে। কিন্তু রাজনীতিতে কুমারদাসের মন নেই। মনে প্রাণে আসলে তিনি কবি। রণরঙ্গে যোগ দিতে তাঁর সাধ নেই। কালিদাসকে রাষ্ট্রদূত হিসাবে পেয়ে যেন তিনি আত্মার আত্মীয় লাভ করলেন।

অনেকদিন পরে একটি সুখপ্রসন্ন সময় কালিদাসের জীবনে ফিরে এল। আর রাজনীতির জটিলতা নয়—কাব্য আলোচনার সুরস মুহূর্ত। কুমারদাস জানকীহরণ কাব্য রচনা করেছেন। প্রতিদিন প্রভাত যায় তারি মার্জনায়। অপরাহ্নে চলে নানা কাব্যমীমাংসা। অনুরাগী শিষ্যের মত কুমারদাস মনোযোগ দিয়ে শোনেন। পুঁথিতে টিপ্পনীগুলি লিখে রাখেন। না, মল্লিনাথের টিকায় তাঁর প্রয়োজন নেই। তিনি চান কবির মুখের ভাষ্য। কালিদাসকে লাভ করে কুমারদাস এত আনন্দিত যে প্রতি সন্ধ্যায় জ্বালিয়ে তোলেন কোন না কোন উৎসব। সিংহলের প্রজাসাধারণের মনে নেমে এল শিবসুন্দর শান্তি।

কুমারদাস নিশ্চিন্ত।

অনঙ্গলেখা ঈষদোদ্ধত ভ্রূলতা তুলে কিন্তু বলত,—"তুমি কবিকে পেয়ে আমাকে ভুলেছ।"

কুমারদাস হাসতেন,—"এ তোমার উদ্বিগ্নচিত্তের বিভ্রম।"

বারযোষা সকল শরীরে মদোৎসব জাগিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করতে চায়, দেখে রাজা মুগ্ধ হয়েই আছেন। মুগ্ধ হয়ে আছেন শব্দের খেলায় —ছন্দের চাতুর্য্যে। শব্দের এত শক্তি? রূপবতী মোহিনী নারীকেও চোখ চেয়ে দেখে না?

অনঙ্গলেখা ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে।

কুমারদাস হেসে বলেন—"শব্দ যে ব্রহ্ম"। অনঙ্গলেখার চন্দন চিত্রিত চিবুক তুলে বলেন—"তুমি বসন্তের ব্রততী, ফুল ফোটাও। কিন্তু ফল?"

"ফল? মানে সন্তান চাও তুমি?" বিদ্রূপ ওষ্ঠ বঙ্কিম হয়ে আসে অনঙ্গলেখার। পরক্ষণেই কৌতুকতরল নেত্রান্তে ফুটে ওঠে অপ্সরাপ্রবৃত্তি। সে আলিঙ্গন স্খলিত করে উঠে যান কুমারদাস। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন,—"প্রিয়ে, আনন্দই সন্তান। মানুষ যে অমর হবার দুরাশা রাখে তা সিদ্ধ করে সন্তান। তাই সে এত প্রিয়। শুধু অঙ্গজ বলে নয়, সে যে মৃতসত্ত মানুষকে অমৃতসত্তা দান করে। আমি আছি—আমি থাকব—চিরকাল ধরে থাকব এই দুর্মর প্রার্থনাই বেঁচে থাকে তার মধ্যে। সন্তান প্রিয়—কিন্তু কাব্য প্রিয়তর। সহস্র পুত্রের চেয়েও একটি সফল কাব্য অধিক ফলদাতা। সে ফললাভের জন্য আমি উন্মনা হয়ে আছি একথা সত্য।"

স্খলিতালিঙ্গনা অনঙ্গলেখার নয়নে ·বাল অগ্নিবাণ জ্বলে উঠল। কুমারদাস চলে গেলেন। সেই চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে ক্রূরবায়ুবিমর্দিতা ব্রততীর মত ভেঙ্গে পড়ল সে শয্যাতলে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল।

সেই আবছায়া ম্লানতায় একটি মৃদুস্বর সহসা শোনা গেল,—"পাপ শান্তি হোক, বৎসে।"

"প্রভু।"

আধো আলো আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন উপাসক। এই নতুন উপাসকই সম্প্রতি এসেছেন মণ্ডুকপাদবিহারে। বড় সুন্দর ত্রিপিটক পাঠ করেন। অনঙ্গলেখা মধ্যে মধ্যে শুনতে গিয়েই পরিচিত হয়েছেন। বড় স্নেহ করেন উপাসক অনঙ্গলেখাকে। তাই আজ এই বেদনার মুহূর্তে তাঁকে পেয়ে হৃদয়ের সব কথা উজাড় করে দিল সে। উপাসক শুনলেন—মধ্যে মধ্যে শুধু শোনা গেল—পাপ শান্তি হোক, পাপ শান্তি হোক। অনঙ্গলেখা নিজের দুঃখে মগ্ন ছিলেন, নয়তো দেখতেন উপাসকের চোখে জিহ্মবীক্ষণ, মুখে কিন্তু স্মিত হাসিটি লেগে রয়েছে। অনেকক্ষণ নীচুস্বরে পরামর্শ দান করে উপাসক উঠে গেলেন। অনঙ্গলেখার মুখে তখন কুটিল হাসি।

অনঙ্গলেখা কাব্যচর্চায় মন দিলেন। প্রতিদিনই নব নব পদ রচনা করছেন। কুমারদাস অতীব প্রসন্ন। কালিদাসও এই নতুন শিষ্যাটি পেয়ে সন্তুষ্ট। তিনিও মার্জনা করে দিচ্ছেন; কখনো কখনো নতুন শব্দ জোগাচ্ছেন। অনঙ্গলেখার সোমপানক উৎসবে কালিদাস আসর জমিয়ে রাখছেন নানা রঙ্গরসিকতায়। সুধারসদ্রাবিতকণ্ঠী অনঙ্গলেখার গান শুনেও তিনি মুগ্ধ।

প্রশংসা করে বলেন—"অনঙ্গলেখে, তুমি দ্বিতীয় গীর্বাণবধূ।"

"কিন্তু কবি, তুমি তো প্রাবৃষা-সিদ্ধ বলেই শুনি। আর মেঘ তো নৃত্যপরা শিখিনীকেই চায়।" অনঙ্গলেখার উক্তিতে মাধবীর প্রতি কটাক্ষ ছিল। মাধবী নৃত্যপটিয়সী—সঙ্গীতে দক্ষ নয়। কালিদাস হাসলেন। মুখে বললেন,—"শরতে ময়ূর নাচে না। কিন্তু হংসী গান করে। অনঙ্গলেখে, আমার জীবনে যৌবনের বর্ষা শেষ হয়ে গেছে— এখন শিশরশিহর শরতের প্রৌঢ় কাল।"

কুমারদাস হেসে উঠলেন কবির কথায়। যাক্ উভয়ের মধ্যে একটা পরিহাসমুখর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

মাধবীর পত্র এসেছে,—

কবি,

তোমার নতুন নাটক পড়লাম। কিন্তু তোমার মুখে না শুনলে তৃপ্তি কোথায়? তোমার আসার পথের দিকে চেয়ে বসে আছি। কবে আসবে?

কালিদাস লিখলেন,—

মালিনী,

এখানে কাব্য তথা দৌত্য দুই প্রিয়ার মনোরঞ্জন করছি। বড় কঠিন এই যুগলের সেতুবন্ধন। তবু কথা দিচ্ছি প্রাবৃষার পূর্বেই কাজ শেষ হবে। তোমার উদ্যানে তখন নীপতরুগুলি ফুলে ভরা কেশর নিয়ে নাচবে। আকাশে বাজবে মেঘ-মৃদঙ্গ। সৌদামিনী নাচবে উদ্‌ভ্রান্তক নৃত্য—আব বৃষ্টি ধারায় ফুটে উঠবে ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা। উৎসবের মাস শেষ হয়ে যাবে তখন। সেই রাত্রি দিবার চিহ্নহীন চিরপ্রদোষ প্রহরে—সেই জলধারার তিরস্করিনীর অন্তরালে আমি শোনাব আর তুমি শুনবে

লিপিটি পাঠিয়ে বড় তৃপ্ত হলেন কালিদাস। বর্ষা আসতে বড় দেরী নেই। মহোদধির জলে এক.। থমথমে ভাব। গায়ে উত্তরীয়টি জড়িয়ে চললেন তিনি নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়ে। পথে অনঙ্গলেখার ভবন।

ভাবলেন, একবার দেখে আসি নতুন কি লিখছে। এখন আর ছন্দ নয়, সমস্যাপূরণ এবং উদ্ভট শ্লোক ˋয়ে মেতে আছে অনঙ্গলেখা। যা ভেবেছিলেন তাই। প্রাচীরে রক্তকুঙ্কুমে আঁকা একটি চরণ,—

কমলে কমলোৎপত্তি ন দৃশ্যতে ন শ্রুয়তে।

পদ্মের মত মুখখানির চারপাশে নেমেছে ভ্রমরকৃষ্ণচূর্ণিত অলকগুচ্ছ,

যেন একটি পদ্মকে ঘিরে শত ভ্রমরের দল। নীলনলিনীর মত নয়ন ছুটি‌তে আরো ছুটি কৃষ্ণভ্রমর স্তব্ধ হয়ে আছে।

অহো রূপম্।

কোন মূঢ় লিখেছে এই চরণ পংক্তি? সে কি চোখ মেলে দেখে নি এই সুন্দরীকে? কমলের উপরে কমল তো ফুটেছে এখানেই। সহসা তাকালো অনঙ্গলেখা,—"কবি?"

হাঁফ ছেড়ে যেন বাঁচল সে।

"দেখ, দেখ, এই সমস্যাটি পূরণ করে দাও। যদি পূরণ করে দাও তবে আমি যে কত ধন-রত্ন তোমাকে দেব···"

"ধন রত্নের দরকার নেই, সুন্দরী। তোমার প্রসন্নতাই আমার সবচেয়ে বড় ধন।" কালিদাস বলে উঠলেন,—

"বালে তব মুখাম্ভোজে দৃষ্টমিন্দীবরদ্বয়ম্॥"

অনঙ্গলেখা চমকে উঠলো। কি সুন্দর পংক্তি ছুটি।

"কমলের উপরে কমল, কে দেখেছো কে শুনেছো বল?

বালা, তোর মুখাম্ভোজে দেখি, আছে ফুটে ছুটি নীলোৎপল।"

অনঙ্গলেখা মনে মনে ভাবলো আর ভাবনা নেই। কুমারদাস প্রতিশ্রুতি মত নিশ্চয় অনেক রত্নাদি দেবেন। কিন্তু কালিদাস যদি বলে দেন? কে যেন তাঁর কাণে কাণে উপাসক জিনদত্তরূপে বলল—"আটকাও, কবিকে আটক কর। তোমার জীবনের সুখ, সম্পদ, সৌভাগ্য যদি ফিরে পেতে চাও ওর সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ যেন না ঘটে।"

অনঙ্গলেখা মুখ তুলে হাসল ছলপ্রণয়ের হাসি।

"কবি, আজকে এখানে থেকে আমার সোমপানক উৎসব সার্থক করতে হবে।"

"উৎসব? ও হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। এ উৎসব তো আমারি বিদায়-উৎসব। নয়?"

অনঙ্গলেখা ঢোঁক গিললেন,—"হ্যাঁ।"

সারাদিন কালিদাস অনঙ্গলেখার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে উৎসবসভা

সাজালেন। কোথাও দিলেন যুঁই ফুলের মালা। কোথাও দিলেন পদ্ম কোরক—রক্ত—শ্বেত—নীল। স্ফটিক, সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র কত রকমের পানপাত্র। কোনটি বাহলীক দেশের—কোনটি সিংহলী—কোনটি সুবর্ণ দ্বীপের আবার কোনটি বা মাগধী। মগধের পাত্রগুলি নবরত্ন খচিত। কালিদাস স্মিত হাসলেন। মনে পড়লো সহাধ্যায়ীদের কথা। অমরসিংহ, ধন্বন্তরি, বরাহ……বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন। মগধের গরুড়চিহ্নেও এই নবরত্ন খচিত। কালিদাসের বক্ষে সহসা উজ্জয়িনীর স্মৃতি তরঙ্গ তুলল। তিনি চীনাংশুকের তিবস্করিনী তুলে সমুদ্রের দিকে তাকালেন।

উত্তর দিকে ভারতবর্ষ।

স্নেহমেদুর পবমনির্ভরতা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন নির্নিমেষে, গোবৎস যেমন তাকিয়ে থাকে গোমাতার দিকে।

দ্বিপ্রহরে কুমারদাস এলেন।

একি স্বপ্ন দেখছেন?

প্রাচীর গাত্রে ঐ অপরূপ ছন্দ-চিত্র-স্বর কে লিখেছে?

অনঙ্গলেখা?

অনঙ্গলেখা স্নান শেষে বিশেষ প্রসাধন করেছে। তার গায়ে নীলাংশুক। নীলাঙ্গী ময়ূরীর মত সে এসে দাঁড়ালো।

"একি তুমি লিখেছ?"

মৌনমুখে স্মিতহাস্যে নত নয়নে দাঁড়িয়ে রইল অনঙ্গলেখা বিনয়ের বিভূতি ছড়িয়ে।

"সার্থক—সার্থক প্রিয়ে, তুমি সিদ্ধা হয়েছো।" রাজা তাঁর কণ্ঠের মণিমালা পরিয়ে দিলেন অনঙ্গলেখার কণ্ঠে। তারপর তার চিত্রিত চিবুক তুলে প্রশ্ন করলেন,—

"প্রিয়তমে, তুমি কি চাও? অর্থ? রত্ন? অলঙ্কার? ভূমি? তোমায় কিছুই অদেয় নেই আমার।"

"মহারাজ সন্তুষ্ট হয়েছেন সেই তো যথেষ্ট।"

"না প্রিয়ে—তোমাকে কিছু দিয়ে আমি তৃপ্তি পেতে চাই।"

"মহারাজ, রত্ন অলঙ্কার অর্থ সবই তো আপনি দিয়েছেন। তবে যদি দিতে চান তো একটি রাত্রির শাসন আমার হাতে তুলে দিন। এক রজনীর জন্য আমি হতে চাই সিংহলের চূড়ামণি।"

কুমারদাস বিস্মিত হলেন। তাঁর ধারণা ছিল বারযোষা অনঙ্গলেখা লঘু প্রকৃতির নারী। কিন্তু,·········যাক্। তিনি খুলে দিলেন তাঁর অঙ্গুরীয়।

"এই নাও। এক রাত্রির জন্য শাসন কর।"

রাত্রির মধ্যযাম। সোমপানক উৎসব অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে শেষ হয়েছে। প্রায় সকলেই গৃহে ফিরে গিয়েছেন। কালিদাস শুধু একটি নিভৃত কক্ষে বসেছিলেন। তাঁর কেমন ভাল লাগছিল না। বিশেষ করে শেষ পানীয় গ্রহণের পর থেকেই যেন কেমন লাগছিল তাঁর। ঘরের মধ্যে সারিকা কেন বৃথা চীৎকার করছে?

চোখে কেন লাগছে ঘোর?

অনঙ্গ লে-খা—অ-ন-ঙ্গ-লে···খা····।

জড়িয়ে আসছে কেন কণ্ঠস্বর?

তবে কি? তবে কি আমি বিষপান করেছি?

ততক্ষণে ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে তাঁর কপাল। নিশ্বাস দ্রুত। জিহ্বা শুষ্ক। চোখে অন্ধকার। কালিদাস বিষমূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

রাত্রির শেষযামে জিনদত্ত এসে পৌঁছল। তাঁর সঙ্গী দুজন একটি কাষ্ঠপেটিকা নিয়ে এসেছে। বিকৃত ভগ্নস্বরে ডাকলেন,—"অনঙ্গলেখে, প্রস্তুত?"

অনঙ্গলেখা কথা বলল না। নীরবে অঙ্গুলি তুলে কক্ষকোণ দেখিয়ে দিল। বস্ত্রাবৃত মূর্তিদ্বয় মুহূর্তে কালিদাসের দেহ সম্পুটিকায়

তুলে ভবে নিল। অনঙ্গলেখা নিঃশব্দে জিনদত্তের হাতে তুলে দিল রাজাঙ্গুরীয়ক। আর ভয় নেই। নগরদ্বারে প্রহরীরা একটিও প্রশ্ন আর করবে না। শিলাখণ্ডে পূর্ণ এই পেটিকা সমুদ্র মধ্যে বিসর্জিত হওয়া মাত্র অতল সমাধিস্থ হবে। অনঙ্গলেখা পরিতৃপ্তির হাসি হাসল। বিষস্য বিষমৌষধম্। বিষ দিয়েই বিষ দূর করা দরকার।

জিনদত্ত দ্রুতই হাঁটছিলেন।

সঙ্গীদেরও তাড়া দিচ্ছিলেন।

প্রভাতের আগেই পৌঁছতে হবে সমুদ্রতীরে।

কিন্তু নগবদ্বারে বাধা পেলেন।

কে এক নতুন প্রহরী এসেছে? একে তো চিনি না? এ তো পুষ্য বা তিষ্য নয়। পুষ্য ও তিষ্য রাত্রির প্রহবী।

জিনদত্ত একটু স্তম্ভিত হলেন। পরক্ষণেই মনে হোল রাজদত্ত অঙ্গুরী আছে। তা ভিন্ন বাত্রি এখনো শেষ হয় নি। প্রহরীকে অতিক্রম করেই চলতে চাইছিলেন। কোথা থেকে আরো দুটি লোক এসে বাধা দিল।

"পেটিকা কোথায় যাচ্ছে?"

"শ্রেষ্ঠী রত্নধরের পোত।"

"কি আছে?"

"রত্নাদি।"

"কোথায় যাবে?"

"মগধেব বিহারে।"

"খোল, দেখব।"

"খোলবার আদেশ নেই।"

"আদেশ নেই?" জ্বলে উঠলো প্রহরীর চোখ।

"না, এই দেখ রাজঅঙ্গুরী।"

"তবে প্রভাত হোক।"

"রাত্রি মধ্যেই পোতে পৌঁছবার আদেশ আছে।"

"কে আদেশ দিয়েছেন ?"

"রাজা কুমারদাস।"

"মিথ্যাকথা।" প্রহরী গর্জন করে উঠল। যেন শত বজ্র নিনাদিত হোল।

জিনদত্ত একটু ভীত বোধ করলেন। পরক্ষণেই ভাবলেন প্রহরীর বড় তো সাহস। মুখে বললেন,—"ভুল হয়েছে। আজ রাত্রের জন্য বেশিকা অনঙ্গলেখা সিংহলের শাসনকর্ত্রী। তাঁরই আদেশ।"

প্রহরী শমিত হল—"তাই বল।"

চক্ চক্ করে উঠলো তার চোখ।

পূবাকাশে রাত্রি তরল হয়ে আসছে। শুকতারার দীপ্তি ম্লান। জিনদত্ত অসহিষ্ণু হলেন।

"সমুদ্রের দ্বার খুলে দাও।"

"দাঁড়াও বন্ধু। পুষ্য ও তিষ্য আসুক। কীলক খুলে দেবার ভার তাদের উপর।"

জিনদত্ত বিরক্ত চিত্তে বসলেন গিয়ে এক বেদীতে। শেষ রাতের সমুদ্রবায়ুর আর্দ্রতায় চোখে ঢুলুনী নামছে। সহসা সূর্যের সোনার কন্দুক লাফিয়ে উঠলো মহোদধির উপর। আর যাকে প্রহরী বলে রাত্রে মনে হয়েছিল সে এসে দাঁড়ালো মহারাজ কুমারদাসরূপে। জিনদত্ত চুপ করে রইলেন।

"উপাসক, আপনি মণ্ডুকপাদের শ্রমণ নন ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার পেটিকা আমি খুলতে চাই।"

"খুলতে আপনি পারেন না। রাত্রির আদেশকর্ত্রী অনঙ্গলেখার আদেশ ভিন্ন।"

রাজা আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিলেন সূর্য উঠছে।

রাজার ইশারায় পেটিকা খুলল প্রহরী।

এ কি ? কে এই মানুষ ? হত্যা করা হয়েছে ?

লাফিয়ে উঠলেন কুমারদাস। দুজন প্রহরী দ্রুত এসে জিনদত্তকে ধরে ফেলল। পেটিকার দেহের মুখের কাপড় সরিয়ে কুমারদাস চীৎকার করে উঠলেন—"কালিদাস ? কবি ?"

তাঁর সারা অঙ্গে আতঙ্ক। ঘৃণার সঙ্গে একবার নিষ্ঠীবন ফেললেন তিনি জিনদত্তের দিকে,—"পামর, পাষণ্ড, এ তুই কি করেছিস ?"

জিনদত্ত হেসে উঠলেন শুষ্ক পরুষ কণ্ঠে।

প্রহরী ঝুঁকে পড়ে দেখতে দেখতে বলল—"মহারাজ, উনি জীবিত আছেন।"

"জীবিত আছেন ?" কুমারদাস ঝুঁকে পড়লেন কালিদাসের উপর।

ঠোঁট নড়ছে। কিন্তু দৃষ্টি আচ্ছন্ন।

"জল। জল আন এখুনি।"

পুষ্য জল নিয়ে এল ছুটে।

এবার আতঙ্ক জিনদত্তেব মুখে।

মৃত নয় কালিদাস ? তাহলে ? পালাতে হবে।

কিন্তু কুমারদাস নক্ষত্রগতিতে ঘিবে ধরেছেন তাদের।

"বাঁধ এদেব, নিয়ে যাও কাবাগৃহে।"

জিনদত্ত চেঁচিয়ে উঠলো,—"কিন্তু মহারাজ, শাসনকর্ত্রীর আদেশ পালন করেছি আমরা।"

"সে বিচার পরে হবে।"

কালিদাসকে নিয়ে আসা হোল রাজপ্রাসাদে। সিংহলের সকল বৈদ্য এসে উপস্থিত হোল। সমস্ত নগরে স্তব্ধতা। সবাই চলেছে চুপে চুপে। সন্ধিতে সন্ধিতে জটপাকানো মানুষের দল। অনঙ্গলেখার গৃহের সম্মুখে শান্ত্রীরা উন্মুক্ত তরবারি হাতে পাহারা দিচ্ছে। মহামৃত্যু নিঃশব্দ চরণ ফেলে আসছে। তাকে কোন শান্ত্রী

কোন তলোয়ারে ঠেকাবে? সিংহলের জনপদবাসীদের চোখে জল। একটা বিদ্রোহ যেন ঘনিয়ে উঠে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলতে চায় চক্রান্ত-কারীদের।

শ্রেষ্ঠী রত্নধর এসে দাঁড়ালেন প্রাসাদের সম্মুখে। জনতা সসম্মানে পথ ছেড়ে দিল এই ভারতীয়কে।

বৈদ্যরা খল মাড়ছেন। চূর্ণ করছেন। বটিকা প্রস্তুত করছেন। রত্নধর নাড়ী ধরল—

"কবি"

"উঁ।" কালিদাস যেন কোন অজ্ঞাত দেশ থেকে সাড়া দিলেন।

"দেশে যাবে?"

"নিয়ে যাবে?" একটা উজ্জলতা যেন দেখা দিল কালিদাসের ঘোলা চোখে।

"তোমাকে আমি দু দিনের মধ্যে নিয়ে যাব।"

"তাই চল। মরবার আগে আর একবার দেখতে চাই······"

"কাকে? কবি? কাকে? মহাকালকে?"

"উঁ?"

"মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে?"

"উঁ?"

"নটিমুখ্যাকে? মাধবীকে?"

কালিদাস সাড়া দিলেন না। আবার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। রত্নধর বুঝলেন আর সময় নেই। যেতে হলে এখুনি যেতে হয়।

বর্ষণমুখর অপরাহ্নে যাত্রা শুরু হোল।

ভারতযাত্রা কালিদাসকে যেন কতকটা সুস্থ করে তুলল।

রত্নধর তাঁর শয্যার পাশে বসে রইলেন, রাত্রি দিন। কুমারদাস যাত্রাক্ষণে রাজসভার প্রধান বৈদ্যকে বলেছিলেন—"আপনি আপনার যত প্রকার ওষধি আছে সব নিয়ে যান। সঙ্গে আপনার নির্বাচিত

আরো তুজন বৈদ্য নিয়ে যান যারা ওষধি প্রস্তুত করবে।" সেই বৈদ্য-প্রধান প্রতি দণ্ডে দণ্ডে আসছেন। তিনি আবার ধন্বন্তরীর শিষ্য।

মুখ তাঁর গম্ভীর।

রত্নধর জীবনে বহু বিপদসঙ্কুল যাত্রা করেছেন।

ঝড়ের নাগর দোলায়—জলদস্যুদের উৎপাতে—দিকবিভ্রমে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন কতবার। কিন্তু এবারকার মত কোনটাই নয়।

মৃত্যুর সঙ্গে এবার দৌড়ের প্রতিযোগিতা। পল, বিপল, মুহূর্ত, নিমেষ, দণ্ড, প্রহর। যেতে হবে—যেতে হবে—ছুটতে হবে। মৃত্যুর কাছ থেকে কয়েক দণ্ড কেড়ে নিতে হবে। জীবিত কালিদাসকে একটি বার ভারতভূমি স্পর্শ করান মাত্র। হে মহাকাল—হে চক্রস্বামী—হে শাক্যমুনি, জগতের যে যেখানে দেবদেবীরা আছ, তোমরা আমাদের সহায় হও।

বর্ষার সমুদ্র। উত্তাল, অশান্ত।

এক একটা ঢেউ তুলছে গিরিশৃঙ্গে, পরমুহূর্তে পড়ছে অতল গহ্বরে। মাড়া কাজলের মত কৃষ্ণনীল দেহ হয়ে গেছে কালিদাসের। কিন্তু মেধা এখনো দীপ্ত। রত্নধরকে শোনাচ্ছেন রঘুবংশ থেকে—'দূরাদয়শ্চক্র নিভস্যতন্বী তমালতালী বনরাজিনীলা।' সিংহল থেকে রাম ফিরে চলেছেন ভারতবর্ষে। দূরে দেখা যাচ্ছে ভারতের বেলাকুলরেখা। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। কিন্তু ভাঙ্গা ভাগ্যের মত বিকেলে শুরু হোল ঝড়। একশত মাল্লার রাত্রি দিন শ্রমের মূল্যকে এক মুহূর্তে নস্যাৎ করে দিয়ে তাদের নিয়ে গেল কয়েক যোজন দূরে। হাহাকার উঠলো মাঝি মাল্লার মধ্যে।

ভেতরেও চলেছে যুদ্ধ।

ক্ষণে ক্ষণে মহাকবির চেতনার উপর নেমে আসছে একটি যবনিকা। বিকারের মধ্যেই বলছেন—"একি ঢেউ-এর মুখে ফেণার হাসি? না, না, এ যে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ—ত্র্যম্বকের অট্টহাসি। ঐ দেখ, ঐ দেখ, তাল তমালে ঘেরা দূরের তন্বী অয়শ্চক্র। পবন বেগে কি গিরিশৃঙ্গ

উড়ে গেল? না, না, মেঘসংঘর্ষের গম্ভীর নির্ঘোষ। প্রবৃদ্ধবেগ অনির্মলা সলিলে তটক্রম ভেঙ্গে পড়ছে। আমি কি ভেলায় চড়ে উন্মত্ত সাগর পার হচ্ছি?"

কখনো দেখছেন উজ্জয়িনীর উৎসব। "বল্লকী সহযোগে কে গাইছে গান? ভিন্ন বৈদুর্যমণির মত কোমলাঙ্কুরে ভরে গেছে বিন্ধ্যপর্বতের বন। ঐ শোন, উন্মাদ হংসরবে নূপুরের নাদ। দেখ, দেখ, দিনক্ষপা-মধ্যগতা সন্ধ্যাকে,—ঐ তো ধ্রুবস্বামিনী। নীলতরঙ্গ উঠছে। না, না, বর্হচূড় গোপবেশী বিষ্ণুর কি রুচিসুন্দর রূপ। তবে কি বর্হব্রজ বিস্তার করে শত শত ময়ূর নাচছে? যূথিকাকুণ্ডল না মুক্তামালা না ফেণার রাশি? আহা শরীরিণী বিরহব্যথা—শরতের তাপে ম্লান যেন কেতকীর গর্ভপত্র—বৃন্তচ্যুত কিশলয়ের মত পাংশু ক্ষীণ ম্লান। প্রভাতের চাঁদের মত পাণ্ডুর। বিকীর্ণমূর্দ্ধজা একবেণীধরা কে ওখানে অশ্রুর অক্ষরে দিন গুণছে? প্রিয়ে প্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয় বিপ্রযুক্তা বিপাণ্ডুতাং যাতি বিলাসিনীব।"

বৈদ্য সূচিকাভরণ দেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

এক একবার ঢেউ উঠছে পর্বত প্রমাণ, পরমুহূর্তে আছড়ে ফেলছে গহ্বরের অতলে। দড়ি দড়া পাল ছিঁড়ে তছনচ। প্রবলবায়ু, প্রবলতর বর্ষণ। সূঁচের মত বিঁধছে সর্বাঙ্গে। অমাবস্যার রাত্রি যেন কালী করালীর মত ডাকিনী যোগিনীদের নিয়ে ভীমা নৃত্য নাচছে। বিদ্যুতের ঝলকে যেন তাদেরি খর্পরের আলো। মকর এসে দাঁড়ালো। সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। রত্নধর তাকালেন তার দিকে। মকর মাথা নাড়লো। উন্মত্তের মত রত্নধর প্রতিটি মাল্লার হাত ভরে দিলেন স্বর্ণমুদ্রায়। প্রতিশ্রুতি দিলেন, প্রত্যেকের কণ্ঠে ঝুলিয়ে দেব স্বর্ণহার, যদি এই রাতের মধ্যে তারা পৌঁছতে পারে ভারতের উপকূলে। মাল্লাদের গায়ে স্বেদ। দিবা রাত্রির পরিশ্রমে তারা অবশ। তবু অমানুষিক শ্রমে তারা পোতশ্রেণীর গতি দ্রুত করল।

মকর আবার এল—"শ্রেষ্ঠী, তলার কাঠে ফাটল ধরেছে, জল উঠছে।"

রত্নধর বললেন,—"যত ভারী দ্রব্য আছে ফেলে দাও।"

"ফেলে দেব ?"

"সব সব। কর্পূর, মৃগনাভি, চন্দনকাঠ, তিল, যব······"

রত্নধর এসে দাঁড়ালেন গবাক্ষের কাছে।

ঐ যে দূরে ভৃগুকচ্ছের আলো।

সহসা তাঁর মনে এল সুবর্ণভূমির তৈল আছে সঙ্গে।

"ঢেলে দাও। মকর, সব তেল ঢেলে দাও সমুদ্রের জলে।" ছুটে চললেন নিজে।

সহস্র স্বর্ণমুদ্রায় কেনা জালা ভর্তি তেল ঢেলে দিতে লাগল মাল্লারা সমুদ্রের জলে। আশ্চর্য, বজ্র তখনো গর্জ্জাচ্ছে। বৃষ্টি তখনো শত শরে জর্জর করে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। কিন্তু যতদূর পর্যন্ত সেই তেল গড়িয়ে গেল সমুদ্র শান্ত।

রত্নধর ফিরে এলেন।

বৈদ্য নীরবে মাথা নাড়লেন।

না, মৃত্যুর সঙ্গে দৌড়ে তাঁরা পারলেন না।

কালান্তকের কাছে কাল ভিক্ষা পেয়েছে কে ?

শেষ কথা উচ্চারিত হোল কবির মুখে,—"মা-লি-নী।"

মহাকবির মহাপ্রাণ অনিলে অন্তরীক্ষে অনন্তে মিলিয়ে গেল।

শুক্রগ্রহ তখন আর্দ্রানক্ষত্রে প্রবেশ করেছে।

দ্বাদশ বর্ষ চলে গেছে।

মহাকালমন্দিরে একজন সন্ন্যাসিনী প্রণাম জানিয়ে উঠলেন। পুরোহিত নারায়ণ শাস্ত্রীকে শুধালেন,—"আর এখানে আরতি কালে নৃত্য হয় না ?"

"হয়, কখনো কখনো হয়। পূর্বের মত কলাপটিয়সী তো আর কেউ নেই।"

"নেই ?"

"না, আমাদের শেষ নটিমুখ্যা মাধবী অবসর গ্রহণ করবার পর থেকে আর কোন কলাবতীর পরিচয় পাই নি।"

"কেন, রূপপালি ?"

বৃদ্ধ নারায়ণ শাস্ত্রী তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন—কে এই সন্ন্যাসিনী ? এত সংবাদ রাখে ?

মুখে বললেন—"আপনি তো বহু সংবাদ জানেন।"

সন্ন্যাসিনী উত্তর দিল না। কিন্তু জিজ্ঞাসু চোখ মেলে রইল। নারায়ণ শাস্ত্রী বললেন,—"রূপপালি নটি ছিল মাত্র। নটিমুখ্যা কখনো হয় নি। সম্প্রতি সে অমাত্য অভিনন্দের গৃহিণী হয়েছে। অতএব……"

সন্ন্যাসিনী এসে দাঁড়ালো মন্দিরপ্রান্তে দুটি নীপতরুর কাছে। দেখেছিলেন শিশু—আজ এরা মহীরুহ। কত শাখা-প্রশাখা—পাখীর কোটর—কত জনের শরণ। তারি ছায়ায় বসলেন ক্ষণকাল। বৃক্ষের বাকলে হাত বুলিয়ে দিলেন সস্নেহে—যেন প্রিয়জনের গায়ে বোলাচ্ছেন হাত। কমণ্ডলুতে ছিল তীর্থবারি তাই দিলেন গাছের গোড়াগুলিতে। একটুখানি মাটি নিয়ে মাথায় ঠেকালেন।

নারায়ণ শাস্ত্রী বলেই চলেছেন,—"এ দুটি বৃক্ষও রোপণ করেছিল মাধবী। একটি মহাকবি কালিদাসের ভস্মাধারের উপর, অপরটি মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের ভস্মাধারের উপর। জীবনেও তাঁরা এমনি পরস্পর অবলম্ব ছিলেন।"

সন্ন্যাসিনী তাকিয়ে দেখল এ গাছের শাখা ও গাছের শাখায় গলাগলি। তার তলা দিয়ে রাজোদ্যানে যাবার পথ।

অভিসারিকার পথ।

তিনি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

তারপর মন্দির ত্যাগ করে চললেন।

মহারাজ কুমারগুপ্তের রাজসভায় পরামর্শ চলেছে। সুদর্শনবাঁধ

আবার বাঁধা হয়েছে। সেখানে বহু দেশের জ্ঞানীগুণীদের সমাগম হবে। কালিদাস তো নেই। উজ্জয়িনী থেকে কে যাবে?

বরাহমিহির বললেন—"একটা কবিদের প্রতিযোগিতা হোক।"

ধন্বন্তরী ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন—"শক্তিহীন কবিদের নিয়ে কিছু না করাই ভাল।"

কুমারগুপ্তেরও তাই মত।

অমরসিংহ বললেন—"আমার মতে কবি কালিদাসের কাব্যপাঠ করা যেতে পারে। অবশ্য বৃদ্ধ হয়েছি। এখনকার রুচি বুঝি না।"

কুমারগুপ্ত সোৎসাহে মত দিলেন—"আমারও তাই মত, শ্রীমন। কবি কালিদাসের কাব্যগুলি এই উৎসবে পাঠানই ভাল। তিনি ক্ষণ-কালেব রুচি মেটাবার কবি নন! তিনি চিরযুগের রুচি। কিন্তু…… সব পাণ্ডুলিপিগুলির সন্ধান পাচ্ছি না।"

"আমার কাছে ঋতুসংহার আছে।" অমরসিংহ জানালেন সবিনয়ে।

"সে তো আমারও আছে।" বললেন ধন্বন্তরী।

"আমারও আছে।" বললেন কুমারগুপ্ত।

মালবিকাগ্নিমিত্র? বিক্রমোর্ব্বশী? মেঘদূত?

"মেঘদূত অবশ্য স্মৃতির সাহায্যে লেখা যায়।" বললেন ধন্বন্তরী।

"ওটা আমারও মুখস্থ আছে।" অমরসিংহ জানালেন।

"কুমারসম্ভব নিশ্চয় আপনা' কাছে আছে?" কুমারগুপ্তকে শুধালেন ধন্বন্তরী।

লজ্জিত হলেন কুমারগুপ্ত—"থাকা তো উচিত ছিল। শুনেছি এই গ্রন্থটি তিনি আমার জননীকে দেন। কিন্তু জনশ্রুতি বলে……"

ধন্বন্তরী চটে উঠলেন—"কি বলে? দেন নি? আমি নিজে দেখেছি যে রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্রে মোড়া কুমারসম্ভব তিনি মহাদেবীর হাতে দিলেন। আপনি সেটি নিয়ে খেলতে লাগলেন। কিছুতেই ছাড়বেন না।"

"সেইটেই তো জনশ্রুতি। শেষ পর্য্যন্ত যে কি হোল আমার তো

মনে নেই। জননী কি সেটি তুলে রেখেছিলেন না আমিই ছিন্নভিন্ন করে ফেলে দিয়েছিলাম তার সাক্ষী পাচ্ছি না।"

একটা চাপা হাসি উঠল সভাকক্ষে।

এমন সময় অন্তঃপাল এসে জানাল এক সন্ন্যাসিনী সাক্ষাৎপ্রার্থিনী।

"তাঁকে এখানে নিয়ে এস।" আদেশ দিলেন কুমারগুপ্ত।

সন্ন্যাসিনী এসে হাত তুলে বললেন,—

"মহারাজ কুমাবগুপ্তের জয় হোক।"

"মাধবী?" ধন্বন্তরী আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন।

সম্মতি জানালেন সন্ন্যাসিনী। তারপর বললেন,—

"মহারাজ, গুরুর আদেশে দ্বাদশ বর্ষ পর জন্মস্থানে গিয়েছিলাম। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে যখন গেলাম কিছুই চিনলাম না। মনে হোল আমার জন্মস্থান তো উজ্জয়িনী। তাই এসেছিলাম। এখনো কিছু ঋণ আছে। সেটা শোধ করতে এসেছি।"

এই বলে সন্ন্যাসিনী তার ঝোলা থেকে একটি চন্দনকাঠের সম্পুটিকা বার করলেন,—একে একে কুমারগুপ্তের হাতে তুলে দিতে লাগলেন কালিদাসের পুঁথি—ঋতুসংহাব, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, শকুন্তলা।

উজ্বল হয়ে উঠলো সভার মুখ।

সন্ন্যাসিনী ফিরে চললেন

প্রাসাদদ্বার পার হতেই শুনলেন পেছনের ডাক

"মাধবী, মালিনী।"

কে ডাকে এমন নামে?

সন্ন্যাসিনী থামলেন।

দেখলেন অমরসিংহ প্রায় ছুটে আসছেন

"কি সংবাদ, আভিধানিক?"

"তুমি কি আজই চলে যাচ্ছ?"

"আজই।"

"যাবার আগে একটি প্রশ্নের উত্তর দেবে? সারা জীবন ধরে তার অর্থ আমি বুঝি নি।"

"আভিধানিককে অর্থ বোঝাব আমি?" সন্ন্যাসিনী হেসে উঠলেন। তারপর সংবৃত হয়ে বললেন—"প্রশ্ন কর। উত্তর দেবার হলে দেব।"

"মাধবী, তুমি জীবনে কাকে ভালবেসেছিলে, মহাকালকে না মহারাজা বিক্রমাদিত্যকে?"

"মহাকালকেই ভালবাসতে চেয়েছি। কিন্তু আভিধানিক, অষ্টাদশী মাধবীর পক্ষে তাঁকে ভালবাসা কি সহজ ছিল? তিনি ছিলেন পাষাণ-ময় দেবতা। আর মহারাজা বিক্রমাদিত্য ছিলেন সম্রাট। তাঁর শত কর্তব্যের শত জীবনে মাধবী ছিল তুচ্ছ তৃণখণ্ড মাত্র।"

"তবে কি মহাসান্ধিবিগ্রহিক নৃসিংহগুপ্ত?"

"তিনি ছিলেন ভোগীপুরুষ। প্রেম ছিল তাঁর কাছে চতুঃষষ্টিকলার অন্যতম কলামাত্র।"

"নাবাধ্যক্ষ পুরগুপ্তকে?"

মাধবী হেসে উঠলো হা হা করে।

"তবে? তবে কি কালিদাসকে?"

মাধবী মৌন রইলেন।